বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

উনচল্লিশতম খণ্ড	গ্রীষ্ম সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/জুন ২০২১

সম্পাদক
সৈয়দ আজিজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
মো. আবদুর রহিম

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক
সম্পাদক	:	অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক
সহযোগী সম্পাদক	:	মো. আবদুর রহিম
সদস্য	:	অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ
		অধ্যাপক দুলাল ভৌমিক
		অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
Price	:	Tk. 200.00
		US$ 10.00

প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক
		এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal of the Asiatic Society of Bangladesh) edited by Professor Syed Azizul Huq, published by Dr. Sabbir Ahmed, General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretariat Road, Nimtali, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone : 02-9513783, E-mail : asiaticsociety.bd@gmail.com

সূচিপত্র

বাংলাদেশে 'গ্যাং কালচার' ও কিশোর অপরাধ: উৎপত্তি ও বিস্তৃতি
শেখ হাফিজুর রহমান ১

কক্সবাজার জেলার ঐতিহ্যবাহী লবণ-শিল্প: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
কানিজ ফাতেমা ২৩

চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ: কথাসাহিত্যে প্রয়োগবৈচিত্র্য
সরোজকুমার ঘোষ ৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রাশিয়ার চিঠি* : বিপ্লবোত্তর রাশিয়া-দর্শন
মো. সোহানুজ্জামান ৭৯

পুরুষের ব্রতকথা : নেত্রকোণা জেলার তিনটি নমুনা ও পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব
দীপ্তি রানী দত্ত ৯৯

প্রবাজপুর শাহী মসজিদ : বাংলার স্থাপত্যের এক অনন্য প্রত্ন-নিদর্শন
হাফিজ আহমেদ ১২৩

লালনের সমাজদর্শন: বর্তমান প্রেক্ষাপট
মোহাঃ আলমগীর হোসেন ১৩৭

গ্রন্থ-সমালোচনা

কাশ্মীর : দেশীয় রাজ্য থেকে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল প্রলম্বিত সংকটের আখ্যান
মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান ১৪৯

নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণি: রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতি
এম এ কাউসার ১৫৭

গবেষকদের জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা-য় এশিয়ার সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গবেষকদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রবন্ধ জমা দেয়ার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এক কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে সিডিসহ বা পেন ড্রাইভ-এ জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার নিয়ম নিম্নরূপ :

- কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে (ভারসন বিজয় ৪.০ বা বিজয় ২০০৩)। টাইপ/ ফন্ট SutonnyMJ ব্যবহার করতে হবে।
- কাগজের সাইজ হবে A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধে গবেষকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে গবেষকের এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে :

- জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি;
- এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
- প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি;
- এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার একটি কপি ও প্রবন্ধের ১০ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* অনুসরণে অথবা *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের প্রথম ভুক্তি (entry) অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। গবেষক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস ও উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করতে হবে। টীকার ক্ষেত্রে শব্দের ওপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। প্রবন্ধের শেষে সংখ্যা অনুসারে টীকা ও তথ্যসূত্র উপস্থাপন করতে হবে।

৬. বক্তব্যের উৎস উল্লেখের ক্ষেত্রে সরাসরি গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-লেখকের নাম, প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে। এশীয়, বিশেষত বাংলা নাম পূর্ণভাবে লেখা যাবে। কিন্তু অন্য নামের ক্ষেত্রে শেষ নাম প্রথমে পদবী ব্যবহার করাতে হবে।

৭. মূলপাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৮. বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই : *বৃহৎ বঙ্গ;* পত্রিকা : *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*)। মূলপাঠে বিদেশি শব্দ থাকলে তা-ও একই নিয়মে লিখতে হবে। অন্যভাষার শব্দ বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের নিয়ম অনুযায়ী লিখিত হবে। কিন্তু ব্যক্তি ও বইয়ের নাম প্রথমবার উল্লেখের সময় তা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজিতে লিখতে হবে।

৯. প্রবন্ধের শেষে টীকা (যদি থাকে) এবং টীকার পরে তথ্যনির্দেশ সংযোজিত হবে। প্রত্যেক ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পৃথকভাবে উপস্থাপিত হবে এবং এ উপস্থাপন রীতি হবে বর্ণানুক্রমিক।

১০. প্রবন্ধের সূচনায় একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে।

১১. যৌথ নামে লিখিত প্রবন্ধ সোসাইটির বাংলা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয় না।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

কাউন্সিল : ২০২০ ও ২০২১

সভাপতি	:	অধ্যাপক মাহফুজা খানম
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক মেসবাহ-উস-সালেহীন অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক অধ্যাপক আহমেদ এ. জামাল
কোষাধ্যক্ষ	:	অধ্যাপক এস এম মাহফুজুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক	:	অধ্যাপক সাব্বীর আহমেদ
সম্পাদক	:	অধ্যাপক মো. আবদুল করিম
সদস্য	:	অধ্যাপক নাজমা খান মজলিস অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ অধ্যাপক ইয়ারুল কবীর অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান অধ্যাপক ঈশানী চক্রবর্তী ড. নুসরাত ফাতেমা মিসেস সুরাইয়া আক্তার

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/জুন ২০২১

বাংলাদেশে 'গ্যাং কালচার' ও কিশোর অপরাধঃ উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

শেখ হাফিজুর রহমান*

সারসংক্ষেপ

শিশু ও কিশোর-কিশোরী একটি সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে একটি সমাজে সক্রিয় সকল প্রতিষ্ঠানের তথা পরিবার, বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্ম, সংস্কৃতি, এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। নানা গবেষণা দ্বারা এটি এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে, পরিবার, ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাষ্ট্রিক নানা অসঙ্গতির কারণে শিশু, কিশোর ও কিশোরীরা বিভিন্নভাবে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়; কখনো কখনো জড়িয়ে পড়ে অপরাধে। শিশু ও কিশোরেরা অপরাধ ও সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়লে, তার মূল দায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের। একবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক ও সভ্য রাষ্ট্রসমূহের শিশু আইন ও কিশোর ন্যায়বিচার ব্যবস্থা এই মূলনীতির ওপর গড়ে উঠেছে। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের 'গ্যাং কালচার', ও কিশোর অপরাধের উৎপত্তি, বাস্তবতা, ও বিস্তৃতি এবং বয়ঃসন্ধিকালের আবিষ্কার, ও শৈশবের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা আছে। 'গ্যাং কালচার' ও কিশোর অপরাধ বাংলাদেশে কি ধরনের পারিবারিক, সামাজিক, ও রাষ্ট্রিক অসঙ্গতির পরিচায়ক; এবং কিশোর অপরাধ বিদ্যমান পরিবার, সমাজ, ও রাষ্ট্রের ওপর কোন নেতিবাচক অভিঘাত তৈরি করছে কিনা, সেটি বিশ্লেষিত হয়েছে প্রবন্ধটিতে।

ভূমিকা

বাংলাদেশে ১৮ বছরের কম বয়সী মানুষ, অর্থাৎ শিশুর সংখ্যা ৫৭.১৫ মিলিয়ন। ইউনিসেফ বাংলাদেশের এই হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের ৫ কোটি ৭০ লক্ষের অধিক মানুষ শিশু, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ শিশু ও কিশোরদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা অস্বাভাবিক না হলেও, অনাকাঙ্ক্ষিত। তবে কিশোরেরা অধিক মাত্রায় অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে বা কিশোর অপরাধ বেড়ে গেলে, সেটি সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্বাভাবিকতার ইঙ্গিতবাহী। কিশোর অপরাধের সংঘটন ও বৃদ্ধি যেসকল কারণে হয়, তার মধ্যে রয়েছে– ভাঙা পরিবার বা ব্রোকেন ফ্যামিলি, দারিদ্র্য, পিতামাতার সঙ্গে দূরত্ব, পারিবারিক নজরদারির অভাব, সহিংস কার্টুন ও ভিডিও গেমের প্রভাব, পরিবার বা বন্ধুদের মধ্যে অপরাধীর উপস্থিতি ইত্যাদি। এসব কারণে গবেষকগণ মনে করেন যে, কিশোর অপরাধের বাড়ন্ত সংখ্যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা অসঙ্গতির প্রতিফলন। গত শতকের চল্লিশের দশক থেকেই কিশোর অপরাধ সংঘটিত হওয়ার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তবে ৯০-এর দশক থেকে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের গতি দ্রুততর হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা শহরে যারা অপরাধ করে, তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ কিশোর।

* অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৯৬ সালে ইউনিসেফ-এর এক গবেষণায়[১] বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ মোট অপরাধের মাত্র ২ শতাংশ। তবে এ গবেষণায় উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশে সংঘটিত সকল কিশোর অপরাধের উপাত্ত দাপ্তরিক প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয় না; অন্যদিকে কিশোর অপরাধ-বিষয়ক প্রামাণিক পরিসংখ্যানের ঘাটতিও আছে। ইউনিসেফের গবেষণায় আরও বলা হয় যে, ৯০-এর দশকে নানা কারণে গ্রামের লোকজন ব্যাপক হারে শহরে চলে আসে, এবং তারা শহরের বস্তি ও রাস্তা-ঘাটে বসতি স্থাপন করে। এদের ছেলেমেয়েরা অর্থাৎ শিশু ও কিশোরেরা জীবিকা নির্বাহের তাগিদে হয় নিজেরাই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে অথবা প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এই সময়টি অর্থাৎ নব্বই-এর দশক থেকে কিশোর অপরাধের উর্ধ্বগতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে 'ঢাকা ট্রিবিউন'-এ প্রকাশিত এক কলামে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে উদ্ধৃত করে বলা হয় যে, বাংলাদেশের ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশু ও কিশোরদের মধ্যে ১৩ লক্ষ নানা ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। এদের মধ্যে ৭০ শতাংশ অর্থাৎ ৯ লক্ষ ১০ হাজার শিশু-কিশোর দারিদ্র্যের কারণে অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে বলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়। কিশোর অপরাধের এই বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই বাংলাদেশে দেখা দিয়েছে 'গ্যাং কালাচার'।[২]

২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিপক্ষ দলের যুবকদের হাতে উত্তরা ট্রাস্ট স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র আদনান কবির নির্মমভাবে খুন হয়। হত্যাকাণ্ডের পরে 'গ্যাং কালচার' নামে কিশোর অপরাধের একটি সাম্প্রতিক ও শঙ্কা উদ্রেককারী ধারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলাদেশে বিদ্যমান কিশোর অপরাধ ও 'গ্যাং কালচার' বিষয়ে বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা আছে এ প্রবন্ধে। বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার পরে বয়ঃসন্ধিকালের আবিষ্কার, শৈশব ও কৈশোরের গুরুত্ব বিষয়ে একটি তাত্ত্বিক আলোচনা আছে। এরপরে ধারাবাহকিভাবে আলোচনা করা হয়েছে স্বাধীনতার আগে ও পরে বাংলাদেশের কিশোর অপরাধের বাস্তবতা ও বিস্তৃতি, এবং 'গ্যাং কালচার'-এর উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য, ও বিস্তার নিয়ে। পরিশেষে কিশোর অপরাধ ও 'গ্যাং কালচার' বিষয়ক উপাত্ত ও বাস্তবতার আলোকে উপসংহার টানা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে। প্রধানত মাধ্যমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত 'সেকেন্ডারি লিটারেচার' বা প্রামাণিক গ্রন্থ, জার্নাল, জাতীয়, ও আন্তর্জাতিক আইন, দৈনিক পত্রিকা, ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর ওয়েব পেজসহ নানা ইন্টারনেট কনটেন্ট-এর সহযোগিতা নিয়ে প্রবন্ধটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বয়ঃসন্ধিকাল, শৈশবের গুরুত্ব, কিশোর অপরাধের সূচনা এসব তাত্ত্বিক আলোচনা পূর্বেকার তাত্ত্বিক ও গবেষকদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের আলোকে করা হয়েছে; শিশুর সংজ্ঞা, কিশোর অপরাধ ও কিশোর ন্যায়বিচার ব্যবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে; এবং সাম্প্রতিক সময়ে বিস্তৃত 'গ্যাং কালচার'-এর তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টাল থেকে।

বাংলাদেশে শিশু ও কিশোরের- সংজ্ঞার্থ, সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব ও বাস্তব অবস্থা

আমাদের প্রথমেই জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে, কোন্ বয়সী মানুষকে আইনে শিশু বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে? আর কোন্ বয়সের ব্যক্তিদের আইনগত এবং সামাজিকভাবে কিশোর ও কিশোরী বলে গণ্য করা হয়? ১৯৭৪ সালের শিশু আইনে ১৬ বছর বয়সের কম যে কোন ব্যক্তিকে শিশুর সংজ্ঞায়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৪ সালের আইন রদ করে ২০১৩ সালে যে নতুন শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, তাতে ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিকে শিশু বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যদিও শ্রম আইন, দণ্ড আইনসহ বিভিন্ন আইনে প্রদত্ত শিশুর সংজ্ঞায় বয়সের তারতম্যহেতু একটি বিভ্রান্তি রয়েছে, তথাপি শিশু বলতে ১৮ বছর বয়সের কম যে কোন ব্যক্তিকে বুঝতে হবে। কেননা, এটি বাংলাদেশের শিশু আইন ও জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

জাতিসংঘ শিশু সনদ, ১৯৮৯-এ[৩] বলা হয়েছে যে, শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী যে কোন মানুষকে বুঝাবে, যদি না তার জন্য প্রযোজ্য আইনে এই বয়সের আগেই প্রাপ্তবয়স্কতা (বা সাবালকত্ব) অর্জন করা যায়। শিশুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বাংলাদেশের ২০১৩ সালের শিশু আইনে[৪] বলা হয়েছে, এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তিকে শিশু বলে অভিহিত করা হবে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনে বিবৃত শিশু-সংজ্ঞায়নের সারবস্তুকে বিবেচনায় নিয়ে এ কথা বলা যায় যে, ১৮ বছর বয়সকে মান ধরে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক, এবং সাবালকত্ব ও নাবালকত্বের পার্থক্য যেমন নির্ণয় করতে হবে; তেমনি সেই ১৮ বছরের আইনী বাধ্যবাধকতাকে মান্য করেই আমাদের নির্ধারণ করতে হবে শৈশব ও কৈশোরের ভেদরেখাটিও।

ইংরেজি 'চাইল্ডহুড'-এর বঙ্গানুবাদ 'শৈশব', 'জুভেনাইল'-এর বঙ্গানুবাদ 'কিশোর', এবং 'অ্যাডোলোসেন্স'-এর বাংলা অর্থ হচ্ছে 'বয়ঃসন্ধিকাল'। কিশোর অপরাধের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে শৈশব ও কৈশোরের ভেদরেখাটিকে প্রাসঙ্গিকভাবেই আমলে নিতে হবে। একজন ব্যক্তির শৈশবকে ৯ বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী বলে বিবেচনা করা হলে, তার কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকালের স্থায়িত্ব হবে ৯ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত। আবার বিবাহের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকাল ২১ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। মনোবিদরা ব্যক্তিভেদে শিশুকিশোরদের মানসিক বয়স বা পরিপক্বতার তারতম্যের কথা বলে থাকেন। বিবাহ-সংক্রান্ত আইনেও এর প্রতিফলন আছে। যেমন, ২০১৭ সালে বাংলাদেশে যে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন[৫] প্রণীত হয়েছে, সেখানে মেয়েদের বিয়ের বয়স ধার্য করা হয়েছে ১৮, এবং ছেলেদের ২১।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৮২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ৯ বছরের কম বয়সী ব্যক্তির কৃত কোন কাজ অপরাধ বলে গণ্য হবে না। আবার ৮৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ৯ - ১২ বছর বয়সী কোন ব্যক্তির কৃত কোন কাজও অপরাধ বলে গণ্য হবে না, যদি ওই ব্যক্তি তার কাজের ফলাফল সম্পর্কে বোঝার মত পরিপক্বতা অর্জন না করে থাকেন। দণ্ডবিধির এ দুটো অনুচ্ছেদের ভাষ্য ও শিশু আইনের বিধানাবলি আমলে নিয়ে বলা যেতে পারে যে, ৯ থেকে ১৮ বছর বয়সী, ক্ষেত্র বিশেষে ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী, কোন ব্যক্তি কর্তৃক দণ্ড আইন লঙ্ঘন করে করা কোন কাজকে কিশোর অপরাধ বলে।[৬]

বাংলাদেশে যে সহস্রাধিক আইন আছে তার মধ্যে ৩২টি আইনে শিশু সংক্রান্ত নানা বিধি বিধান আছে। এই ৩২টি আইনের মধ্যে আবার ৮টি আইন আছে, যে আইনগুলোতে সরাসরি শিশুর

সংজ্ঞার্থ, শিশু শ্রম, শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা, কিশোর অপরাধ, ও কিশোর ন্যায়বিচার ব্যবস্থার উল্লেখ আছে।[৭] বাংলাদেশে শিশু আইন, দণ্ডবিধি, শ্রম আইন, চুক্তি আইনসহ বিদ্যমান নানা আইনের মধ্যে শিশুর সংজ্ঞায়ন নিয়ে ভিন্নতা থাকায় প্রায়শই বিভ্রান্তি ও জটিলতা তৈরি হয়। যেমন, দণ্ডবিধির ৮২ ও ৮৩ ধারাকে পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে শিশু বলতে বুঝায় ১২ বছরের কম বয়সী কোন ব্যক্তিকে।[৮] বাংলাদেশের শ্রম আইন, ২০০৬[৯]-এর ২(৬৩) ধারায় বলা হয়েছে যে, "শিশু" অর্থ চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করেন নাই এমন কোন ব্যক্তি"। ওই একই আইনে কিশোর বলতে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সের কোন ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এদিকে শিশু আইন ২০১৩, মেজরিটি এ্যাক্ট ১৮৭২, এবং চুক্তি আইন ১৮৭২-এ শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সীদের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

বিভিন্ন আইনে শিশুর বিভিন্ন সংজ্ঞায়ন সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি করাতে পুলিশ ও প্রবেশন কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড, বিচার কাজ, এবং শিশু বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে নানা জটিলতা হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা মনে করি যে, শিশু আইন ২০১৩ এবং জাতিসংঘ শিশু সনদ ১৯৮৯-কে মান হিসেবে ধরে শিশুকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এবং শিশু ও কিশোরের অপরাধমূলক দায় নির্ধারণের জন্য দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক ধারাগুলোও বিবেচনায় নিতে হবে। আলোচনাটি যেহেতু কিশোর অপরাধ ও 'গ্যাং কালচার' নিয়ে, ফলে এ বিষয়ক বিশ্লেষণ, আলোচনা, ও উপসংহার টানার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিশু আইন, ও দণ্ডবিধি এবং জাতিসংঘ শিশু সনদকে মূল বিবেচনায় রাখতে হবে। এ বিষয়ে উচ্চ আদালতের রায়, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর বিধানাবলি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

এবার আসা যাক বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসংখ্যানে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশু-কিশোরের সংখ্যা ৪ কোটি। এই ৪ কোটির মধ্যে ১৩ লক্ষ শিশু ও কিশোর ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে যুক্ত, যাদের ৭০ শতাংশ অর্থাৎ ৯ লক্ষ ১০ হাজার শিশুকিশোর আবার দারিদ্র্যের কারণে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য মতে, ২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী শতকরা ৪৪ ভাগ পথশিশু মাদক চালানের সঙ্গে জড়িত; ৩৫ ভাগ পথশিশু জড়িত পিকেটিং-এর সাথে; ১২ ভাগ জড়িত ছিনতাইয়ের সাথে; ১১ ভাগ জড়িত মানব পাচারের সাথে; এবং ২১ ভাগ পথশিশু অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।[১০]

মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ পথশিশু মাদকে আসক্ত এবং এদের মধ্যে ৩০ শতাংশ পথশিশু তাদের মাদক গ্রহণের ব্যয় মেটাতে নানা ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৫ সালে ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশু কিশোরদের মধ্যে অনেকেই ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক আটক হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র বহন, হত্যা, মাদক চালান, ডাকাতি, চুরি, রাজনৈতিক সহিংসতা ও যৌন হয়রানির দায়ে।[১১]

অপরাধের সঙ্গে শিশু কিশোরদের সংশ্লিষ্টতা বাড়ছে কি না তা জানার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্যোগী হয়ে ২০০৮ সালে একটি গবেষণা করেছিল। ওই গবেষণার ফল অনুযায়ী, শিশু ও কিশোর অপরাধীদের গড় বয়স ছিল ১৪ দশমিক ৯ বছর। যে সকল কারণে শিশু ও কিশোরেরা বিপদের মুখোমুখি এসে দাড়ায়, বড় দাগে তার তালিকাটি এ রকম– পারিবারিক দারিদ্র্য অথবা

প্রাচুর্য, শিক্ষার অভাব, মূল্যবোধের সংকট, অভিভাবকের উদাসীনতা অথবা শাসনহীনতা, পরিবারের ভিতরে অপরাধীর উপস্থিতি ইত্যাদি। সচ্ছল অথবা মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশু কিশোরেরা বন্ধু বান্ধবদের সাহচর্যে অপরাধ জগতের দিকে পা বাড়ালেও দরিদ্র শিশুরা অন্ধকার জগতের দিকে পা বাড়ায় অপরাধীদের সংসর্গে, যারা অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের কথা বলে শিশু কিশোরদের অপরাধের দিকে নিয়ে যায়। এছাড়া সামাজিক বৈষম্যও কোন কোন শিশুর অপরাধপ্রবণ হবার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য হচ্ছে, যে সকল শিশু কিশোর বিচ্যুত হয়েছে বা অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, তাদের ৮০ শতাংশই জানে যে তারা অপরাধ (অথবা সমাজবিরোধী কাজ) করছে। তারা স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, দারিদ্র্যের কারণেই তারা অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছে।[১২]

সমাজ ও রাষ্ট্রভেদে নানা কারণে কিশোর অপরাধ হলেও তার মধ্যে কয়েকটি কারণ প্রায় সকল রাষ্ট্রেই দেখা যায়; যেমন—ভাঙা পরিবার, বৈষম্য, দারিদ্র্য, পারিবারিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সংকট ইত্যাদি। বিভিন্ন গবেষকের প্রবন্ধেও এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং ওয়েস্টার্ন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের পরিচালক রোনাল্ড সি ক্রামার তাঁর এক প্রবন্ধে বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে সংঘটিত 'স্কুল শুটিং' বা বিদ্যালয়ে বন্দুক হামলার কারণ হিসেবে সামাজিক সমস্যাকেই দায়ী করা চলে। ক্রামার শক্তিশালী যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে বলেন, বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ যেমন, দারিদ্র্য, বৈষম্য, এবং 'সোশ্যাল এক্সক্লুশন' বা সামাজিক বহিষ্কার অ্যামেরিকার অধিকাংশ যুবা-সহিংসতার মূল কারণ।[১৩]

কিশোর অপরাধ, তার কারণ, এর সমাধান, বা পুরোপুরি সমাধান না হলেও এটিকে সহনীয় মাত্রায় কমিয়ে আনা যায় কি না, কিশোর সংশোধন ও কিশোর পুনর্বাসন – ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সমাজবিজ্ঞান ও অপরাধবিজ্ঞানে নানা তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে রবার্ট কে মার্টন-এর 'অ্যানোমি' তত্ত্ব (মূল তত্ত্বটি যদিও এমিল ডুরখাইমের), কোহেনের 'সাবকালচারাল থিয়োরি', ক্লোয়ার্ড ও ওহলিনের 'ডিফরেন্‌শিয়াল অপরচুনিটি থিয়োরি', ক্লিফোর্ড শ' এবং হেনরি ম্যাককেএ-র 'সোশাল ডিসঅরগানাইজেশন থিয়োরি', হিরশি কর্তৃক প্রদত্ত 'কন্ট্রোল থিয়োরি' উল্লেখযোগ্য। এই সব তত্ত্বে বারবার কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে বৈষম্য, দারিদ্র্য, এবং নিম্ন-শ্রেণি বা প্রান্তিক পরিবারের শিশু-কিশোরদের নানা বঞ্চনার কথা এসেছে।[১৪]

বয়ঃসন্ধিকালের আবিষ্কার, শৈশবের গুরুত্ব ও কিশোর অপরাধের সূচনা

ইংল্যান্ডের অপরাধ, ন্যায়বিচার ও যুব অধ্যয়ন বিশেষজ্ঞ টিম নিউবার্ন (Tim Newburn) তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন যে, 'ইয়ুথ' বা যৌবনকাল ধারণাটি স্থিতিস্থাপক; কেননা, এটি দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জিনিস বুঝিয়ে থাকে। তরুণ মানুষ বলতে 'টিনএজারস' বা ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের বা বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত কিশোর ও কিশোরীদের বুঝায়। আমরা যে সময়ে বসবাস করছি, অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ সমাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তি মানুষের জীবনকে বড় দাগে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়— এক. 'চাইল্ডহুড' বা শৈশব; দুই. 'অ্যাডোলোসেন্স' (Adolescence) বা বয়ঃসন্ধিকাল; তিন. 'অ্যাডাল্টহুড' বা প্রাপ্তবয়স্ককাল। বয়সের হিসেবে জন্ম গ্রহণের পর থেকে ৯ বছর পর্যন্ত শৈশব; ৯ বছর থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত বয়ঃসন্ধিকাল; ১৮ বছর থেকে বাকি সময়টি প্রাপ্ত বয়স্ককাল বলে ধরা হয়।[১৫]

মনে রাখতে হবে যে, একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের গড় আয়ু যখন সমাজভেদে ৬০ থেকে ৯০ বছর, তখন আমরা ব্যক্তি মানুষের জীবনকে শৈশব, বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রাপ্তবয়স্ককাল বলে ভাগ করছি, এই বিভাজন কিন্তু ইতিহাসের সকল সময়ে সকল সমাজে এই রকমভাবে ছিল না। বরং এই ধারণা করাই যথাযথ হবে যে, এই বিভাজন সামাজিকভাবে নির্মিত এবং এই বিভাজনের নিজস্ব ইতিহাস আছে। ফরাসি ঐতিহাসিক ফিলিপ এরিএস (Philippe Aries) জানাচ্ছেন যে, মধ্যযুগে শৈশব ছিল ক্ষণস্থায়ী। মধ্যযুগে সাত বছর বয়সেই শৈশব শেষ হয়ে যেত; কেননা, শিশুদের প্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে মিশিয়ে ফেলা হত যখন তারা মা বা নানিদের সহায়তা ছাড়া কাজ করতে পারত।[১৬]

তখনকার সমাজ, অর্থাৎ ইউরোপীয় সমাজ, পদমর্যাদা দ্বারা বিভক্ত ছিল, বয়সের সঙ্গে সমাজ কাঠামোর কোন সম্পর্ক ছিল না। এটি ছিল বিভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন 'ডেমোগ্রাফিক' বা জনতাত্ত্বিক কাঠামোর বহিঃপ্রকাশ। তখনকার সমাজে মানুষের গড় আয়ু ছিল মোটে ৩২ বছর। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শৈশবের সময়কাল বাড়তে থাকে এবং এটি সাবালকত্ব বা প্রাপ্তবয়স্ককাল থেকে পৃথক হতে শুরু করে। ফিলিপ এরিএসের মতে, ঠিক ওই সময় থেকে আমরা বয়ঃসন্ধিকালের মানুষ অথবা শিশু কিশোরদের শারীরিক, নৈতিক ও যৌন বিকাশ নিয়ে ভাবতে শুরু করি। যখন থেকে শৈশব মানব জীবনের একটি ভিন্ন বিভাগ বা বর্গ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে আরম্ভ করে, তখন থেকে এই ধারণাও বিকশিত হতে থাকে যে, শিশুদের (প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য) ব্যাপারে রয়েছে একটি দায়িত্ব এবং তাদের সুরক্ষা প্রয়োজন।[১৭]

আজকে বৈশ্বিকভাবে শিশুদের সুরক্ষা ও নিবিড় পরিচর্যার যে কথা বলা হয়, সেই ধারণার সূত্রপাত সেই সময়ের গর্ভে যখন থেকে শৈশব মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ বলে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। একথাও আজ স্বতঃসিদ্ধ যে, শিশুদের মধ্যে ভাল এবং খারাপ এই দুই সম্ভাবনাই নিহিত থাকে, খারাপের ওপর ভাল যেন জাঁকিয়ে বসতে পারে সেজন্যে শিশুদের সুরক্ষা, শৃঙ্খলা ও সুস্থ পারিবারিক পরিমণ্ডল প্রয়োজন। যেহেতু জীবনের দুটি প্রান্ত ক্রমাগতভাবে পৃথক হতে থাকল; কাজকর্মের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ ও শিক্ষার আনুষ্ঠানিকীকরণ বা সুনির্দিষ্ট রূপদানের মাধ্যমে দুটির পরিবর্তন বর্ধিত হতে থাকল; সুতরাং একটি নতুন মধ্যবর্তী ভাগের বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দিল; আর এই মধ্যবর্তী সময় বা ভাগকে আমরা বলছি 'অ্যাডোলোসেন্স' বা বয়ঃসন্ধিকাল। ফিলিপ এরিএস বলছেন, "আমাদের সমাজ এমন একটি সময় অতিক্রম করে এসেছে যে সময় বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। বর্তমানে ব্যক্তি মানুষের জীবনের সবচেয়ে পছন্দের সময় হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকাল। আমরা এখন যত দ্রুত সম্ভব বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত হতে চাই এবং যতটা সম্ভব এটিকে বিলম্বিত করতে চাই।"[১৮]

ঐতিহাসিক ফিলিপ এরিএস বয়ঃসন্ধিকালের যে উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তার কথা বলেছেন, সেটি কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বের বাস্তবতা। আমাদের বাংলাদেশে শৈশব ও বয়ঃসন্ধিকালের গুরুত্ব সাধারণ মানুষের জীবনের উপলব্ধি, চেতনা ও মননে এমন করে এখনও আসেনি। পরিবারে ও বিদ্যালয়ে শিশু কিশোরদের প্রতিনিয়ত মারধর করা এবং বড়দের ইচ্ছে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো তারই প্রমাণ বহন করে। তবে পরিবর্তন আংশিকভাবে হলেও এসেছে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও সচেতন পরিবারগুলোতে। আর

বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে আইন কানুনগুলোতে; যেমন, ২০১৩ সালের শিশু আইন। তবে শিশুর শারীরিক, মানসিক, যৌন ও বুদ্ধিবৃত্তিক সুষ্ঠু বিকাশের প্রক্রিয়াকে মসৃণ করার জন্য শৈশব ও বয়ঃসন্ধিকালের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে – এই পশ্চিমা ধারণাটি আমাদের সমাজ-মানসে এখনও অনুপস্থিত বললেই চলে।

আধুনিক বয়ঃসন্ধিকাল দৃশ্যমান হতে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। কারখানা আইনগুলো কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করতে শুরু করে। ১৮৭০-এর দশক থেকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আরম্ভ হয়, এবং ধীরে ধীরে 'আরবান ওয়ার্কিং-ক্লাশ ইয়ং পিপল'দের শ্রেণি গড়ে উঠতে থাকে, এবং ওটাই ছিল প্রথম আধুনিক 'ইয়ং সাবকালচার' বা শিশু কিশোরদের উপসংস্কৃতি।[১৯] উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে 'স্কাটলারস' ও 'পিকি ব্লাইন্ডারস'দের কথা।[২০] কিশোর অপরাধী এবং যারা অপরাধের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তাদের দেখভাল করার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করল এবং এমন একটি পরিস্থিতিতেই 'জুভেনাইল জাস্টিস সিস্টেম' বা কিশোর ন্যায়বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠল।

প্রাসঙ্গিকভাবেই আলোচনা হতে পারে বাংলাদেশের কিশোর ন্যায়বিচার ব্যবস্থা নিয়ে। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বৈশ্বিক মানচিত্রে স্থান করে নেওয়ার পরে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণীত হয়। এই আইনে শিশুকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল ১৬ বছরের কম বয়সী ব্যক্তি হিসেবে। পরবর্তীকালে জাতিসংঘের ১৯৮৯ সনের শিশু সনদের সংজ্ঞার্থের সঙ্গে এটি সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। তবে শিশুদের সর্বোচ্চ কল্যাণকে গুরুত্ব প্রদান, কিশোর অপরাধীদের নিরাপদ হেফাজত, জামিন, বিচার, পরিবার বা সমাজে রেখে শিশু-কিশোরদের সংশোধনের ব্যবস্থা, কিশোর সংশোধন কেন্দ্র ও কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কারণে বিশেষজ্ঞ, আইনের অধ্যাপক, বিচারক ও আইনজীবীরা ১৯৭৪ সালের আইনকে একটি শিশুবান্ধব আইন বলে মনে করেন। এতদসত্ত্বেও, জাতিসংঘ শিশু সনদ-১৯৮৯ এর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ও উচ্চ আদালতের শিশু বিষয়ক কিছু রায় বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭৪ সালের আইনকে রদ করে শিশু আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়।[২১]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বয়ঃসন্ধিকাল দৃশ্যমান হতে শুরু করার পর থেকে সমগ্র বিংশ শতাব্দী ধরেই বয়ঃসন্ধিকালের গুরুত্ব বেড়েছে। আর আংশিকভাবে হলেও বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং পরিবার নামক সংগঠনের পরিবর্তনের সঙ্গে এটি সম্পর্কিত। সর্টার ও স্টোন (Shorter and Stone) দাবি করছেন যে, পারিবারিক সংগঠনে এই পরিবর্তন দুটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত: এক. 'মার্কেট ক্যাপিটালিজম' বা বাজার পুঁজির বিকাশ, এবং দুই. দার্শনিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তা চেতনায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের উত্থান। এর চূড়ান্ত ফলাফল হচ্ছে—ধারাবাহিকভাবে পরিবার নামক সংগঠনের এমন একটি ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি এককে নিঃসঙ্গীকরণ যা এখন আমরা দেখছি।[২২]

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে বিশ্রামের সময় বাড়তে থাকে এবং বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত যুবক যুবতীরা শহর ও শিল্পনগরীতে বেশ ভালো রকমের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগ করতে শুরু করে। এই সময় থেকে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরা সমুদ্র সৈকতে শ্রমিক শ্রেণির অবসর যাপনকালীন আচরণ, মিউজিক হল ও সিনেমা হলের প্রভাব, জুয়া, মদ্যপান ও ফুটবল খেলায় স্থানীয় বখাটেদের সহিংস কর্মকাণ্ড নিয়ে উৎকণ্ঠিত হতে শুরু করলেন।[২৩] এব্যাপারে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

হচ্ছে – সমাজে তরুণ বা শিশু-কিশোরদের কী দৃষ্টিতে দেখা হত বা হয়? আর 'যুবক' ও 'অপরাধে'র মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কই বা কি ছিল?

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের অনেক দেশে যুবক ও যুবতীরা 'সমস্যা' বলে গণ্য হত, এবং প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে 'যুবক' ও 'অপরাধে'র মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান বলে মনে করা হত। পিয়ারসনের (Pearson) প্রতিপাদ্যে 'যুবক-অপরাধ নিবিড় সম্পর্কে'র ধারণাটি সমান্তরালভাবে হারিয়ে যাওয়া 'সোনালী যুগে'র নিস্তরঙ্গতা ও প্রশান্তির জন্য যে ধারাবাহিক নস্টালজিক আকুতি তার সঙ্গেও জড়িত।[২৪] পিয়ারসনের মতে, শিশু ও কিশোরদের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তরুণ প্রজন্মের শৃঙ্খলা ও সফল সামাজিকীকরণের ওপর। একবার এটি অর্জিত হয়ে গেলে আগের প্রজন্ম অর্থাৎ যে শিশু-কিশোরদের একদা ভয় ও উৎকণ্ঠার কারণ বলে চিহ্নিত করা হত, তাদেরই অধিকতর ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করার প্রবণতা দৃশ্যমান হয়। আর এমন একটি চক্র থেকেই উত্থিত হয়েছে শিশু-কিশোরদের নিয়ে সদা-বিদ্যমান উৎকণ্ঠাটি। যৌবনকালকে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিভাবে চিত্রিত করা হয়, এবং বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে কী ধরনের উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হয়, তার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে থাকে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা।[২৫]

বাংলাদেশে শিশু-কিশোরদের ওপর অপরাধ আরোপের বিষয়টি কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনা। যদিও বিংশ শতাব্দীর ৪০-এর দশক থেকেই কিশোর অপরাধের পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দৃশ্যমান হচ্ছে গত ৩ দশকে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের দ্রুতগতির সঙ্গে। ১৯৮০র দশকের গোড়ার দিকেও গ্রাম বাংলায় শিশু-কিশোরদের সম্পর্কে প্রচলিত কথা ছিল, "পোলাপান মানুষ, না বুঝে করেছে"। তখনকার এবং তার আগের গ্রাম-বাংলায় বাবা-মা, বয়স্ক ও মুরব্বীরা শিশু-কিশোরদের 'নির্দোষ' মনে করতেন, এবং কেউ কোন অপরাধ বা বখাটেপানা করলে, সেটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখাই ছিল প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি।[২৬]

কয়েক দশক আগেও বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে একটু দুরন্ত বা 'বখাটে' শিশু-কিশোরেরা ব্যক্তিগতভাবে বা দল বেঁধে যে কাজগুলো করত, তার তালিকায় ছিল - অন্যের গাছের ডাব, আম, লিচু, পেয়ারা ইত্যাদি মালিকের অনুমতি ছাড়াই পেড়ে খাওয়া; রাতের বেলা বড় গৃহস্থের মুরগি বা ছাগল চুরি করে রান্না করে ভুরিভোজ করা; স্কুল পালানো; বিড়ি/সিগারেট বা হুক্কা টানা; বাড়ি পালিয়ে যাত্রা দেখা; রাত জেগে বিল-ঝিলে মাছ ধরা ইত্যাদি। 'পোলাপানদের' এসব কাজকে কেউ অপরাধ মনে করতেন না। বাংলাদেশের গল্প-উপন্যাস ও আত্মজৈবনিক গ্রন্থে এ ধরনের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবহমান কালের গ্রাম বাংলায় বিদ্যমান শিশু-কিশোরদের এই 'নির্দোষিতার চাদর' নির্মমভাবে তুলে নেয় পরিবর্তিত বাস্তবতার নিষ্ঠুর হস্তসমূহ। প্রধানত কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের সমাজে শিশুরা ছিল নদী ও ধানক্ষেতের মত প্রকৃতির অংশ। মা-মুরগি তার বাচ্চাদের যেভাবে আগলে রাখে যুবক-যুবতীরা এ সমাজে সেভাবে সুরক্ষা পেত, কিন্তু দ্রুত এটি উধাও হতে শুরু করল।[২৭]

জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণে কৃষিজমি হ্রাস, নদী ভাঙন, ভূমির অবক্ষয়, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপুল সংখ্যার জনগণ নিঃস্ব হয়ে গেলেন; জীবন ও জীবিকার সন্ধানে ব্যাপক হারে তারা নতুন করে গড়ে ওঠা শহরগুলোতে অভিবাসন করলেন; মূলত তারা ঘাঁটি গাড়লেন ঢাকা শহরে।

তবে তাদের কেউ কেউ জীবন রক্ষা ও কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম, ও খুলনা, বিভাগীয় শহর রংপুর, ও বরিশাল অথবা কোন জেলা শহরে গিয়ে থিতু হলেন। নিঃস্ব ও সর্বহারা মানুষেরা তাদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে শহরগুলোর বস্তি, ফুটপাত, বাস স্টেশন বা ট্রেন স্টেশনে গিয়ে আশ্রয় নিলেন এবং এখানে তাদের জীবনমান হল মানবেতর। গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক জীবনে যে শিশুরা ছিল প্রকৃতির অংশ, যারা ছিল নদী, ধানক্ষেত, পাখি ও গাছেদের মত; যাদের বখাটেপনা বা অপরাধকে 'নিষ্কলুষতা' ও 'সারল্যে'র চাদরে ঢেকে রাখা হত, সেই শিশুরা বস্তি ও ফুটপাতের পরিবেশে এসে অপরাধের শিকারে পরিণত হল।[২৮]

অধিকার-বঞ্চিত ও বৈষম্যপীড়িত এই সকল শিশু, কিশোর ও কিশোরীরা হয় প্রাপ্তবয়স্কদের (মূলত অপরাধীদের দল কর্তৃক) দ্বারা অপরাধমূলক কাজে ব্যবহৃত হতে শুরু করল, অথবা দারিদ্র্যের কারণে নিজেরাই নানা ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি ভাগ্যবিড়ম্বিত কত শিশু অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, সে সংখ্যাটি কেউ জানে না। শুধু যে সকল কিশোর কারাগারে এবং যে সকল শিশু সংশোধন কেন্দ্রে মানবেতর জীবন যাপন করছিল, তাদের সংখ্যা দেখে আন্দাজ করা গিয়েছিল যে, বাংলাদেশের কিশোর ন্যায়বিচার ব্যবস্থার সংস্পর্শে কী পরিমাণ শিশু কিশোর এসেছে। এর চেয়ে মর্মান্তিক বিষয় হচ্ছে, মূলধারার সমাজ কারাগার ও সংশোধন কেন্দ্রের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী শিশু-কিশোরদের ভুলেই গিয়েছিল।[২৯]

নতুন নতুন জেলা শহরের বিকাশ, কৃষিজমি হ্রাস, নদী ভাঙন, ভূমির অবক্ষয়, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মত মেগাসিটির গড়ে ওঠা, গাজীপুর-নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনার চারপাশে শিল্প-কারখানা স্থাপন ইত্যাদি নানা কারণে বাংলাদেশের গ্রামভিত্তিক কৃষিকেন্দ্রিক সমাজে পরিবর্তনের সূচনা হল। সমাজের এই পরিবর্তনটি অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে ছিল দ্রুততর। এই পরিবর্তনের অভিঘাত শহুরে সমাজে যেমন অনুভূত হল, তেমনি এর বিরূপ প্রভাব পড়ল গ্রামীণ, নদী-ভাঙন-প্রবণ এলাকা, এবং মঙ্গাপীড়িত জনপদেও। ফলে, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যাপক হারে অভিবাসন হল গ্রাম থেকে শহরে।[৩০]

এই অভিবাসন ও সামাজিক পরিবর্তনের এক বড় শিকারে পরিণত হল গ্রাম থেকে শহরে আসা শিশু ও কিশোরেরা। কেননা, গ্রামবাংলার প্রকৃতির মধ্যে থাকা 'সুরক্ষিত' শিশু ও কিশোরেরা শহরের বস্তি ও ফুটপাতের মানবেতর ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এসে জড়িয়ে পড়ল নানা ধরনের অপরাধের সাথে। এই সকল শিশুদেরও যে আইনি সুরক্ষা পাবার অধিকার আছে শিশু আইন ১৯৭৪ থাকার পরেও নীতিনির্ধারকেরা সে বিষয়ে খুব বেশি ওয়াকিবহাল ছিলেন না।[৩১] কিন্তু নব্বই-এর দশকে বাংলাদেশ কর্তৃক জাতিসংঘ শিশু সনদ, ১৯৮৯ অনুমোদন করার পরে এ বিষয়ে নতুন সচেতনতা সৃষ্টি হল। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি সংগঠনের শিশু বিষয়ক নানা কর্মকাণ্ড এবং উচ্চ আদালতের দেওয়া রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে নীতিনির্ধারকেরাও শিশু অধিকার ও কিশোর অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বের তুলনায় তৎপর হয়ে উঠলেন।

বয়ঃসন্ধিকাল ও তরুণ-তরুণীর শরীর ও মনোজগতের ওপর তার অভিঘাত বিষয়ক আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বয়ঃসন্ধিকালের আবিষ্কারটি অ্যামেরিকান মনোবিদ জি. স্টেনলে হলের (G. Stanley Hall) নামের সঙ্গে জড়িত; বিশেষ করে যে বয়ঃসন্ধির শুরু মনস্তত্ত্বের একটি স্তর হিসেবে সাবালকত্বের প্রারম্ভে। তার যে মডেলটিকে প্রায়শই 'স্টর্ম অ্যান্ড স্ট্রেস' মডেল বা 'ঝড় ও

চাপে'র মডেল বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাতে বয়োঃসন্ধিকে হরমোনাল ভাঙাগড়ার সময় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে; যে সময়ে তাদের চাহিদা পূরণ করার জন্য স্বাধীনতা দরকার এবং শৃঙ্খলা আত্মস্থ করার জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, অপরাধ বিষয়ক প্রথম দিকের তত্ত্বগুলো মনস্তত্ত্বের নানা উপাদানের সঙ্গে শারীরিক নিয়ন্ত্রণবাদের কথা বলেছে। পরবর্তী তত্ত্বগুলোতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের পাশাপাশি বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কথাও এসেছে। ফলে কিশোর অপরাধকে অপর্যাপ্ত আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও বাবা-মায়ের পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণের অভাবের ফলাফল হিসেবে দেখা হতে থাকে।[৩২]

সকল দাপ্তরিক সূচকগুলো বলছে যে, কিশোর অপরাধ ১৯৩০-এর দশকে, বিশেষ করে অ্যামেরিকা, ব্রিটেন ও ইউরোপের দেশগুলোতে ধীর গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং কিছু উত্থান-পতন থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তা দ্রুত গতিতে বেড়ে যায়। বেইলি জানাচ্ছেন যে, যুদ্ধকালীন সময়ে কিছু কারণে কিশোর অপরাধ বেড়ে গিয়েছিল, আর এ কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– ব্ল্যাক আউট, কিশোর শ্রমের উচ্চ মূল্য, পারিবারিক ভাঙন, স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। মূলত কিশোর অপরাধের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যে তত্ত্বগুলো গড়ে উঠেছে, সেই তত্ত্বগুলোতে বারংবার একটি কারণ উঠে এসেছে, তা হচ্ছে – পারিবারিক ভাঙন বা পারিবারিক 'ডিসফাংশন' বা পরিবারের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যত্যয়।[৩৩]

বাংলাদেশের কিশোর অপরাধঃ স্বাধীনতার আগে ও পরে

শিশু, কিশোর কিশোরী ও উঠতি বয়সের যুবক ও যুবতীরা একটি দেশ ও সমাজের ভবিষ্যৎ; কেননা, প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা সমাপ্ত করে তারাই দক্ষ মানবশক্তিতে পরিণত হবে, এবং প্রশাসন, বিচার বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, আইন প্রণয়ন ব্যবসা-বাণিজ্য, নীতি নির্ধারণসহ দেশের সামগ্রিক উৎপাদন ও উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এই শিশু, কিশোর ও কিশোরীরা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ। ইউনিসেফ-বাংলাদেশ-এর উপাত্ত অনুযায়ী, বাংলাদেশে আঠার বছরের কম বয়সী মানুষের সংখ্যা ৫৭. ১৫ মিলিয়ন; আর পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা ১৫.৬ মিলিয়ন।[৩৪] বয়ঃসন্ধিকালের (১০ থেকে ১৯ বছর) কিশোর ও কিশোরীরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ।

বয়ঃসন্ধিকাল হচ্ছে শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ককালে উত্তীর্ণ হবার একটি 'স্ট্রাইকিং শিফট' বা লক্ষ্যণীয় বাঁক; যেটি কৈশোরের প্রারম্ভে অবস্থান করে। বাংলাদেশের সমাজে বয়ঃসন্ধিকাল এখনও জীবনের 'ট্রানজিশনাল' বা উত্তরণমূলক ও 'ফরমেটিভ' বা গড়ে ওঠার বয়স বলে স্বীকৃতি পায়নি। উপরন্তু, ছেলে ও মেয়েদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি ভিন্ন। ফলে, মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে নানা ধরনের বৈষম্য ও নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। শৈশব থেকেই ছেলেরা মেয়েদের চাইতে অধিক স্বাধীনতা ও সুবিধা ভোগ করতে শুরু করে, যদিও বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে সমাজের এমন কিছু সাধারণ নেতিবাচক প্রবণতা আছে যার শিকার হতে হয় ছেলে ও মেয়ে উভয়কে। উঠতি বয়সের মেয়েদের যেখানে বৈষম্য, যৌন হয়রানি ও পুরুষ আধিপত্যের শিকার হতে হয়; কিশোরেরা শিকার হয় অপর্যাপ্ত পুষ্টি, শিশুশ্রম, শোষণ ও সহিংসতার।[৩৫]

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১২ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে ১ হাজার ১ শ' ২২ জন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে।[৩৬] বাংলাদেশ পুলিশ

কৃর্তক সন্নিবেশিত অপরাধের তুলনামূলক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত নারী ও শিশু নির্যাতনের কারণে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩ শ' ৭৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৩৭] এ পরিসংখ্যানে নারী ও শিশুদের নাজুক অবস্থা ফুটে উঠেছে।

প্রামাণিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে কিশোর অপরাধের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে শিশু-কিশোরদের দল সংস্কৃতির যে বিস্তৃতি দেখা যাচ্ছে, সেটি একবিংশ শতাব্দীর নগরায়িত ও শিল্পায়িত বাংলাদেশের বাস্তবতা, যে বাংলাদেশে মানুষের ওপর পরিবার, নৈতিকতা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রভাব ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। কয়েক দশক আগে কিশোর অপরাধ বলতে মিথ্যা কথা বলা, ছোট খাট চুরি, স্কুল বা বাড়ি পালানো, ধূমপান করা বা মাদক সেবন, কিশোর কর্তৃক কিশোরীদের নোংরা বা অশ্লীল কথা বলা ইত্যাদিকে বোঝাত। কিন্তু নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশের কিশোর এবং কিশোরীরা নানা ধরনের সহিংস ও ভয়াবহ সব অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। কিশোর অপরাধের ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বয়সের কিশোরেরা যে সকল অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে সেগুলো হল—চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, এসিড ছুঁড়ে মারা, মেয়েদের উত্যক্ত করা, মাদক সেবন ও মাদক চোরাচালান, যৌন অপরাধ ও হত্যাকাণ্ড। আর কিশোরীদের সংশ্লিষ্টতা দেখা যায় চুরি, মাদক চোরাচালান, প্রতারণা এবং অবৈধ অস্ত্র ও মাদক বহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে।[৩৮]

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশে চুরি ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধে কিশোর ও কিশোরীদের সংশ্লিষ্টতা দেখা যায়। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৪৮ সালে সংঘটিত কিশোর অপরাধের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৫ শ' ১৩টি; ১৯৫৪ সালে ৫ হাজার ৩ শ' ৩৬টি; ১৯৫৯ সালে ৮ হাজার ৪২টি; ১৯৬০ সালে ৪ হাজার ৬ শ' ৮৬টি; ১৯৬১ সালে ৩ হাজার ৮৫টি এবং ১৯৬২ সালে ২ হাজার ৪ শ' ৪৩টি। এ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ষাটের দশকে কিশোর অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করে।[৩৯]

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, রাজনৈতিক সহিংসতা ও সামাজিক মূল্যবোধের বিচ্যুতি লক্ষ করা গেলেও কিশোরদের মধ্যে 'গ্যাং কালচার' দেখা যায়নি বা তারা 'রক অ্যান্ড রোল' ও 'হিপ্পি'দের মত দলও গড়ে তোলেনি। তবে স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ের মত স্বাধীন বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ ছিল এবং এখনও আছে। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৮৪ সালে মোট কিশোর অপরাধের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৪ শ' ৮৯টি, এর মধ্যে কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৯ শ' ৫০টি এবং কিশোরীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ছিল ৫ শ' ৩৯টি। ১৯৮৫ সালে মোট কিশোর অপরাধের সংখ্যা ছিল ৬ হাজার ১ শ' ২০টি, এর মধ্যে কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ৬ শ' ৫৯টি এবং কিশোরীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ছিল ৬ শ' ৫১টি। ১৯৮৬ সালে মোট কিশোর অপরাধের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৯ শ' ৮৩টি, এর মধ্যে কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৫ শ' ১৭টি এবং কিশোরীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ছিল ৪ শ' ৬৬টি।[৪০]

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, কিশোর অপরাধের আলোচনার সময়ে কিশোরী অপরাধের বিষয়টি আমাদের মত সমাজে অনেক সময়ে চাপা পড়ে যায়। কিশোরীদের অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা

যেমন কিশোরদের তুলনায় অনেক কম, তেমনি জাতীয় পর্যায়ে নারী-পুরুষ কারাবন্দির হার হচ্ছে– ৩.৮ : ৯৬.২ শতাংশ। ২০১৭ সালের উপাত্ত এটি[৪১]; আর এ তথ্য-উপাত্ত থেকে অপরাধে একটি সমাজের নারী-পুরুষের সংশ্লিষ্টতার হার ও মাত্রা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে কিশোরীদের সংশ্লিষ্টার হার সম্পর্কেও গবেষকদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে ওপরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৮৪ সালে কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরী অনুপাত ছিল – ৮৪.৫৬ : ১৫.৪৪ শতাংশ এবং ১৯৮৬ সালে এই অনুপাত ছিল – ৮৮.৩০ : ১১.৭০ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, অপরাধের ধরনের আলোচনায়ও লৈঙ্গিক বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ; কেননা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি ধরনের সহিংস অপরাধে পুরুষ বা কিশোরদের সংশ্লিষ্টতা দেখা যায়; এবং নারী বা কিশোরীদের দেখা যায় মাদক বহন, পতিতাবৃত্তি, প্রতারণা ইত্যাদি ধরনের অপরাধে জড়িত হতে।[৪২]

কিশোর ও কিশোরীদের অপরাধে জড়িয়ে পড়া যে কোন সমাজের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও উপরোক্ত তথ্য-উপাত্তগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আগে ও পরে কিশোর অপরাধ ছিল ও আছে। গত শতাব্দীর ৫০, ৬০, ৭০ ও ৮০-এর দশকে কিশোর অপরাধের সংখ্যা ওঠানামা করলেও, সেটি সহনীয় পর্যায়ে ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। গত তিন দশক ধরে কিশোর অপরাধ আশংকাজনক হারে বাড়ছে। পুলিশের একটি সূত্র অনুযায়ী, ঢাকা শহরে অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৪০ শতাংশ কিশোর এবং এই কিশোরেরা ডাকাতি, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের মত অপরাধের সঙ্গে জড়িত।

বাংলাদেশে 'গ্যাং কালচার' : উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে গ্যাং কালচার বা শিশু-কিশোরদের দলগতভাবে অপরাধ করার সংস্কৃতি বছর তিনেকের হবে বলে উল্লেখ করা হলেও দেশের একটি প্রধান দৈনিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০১ সালে উত্তরায় 'ক্র্যাব গ্রুপ' বা কাঁকড়া দলের অবির্ভাবের মধ্য দিয়ে রাজধানীবাসীর পরিচয় ঘটে কিশোরদের দলবদ্ধ সন্ত্রাসের সঙ্গে।[৪৩] তবে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর বলছে যে, দল সংস্কৃতির নামে ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে ওঠা কিশোরদের দলগুলো প্রথমে নানা নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং শুরুতে 'পার্টি' করা, হর্ন বাজিয়ে প্রচণ্ড গতিতে মোটর সাইকেল চালানো ও সড়কে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার কাজে সংশ্লিষ্ট ছিল।[৪৪] ধীরে ধীরে এ দলগুলো নিজেদের মধ্যে সংঘাতে জড়ায়, ২০১৭ সালের ৬ জানুয়ারি সংঘাতের শিকার হয়ে নিহত হয় উত্তরার ট্রাস্ট স্কুল ও কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র আদনান কবির।[৪৫]

'গ্যাং কালচার' বা দল সংস্কৃতি বিষয়ে ধারণা পাওয়ার জন্য কিছু ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এব্যাপারে আদনান কবিরের ঘটনাটি বেছে নেওয়া যেতে পারে। ২০১৭ সালের ৬ জানুয়ারি শুক্রবার আদনানকে হত্যার জন্য বের হওয়ার আগে অভিযুক্ত 'ডিসকো বয়েজে'র কিশোরেরা তাদের ফেসবুকে গ্রুপ ছবি পোস্ট করে যায়। ওই ছবিতে 'ডিসকো বয়েজে'র সকলকে নীল রঙের পোশাকে দেখা যায় এবং তাদের কারও কারও হাতে ছিল হকিস্টিক। ওই কিশোরেরা সংখ্যায় ৩০/৩৫ জন ছিল বলে পুলিশের তদন্ত বলছে। আদনানের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পর তার পক্ষের এক কিশোর ফেসবুকে পাল্টা স্ট্যাটাস দিয়ে এই বলে হুমকি দিয়েছিল যে, 'ভাই তোর খুনিগো বাইর কইরা জবাই দিমু'।[৪৬]

পুলিশের সূত্র, গণমাধ্যমে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ও বিষয়ভিত্তিক গবেষকদের মতামত বিশ্লেষণ করে দল সংস্কৃতি সম্পর্কে যা জানা যায়, তার মোদ্দা কথা হচ্ছে, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার, ক্ষমতা প্রদর্শন, সমীহ আদায়, 'হিরোইজমে'র উন্মাদনা ইত্যাদি কারণে কিশোর তরুণরা ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও দেশের বিভিন্ন শহর এলাকায় নানা গ্যাং বা দল গড়ে তুলছে। এসব গ্যাং বা দল এলাকায় অধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে; কিশোরদের জন্য 'পার্টি' বা ফুর্তির আয়োজন করে; স্কুল-কলেজ থেকে চাঁদা আদায় করে; হর্ন বাজিয়ে প্রচণ্ড গতিতে মোটর সাইকেল বা গাড়ি চালায়; মেয়েদের উত্ত্যক্ত করাসহ নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিজেদের শক্তির জানান দেয়।[৪৭]

এসকল দলের কিশোর তরুণদের বয়স মূলত ১৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে হলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে ১১ - ২২ বছরের যুবকদেরও দলের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায়। এদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের কিশোর হলেও, নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান ও ঝরে পড়া কিশোরদেরও এসকল দলে দেখা যায়। কোথাও কোথাও আবার এমনও দেখা গেছে যে, পুরো দলটিই বস্তি বা প্রান্তিক পরিবারের শিশু-কিশোরদের দিয়ে গড়া। যেমন, খুলনা শহরে গড়ে ওঠা 'গোল্ডেন বয়েজে'র কিশোররা যেখানে সচ্ছল পরিবারের সন্তান, সেখানে 'টিএসপি' গ্রুপের তরুণদের সকলেই বস্তির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্র বলছে, শিশু-কিশোরদের এই দলগুলো অধিকাংশ সময়ই মাদক সেবন ও ব্যবসা এবং ছোটখাট অপরাধ করে থাকে।[৪৮]

নৃবিজ্ঞানের শিক্ষক আহসান হাবিব তার লেখা এক কলামে জানাচ্ছেন যে, ২০১০ সাল থেকে ঢাকা শহরের উত্তরা, গুলশান, ধানমণ্ডি ও মিরপুরসহ নানা আবাসিক এলাকার দেয়ালে অদ্ভুত সব শব্দ, যেমন—'গ্যাং জিরো জিরো নাইন', 'রিস্ক জোন', 'ভাই গ্যাং', 'নাইন স্টার', 'ডিসকো বয়েজ', 'হ্যালো গ্যাং' লেখা হতে থাকে। এটা অনুমান করা যায় যে, কালো, বেগুনি, নীল মার্কার পেন দিয়ে আনাড়ি শিল্পীর মত যে লেখাগুলো দেয়ালে লেখা হয়েছে তা কিশোরদের হাতের। এরকম অনেক লেখা এখন ঢাকা শহরের দেয়ালে লক্ষ করলেই দেখা যাবে। যে কিশোরেরা এ লেখা লিখেছে তারা নাকি বিভিন্ন দল গড়ে এখন নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েছে। শিশু কিশোরদের দ্বারা তৈরি এ সকল দলের রয়েছে নিজস্ব ফেসবুক পাতা; যেমন, উত্তরার নাইন স্টার গ্রুপের ফেসবুক পাতার আইডি হচ্ছে নাইন এমএম বয়েজ; এবং ডিসকো বয়েজ দলের ফেসবুক পাতার আইডি হচ্ছে ডিসকো বয়েজ উত্তরা।[৪৯]

শিশু-কিশোরদের দলগুলো তাদের আধিপত্য বিস্তার ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি যেমন স্মার্ট ফোন, ফেসবুক, ও ইউটিউব ব্যবহার করছে। উত্তরার গ্যাংগুলো ফেসবুকে হত্যা ও নানা ধরনের অপরাধ নিয়ে অলোচনা করত এবং দল বেঁধে মাঠে চাঁদা আদায়, ছিনতাই ও মারধরের মত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। এক দলের দেয়াল থেকে অন্য দলকে হুমকি দেওয়া হত। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে নিজেদের ফেসবুক দেয়ালে 'ডিসকো বয়েজ' নিজেদের মোটর সাইকেল শোভাযাত্রার ছবি দিয়ে পোস্ট দেয়– 'ডিসকো বয়েজ আসছে, উত্তরা কাঁপছে'। প্রতিপক্ষ 'নাইন স্টার' গ্রুপকে শায়েস্তা করার জন্য 'বিগ বস' গ্যাংয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা ফেসবুক পাতায় লিখেছিল, 'বিগবস-ডিসকো, টুগেদার হিয়ার টু সেভ ইউ ফ্রম বস্তি পিপল'। এসকল গ্যাংয়ের ফেসবুক দেয়াল জুড়ে ছুরি, গ্রেনেড, হাতুড়ি, স্ক্রুড্রাইভার ও পিস্তলের ছবি।[৫০]

উত্তরায় কিশোর আদনানের সংশ্লিষ্টতা ছিল 'নাইন স্টার' দলের সঙ্গে। 'ডিসকো বয়েজে'র সঙ্গে এই গ্রুপের বিরোধের জের ধরে 'ডিসকো বয়েজে'র আনুমানিক ত্রিশ জনের একটি দল আদনানকে নৃশংসভাবে খুন করে। আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে অভিযুক্তরা বলেছে, মামলার এক নম্বর আসামি নাঈমুর রহমান অনিক হকিস্টিক দিয়ে আদনান কবীরের মাথার পেছনে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর অন্য কিশোরেরা হাতুড়ি, স্ক্রু ড্রাইভার, রড ও ছুরি দিয়ে আঘাত করার পর আদনানকে রাস্তায় ফেলে যায়।[৫১]

ঘটনার বিস্তৃতি শুধু আদনান হত্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে বিষয়টিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা যেত। কিন্তু ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় বেশ কয়েকজন কিশোর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীও বলছে যে, শিশু কিশোরদের অনেকগুলো দল চুরি, চাঁদাবাজি, অপহরণসহ হত্যাকাণ্ডের মত অপরাধের সঙ্গে জড়িত।[৫২] এতে করে শিশু-কিশোরদের 'গ্যাং কালচার' বা অপরাধী দল গড়ে সন্ত্রাস ও সহিংসতা করার বিষয়টি বাংলাদেশের বিদ্যমান সমাজের এক নিষ্ঠুর বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজের অপরাধ, সন্ত্রাস ও সহিংসতার ক্ষেত্রেও এটি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এ বাস্তবতা যেমন গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে, তেমনি এর নির্মূল অথবা এর বিস্তার ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনার ব্যাপারে নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, বিচার বিভাগ ও বৃহত্তর সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায় রয়েছে।

বাংলাদেশে 'গ্যাং কালচার': বিস্তৃতি ও বাস্তবতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কিশোরদের গ্যাং তৈরি করে কৃত সহিংসতা। কিশোরদের গ্যাং বলতে সাধারণত নিজেদের দ্বারা তৈরি করা যুবকদের দলকে বোঝায়, যে দলের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে—একটি দলীয় নাম এবং স্বীকৃত প্রতীক, চিহ্নিত নেতৃত্ব, একটি ভৌগোলিক স্থান, সভার নিয়মিত ধরন, এবং অবৈধ কাজের জন্য সম্মিলিত কর্মকাণ্ড। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৪ থেকে ৩০ শতাংশ যুবক কোন না কোন সময়ে কিশোর দলের সঙ্গে যুক্ত হয়, যাদের গড় বয়স ১৪ থেকে ২৪ বছর।[৫৩]

১৯৮০ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিশোর দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক হিসেব অনুযায়ী, ১৯৮০ সালে সমগ্র মর্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২ হাজার কিশোর গ্যাং ছিল যার সদস্য সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ, ১৯৯৫ সালে কিশোরদের দলের সংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ২৩ হাজার যার সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৫০ হাজার। পরবর্তী সময়ের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে কিশোর দলের সহিংসতা হ্রাস পেলেও ২০০১ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে এটি বাড়তে থাকে এবং এরপর কিশোর দলগুলোর সংখ্যা ও বাস্তবতা অনেকটা একই রকম আছে। এ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ২৫ হাজার কিশোর দলকে সক্রিয়ভাবে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত দেখা যায় এবং এ দলগুলোর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার।[৫৪]

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নথিতে এমন তথ্য রয়েছে যে, ডেনভারে কিশোরদের ১৪ শতাংশ গ্যাং ভায়োলেন্স বা দলীয় সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত এবং সেখানকার ৮৯ শতাংশ সহিংস ঘটনার জন্য তারা

দায়ী। অথচ বাংলাদেশ পুলিশের নথিতে ঢাকা ও সমগ্র বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের গ্যাং বা অপরাধী দল ও তাদের সহিংসতার কোন পরিসংখ্যান নেই বললেই চলে।[৫৫] বাংলাদেশের রাজধানী, বন্দর নগরীসমূহ, বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে কতগুলো কিশোর গ্যাং সক্রিয় সে ব্যাপারে বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্ত থাকা প্রয়োজন। সরকারি সংস্থাগুলোর কাছে কিশোর গ্যাং সংক্রান্ত কমপিউটারাইজড ডাটাবেজ থাকা যেমন প্রয়োজন; তেমনি বাংলাদেশ পুলিশের একটি পৃথক শাখা প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যেটির নাম হবে– 'জুভেনাইল পুলিশ'।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ শিশু আইন ২০১৩-এ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিটি থানায় একটি 'চাইল্ড ডেস্ক' স্থাপন এবং একজন ক্যাপো বা 'চাইল্ড অ্যাফেয়ার্স পুলিশ অফিসার' নিয়োগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।[৫৬] কিন্তু প্রতি থানায় এখনও এটি করা হয়নি। ঊর্ধ্বমুখী কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও 'গ্যাং কালচার'-এর বিস্তৃতি রোধ করার জন্য আপ টু ডেট ডাটাবেজ যেমন প্রয়োজন; তেমনি বাংলাদেশ পুলিশের মধ্যে সিআইডি, এ্যান্টি-টেরোরিজম ইউনিট, হাইওয়ে পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ানের মত যে সকল বিশেষায়িত শাখা আছে, তেমনি 'জুভেনাইল পুলিশ' নামে একটি বিশেষায়িত শাখা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

গণমাধ্যমে গত তিন বছর ধরে কিশোরদের গ্যাং কালচার বা দল-সংস্কৃতির ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের দল সংস্কৃতির বাস্তবতা, বিস্তৃতি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। ২০১৭ সালের ৬ জানুয়ারি আদনান খুন হওয়ার পর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উত্তরাসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এক ডজন কিশোর দলের অস্তিত্ব খুঁজে পান। এর মধ্যে উত্তরাতেই সক্রিয় ছিল ৫টি গ্যাং, দলগুলো হচ্ছে–ডিসকো বয়েজ, নাইন স্টার ক্লাব, নাইন এম এম, সেভেন এম এম, ও বিগবস। শিশু কিশোরদের এ দলগুলো ছোট খাট চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ বড় ধরনের অপরাধ ও সন্ত্রাসের সঙ্গেও জড়িত। আদনান খুনের পর তদন্ত করতে গিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শিশু কিশোরদের দলীয় সহিংসতার সঙ্গে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পান। এসকল বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে উত্তরা ট্রাস্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল ও কলেজ, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উত্তরা হাইস্কুল, হাবিবুল্লাহ বাহার স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও হলি চাইল্ড স্কুল।[৫৭]

২০১৮ সালে চট্টগ্রামে কিশোর অপরাধের ৭ মাসের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, চুরি, ঘর পালানো, মেয়েদের উক্ত্যক্ত করা ও চাঁদাবাজিকে পেছনে ফেলে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের কিশোরেরা ধর্ষণ, প্রাকাশ্যে রাস্তায় গুলি করে হত্যা ও অপহরণসহ নানা সহিংস ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে। বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ৭ মাসে ১১ টি অপরাধমূলক ঘটনায় কিশোরদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়।[৫৮]

২০১৮ সালের ২৭ মে চট্টগ্রাম বন্দর থানার দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর এলাকায় রুপালী ব্যাংকের কর্মকর্তা সজল নন্দী (৪৮) খুন হন। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) ছায়া তদন্ত

করতে গিয়ে দেখতে পায় যে, খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে দুজন ১৬ বছর বয়সী কিশোর ও একজন ১৯ বছর বয়সী যার নাম জয় বড়ুয়া চৌধুরী। এই দুই কিশোর ও কৈশোর উত্তীর্ণ যুবক জয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেছেন যে, সজল নন্দীর ছেলে নবম শ্রেণি পড়ুয়া কিশোর তাদের বন্ধু। ২৯ লাখ টাকা পাওয়ার জন্য তারা তাদের বন্ধুর বাবা সজল নন্দীকে গলা কেটে খুন করেন। টাকার লোভে দুই কিশোর ও এক যুবক কর্তৃক বন্ধুর বাবাকে গলা কেটে হত্যা করার ঘটনার মধ্য দিয়ে এটি বোঝা যায় যে, মূল্যবোধ কতটা নিচে নেমে গেছে এবং কিশোরেরা টাকার জন্য কতটা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।[৫৯]

শিশু কিশোরদের দল সংস্কৃতির বিস্তৃতি শুধু ঢাকা শহরে নয়, ক্রমশ বর্ধিষ্ণু বিভাগীয় শহরগুলোতেও শিশু কিশোরদের অপরাধী সংগঠন সক্রিয় রয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের বাইরে বন্দরনগরী খুলনাতেও শিশু-কিশোরদের কয়েকটি দল সক্রিয় রয়েছে। এ ধরনের কয়েকটি দলের নাম হচ্ছে –'গোল্ডেন বয়েজ', 'ডেঞ্জার বয়েজ' ও 'টিএসপি'। প্রথম দুটি দল খুলনার বৈকালি বাজার এলাকায় সক্রিয়; 'টিএসপি' নামের দলটি সক্রিয় বয়রা পালপাড়া এলাকায়। 'গোল্ডেন বয়েজ' দলের সদস্যরা যেখানে সমাজের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের সন্তান; 'টিএসপি' দলের ছেলেরা বস্তির বাসিন্দা।[৬০]

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ ও গ্যাং কালচার: বিশ্লেষণ

২০১৮ সালের মার্চে প্রথমবারের মতো এবং ২০২১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে স্বল্প-মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ করেছে জাতিসংঘ। নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও উন্নয়নের সঙ্গে বাড়ছে শহুরে দারিদ্র্য ও বৈষম্য, বিস্তৃত হচ্ছে বস্তি, ফুটপাত ও রাস্তায় বাড়ছে ভাসমান মানুষের সংখ্যা। এমন বাস্তবতায় উত্থান হয়েছে শহুরে যুবকদের 'গ্যাং কালচারে'র। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে কিশোর অপরাধ, দরিদ্র শিশু-কিশোরদের ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত হওয়া এবং পাড়ায় মহল্লায় উঠতি বয়সের যুবকদের মধ্যে হানাহানি থাকলেও কয়েক বছর ধরে দল সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে ভিন্ন এক শহুরে বাস্তবতায়।

স্বাধীনতার আগে ও পরে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বাস্তবতা ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সমাজে ছড়িয়েপড়া শিশু-কিশোরদের 'গ্যাং কালচার'কে কিশোর অপরাধের একটি বর্ধিত ও ত্রাস সৃষ্টিকারী ধারা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এটি কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে যেমন নতুন মাত্রা যোগ করেছে, তেমনি অভিভাবক ও নীতি নির্ধারকদের মধ্যে উৎকণ্ঠা তৈরি করেছে। বয়ঃসন্ধিকালের আবিষ্কার ও ব্যক্তির সুষম ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকালের গুরুত্ব; স্বাধীনতার আগে ও পরে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বাস্তবতা ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সমাজে ছড়িয়ে পড়া দল সংস্কৃতির উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইতোমধ্যে তথ্য-উপাত্তসহ যে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার অলোকে নিচের সিদ্ধান্তসমূহ টানা যেতে পারে।

এক. যুবক-যুবতীদের সঙ্গে অপরাধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে স্মরণাতীতকাল থেকে বিশ্বাস করা হয়। এটি প্রায় সকল সমাজের একটি সর্বজনীন প্রবণতা যে, আগের প্রজন্ম অর্থাৎ মা-বাবা ও অভিভাবকবৃন্দ তাদের বর্তমান প্রজন্মকে নিয়ে শঙ্কা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকেন। মা- বাবা, শিক্ষক

ও বয়োজ্যেষ্ঠরা অর্থাৎ আগের প্রজন্মের মানুষেরা এ কথা বুঝতে চান না যে, সময় পরিবর্তনশীল এবং পরিবর্তনশীল সমাজের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের বোধ, মনন ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে এবং তাদের সুস্থ বা অসুস্থ আচরণ, প্রতিবাদ, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, বিচ্যুতি, এমন কি অপরাধমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে সেটি প্রকাশিত হয়।

পশ্চিমে আবিষ্কৃত 'স্টর্ম অ্যান্ড স্ট্রেস' বা 'ঝড় ও চাপে'র মডেল বয়ঃসন্ধিকে হরমোনাল ভাঙাগড়ার সময় বলে চিহ্নিত করেছে। এই সময়ে তাদের নানা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য একদিকে স্বাধীনতা দরকার; অন্যদিকে শৃঙ্খলা আত্মস্থ করার জন্য প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ। অপরাধ বিষয়ক তত্ত্বগুলো মনোজগতের নানা উপাদানের সঙ্গে শারীরিক নিয়ন্ত্রণবাদ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব, বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কথা বলেছে। ফলে কিশোর অপরাধকে অপর্যাপ্ত আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের অভাব, এবং আর্থ-সামজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার ফল হিসেবে দেখা হয়েছে।

ইউরোপের দেশগুলো, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিশোর অপরাধের প্রারম্ভ ও বিকাশ নগরায়ণ ও শিল্পায়নের হাত ধরে। এটি ১৯৩০-এর দশকে ধীর গতিতে বাড়তে থাকে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তা দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। কিশোর অপরাধের কারণ অনুসন্ধানের জন্য গড়ে ওঠা তত্ত্বগুলো বারংবার যেটিকে মূল কারণ বলে চিহ্নিত করেছে, সেটি হচ্ছে—ভাঙা পরিবার বা 'ব্রোকেন ফ্যামিলি' ও পারিবারিক 'ডিসফাংশন' বা পরিবারের স্বাভাবিক পরিবেশ ও কর্মকাণ্ডের ব্যত্যয় ও বিচ্যুতি।

দুই. ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে আজ শিশুদের যে সুরক্ষা ও নিবিড় পরিচর্যার কথা বলা হয়, তার সূত্রপাত সেই সময়ের গর্ভে, যখন থেকে শৈশব মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ বলে স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে। এ কথাও আজ সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে, শিশুরা যেন সুস্থ ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, সেজন্যে তাদের সুরক্ষা, শৃঙ্খলা ও সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ প্রয়োজন। শৈশবের পাশাপাশি বয়ঃসন্ধিকালও আধুনিক মানুষের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তার শারীরিক, মানসিক, যৌন ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ক্ষেত্রে শৈশব ও বয়ঃসন্ধিকাল অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ-মানসে এ বিষয়ে এখনও যথাযথ উপলব্ধি আসেনি।[৬১]

তিন. বাংলাদেশে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশু-কিশোরের সংখ্যা ৪ কোটি, যাদের মধ্যে ৩২.৫ শতাংশ কিশোর-কিশোরী ও শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে যুক্ত। পথশিশুদের প্রায় সকলেই কোন না কোন অপরাধ বা সমাজ-বিরোধী কাজের সঙ্গে জড়িত। ২০০৮ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পাদিত গবেষণার ফল অনুযায়ী, কিশোর অপরাধীদের গড় বয়স ১৪ দশমিক ৯ বছর। স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থান থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের স্তরে উত্তরণের প্রাথমিক স্বীকৃতি পেলেও, ভাসমান মানুষের বস্তি ও লক্ষ লক্ষ পথশিশু বিলীন হয়ে যায়নি। বরং উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নগর দারিদ্র্য ও বৈষম্য নতুন চেহারা ও মাত্রা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সম্প্রতি দল সংস্কৃতির নামে শিশু কিশোররা যে ভয়ংকর সব অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে সেটি বাংলাদেশের পাড়া মহল্লায় আগেও ছিল। তফাতটা হচ্ছে, হালের দল সংস্কৃতির নামে উচ্চবিত্ত ও

মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশু-কিশোররা দলবদ্ধভাবে চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি ও হত্যা করছে। এসব করতে গিয়ে তারা ফেসবুক, স্মার্ট ফোন, ইউটিউবের সহযোগিতা নিচ্ছে; অন্যদিকে হকি-স্টিক, রাম দা ও ছুরির সঙ্গে ব্যবহার করছে অত্যাধুনিক অস্ত্র। মনোবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, অপরাধবিজ্ঞানী, পুলিশ কর্মকর্তা ও বিশ্লেষকদের ধারণা, শিশু-কিশোরদের বিচ্যুতি, যৌন অপরাধ ও সহিংস আচরণের ওপর প্রভাব রয়েছে আধুনিক যুগের ভিডিও গেমস, পর্নোগ্রাফি, সহিংস ও ভৌতিক চলচ্চিত্রের।[৬২]

চার. শিশু-কিশোরদের অপরাধী দলগুলোর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রথম দিকে এসকল দলের কিশোররা পার্টি করা, দেয়াল লিখন, প্রচণ্ড শব্দে হর্ন বাজানো, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো, মেয়েদের উত্যক্ত করা, ক্ষেত্রবিশেষে ধূমপান ও মাদক গ্রহণের কাজে যুক্ত ছিল। পরে তারা আধিপত্য বিস্তার, প্রেম ও মাদকসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরাসরি মারামারি ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, যার পরিণতিতে ঢাকা, খুলনা ও চট্টগ্রামে খুন হয়েছে কয়েকজন কিশোর। উঠতি বয়সের কিশোরদের মধ্যে যে চঞ্চলতা, অস্থিরতা ও বীরত্ব দেখানোর প্রবণতা, তার পরিণতিতে কিছু দ্বন্দ্ব - সংঘাতের ঘটনা স্বাভাবিক। কয়েক দশক আগেও তা ছিল, এখনও আছে। তবে দল সংস্কৃতিসহ সারা দেশে শিশু-কিশোরদের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে রয়েছে মূল্যবোধের অবক্ষয়, পারিবারিক বন্ধনের শৈথিল্য, শিক্ষকমণ্ডলী ও বয়োজ্যেষ্ঠদের শাসন বা নিয়ন্ত্রণের অভাব। মনে রাখতে হবে যে, নগরায়ণ, উন্নয়ন ও বিশ্বায়নের প্রভাবে পুরো সমাজের মধ্যে অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা, ভোগবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে অপরাধ, সহিংসতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ। শিশু-কিশোররাও এ প্রভাবের বাইরে নয়।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, এমনকি আশির দশকেও সমাজের মধ্যে যে নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব ছিল – যেমন পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের শাসন, ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রভাব– সেই নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বগুলো ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যাচ্ছে। সরকার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিচার বিভাগের পক্ষে সকল মানুষের ওপর নজরদারি করা সম্ভব নয়। পরিবার, সমাজ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার নজরদারি দুর্বল ও শিথিল হয়ে পড়লে, সেই সমাজে অপরাধ, সামাজিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, কিশোর অপরাধ, ও সহিংসতা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

পাঁচ. ক্রমবর্ধমান কিশোর অপরাধ ও শিশু-কিশোরদের দল সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নশীল, কিন্তু মূল্যবোধ ও নৈতিকতার দিক থেকে ক্ষয়িষ্ণু এক বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি; যেখানে নারী ও শিশুরা একদিকে বিপন্ন ও নির্যাতিত, অন্যদিকে কিশোর ও কিশোরীরা দল সংস্কৃতিসহ নানা ধরনের সহিংস অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে।

উপসংহার

নগরায়ণ, ত্রিশের মন্দা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে নানা কারণে ইংল্যান্ড ও অ্যামেরিকায় শহুরে যুবকদের মধ্যে সংঘবদ্ধ অপরাধীদের দল গড়ে উঠতে দেখা যায়; কোথাও কোথাও আবার 'টেড', 'পাঙ্ক', 'রক অ্যান্ড রোল', ও 'হিপ্পি'দের মত দল গড়ে ওঠে। বৈষম্য, পরিবারে ভাঙন, বিশ্রামের সময় উপভোগ করাকে ঘিরে শ্রমিক শ্রেণির যুবকদের মধ্যে 'ভয়ানক'

স্বাধীনতা, বঞ্চনা ইত্যাদি কারণে কিশোরদের মধ্যে যেমন অপরাধী দল গড়ে ওঠে, তেমনি 'পাঙ্ক' ও 'হিপ্পি'দের মত দল গড়ে তরুণরা মূলধারার মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গ করতে শুরু করে; আর এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তাদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা যেমন ভিন্ন, এই সমাজের শিশু-কিশোরদের বেড়ে ওঠা, চাওয়া পাওয়া, ক্ষোভ বিক্ষোভগুলোও ভিন্ন। যদিও শিশু-কিশোরেরাই আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিক, কিন্তু শৈশব ও বয়ঃসন্ধিকালের গুরুত্ব এখনও বাংলাদেশের সমাজ মানসে যথার্থভাবে উপলব্ধ হয়নি। যে আদর, ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও গুরুত্ব দিয়ে শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের বড় করা উচিত, অধিকাংশ পরিবার, বিদ্যালয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো তা করতে পারছে না। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে, শিশু ও কিশোর। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও রাষ্ট্রকর্তাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই শিশু ও কিশোরদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। কিন্তু পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা অসঙ্গতির কারণে নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের অনেক শিশু ও কিশোর ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে অথবা অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে; এদিকে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের অনেক কিশোর হয় বিচ্যুত হচ্ছে সুস্থ জীবন থেকে অথবা জড়িয়ে পড়ছে 'গ্যাং কালচার'-এ।

এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সোজা-সাপ্টা কোন পথ নেই। দায়িত্বশীল কল্যাণরাষ্ট্র ও মানবিক একটি সমাজ যদি প্রত্যেকটি শিশুর জন্য অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে, প্রত্যেক কিশোরী ও কিশোরের জন্য যদি ব্যবস্থা করা যায় অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা এবং সুস্থ বিনোদন ও খেলাধুলার, তখনই কেবল শিশু কিশোরদের মসৃণ বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ Nacela Sattar and Gopalan Balagopal, Traditional Means of Dealing with Children in Conflict with the Law with Specific Reference to Bangladesh: Bringing Juvenile Justice into Focus, *UNICEF Dhaka*, 1997. https://www.unicef-irc.org/portfolios/documents/480_bangladesh.htm

২ Mohammad Jamil Khan and Md Sanaul Islam Tipu , "Children's involvement in crime on the rise", *Dhaka Tribune*, October 1st, 2016, https://www.dhakatribune.com/ bangladesh/ 2016/10/01/childrens-involvement-crime-rise

৩ The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), 1989, Article 1.

৪ বাংলাদেশ শিশু আইন, ২০১৩, ধারা ৪

৫ বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭, ধারা ১৯

৬ Sheikh Hafizur Rahman Karzon, *Handbook of Criminology, Criminal Justice, Victimology & Restorative Justice*, Hira Publications Bangladesh, August, 2016, Pp. 371 - 416

৭ Sumaiya Khair, "Juvenile Justice Administration and Correctional Services in Bangladesh: A Critical Review", *The Dhaka University Part F*, Vol. 16, No. 2, December 2005, pp. 3-6

৮ The Penal Code, 1860 (ACT No. XLV of 1860), Sections 82 and 83

৯ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন)

১০ শাহানা হুদা, "শিশু অপরাধী: গ্যাং কালচার কি নতুন কিছু", *ডেইলি স্টার বাংলা*, জানুয়ারি ১৮, ২০১৭। বাংলাদেশ https://www.thedailystar.net/ bangla/মতামত/শিশু-অপরাধী-গ্যাং-কালচার-কি-নতুন-কিছু-77371

১১ প্রাগুক্ত, *ডেইলি স্টার বাংলা*, জানুয়ারি ১৮, ২০১৭

১২ প্রাগুক্ত
১৩ Ronald C. Kramer, "Poverty, Inequality, and Youth Violence", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Jan., 2000, Vol. 567, School Violence (Jan., 2000), pp. 123-139. https://www.jstor.org/ stable/1049498? seq=1#metadata_ info_tab_contents
১৪ Larry J. Siegel and Brandon C. Welsh, *Juvenile Delinquency: Theory, Practice, and Law*, Wadsworth, Cengage Learning, 2015, pp. 128-204
১৫ Tim Newburn, "Youth, Crime, and Justice", in Mike Maguire, Rod Morgan, and Robert Reiner (Eds), *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford University Press, 1997, pp. 613-615
১৬ Philippe Aries, *Centuries of Childhood*, Penguin, 1973, p. 395
১৭ প্রাগুক্ত, ফিলিপ এরিএস, পৃ. ২৮
১৮ প্রাগুক্ত, ফিলিপ এরিএস, পৃ. ২৮
১৯ J. Davis, *Youth and the Condition of Britain*, Athlone Press, London, 1990
২০ S. Humphries, *Hooligans or Rebels? An Oral History of Woeking Class Childhood and Youth, 1889 – 1939*, Basil Blackwell, Oxford, 1981
২১ M Imman Ali, 'Comprehensive Children Justice System in Bangladesh', pp, 1–3. PDF version is available on online at http://thinklegalbangladesh.com/web1/public/files/ J.%2520Imman%2520Ali_Comprehensive%2520Children%2520Justice%2520System%2520in%2520Bangladesh.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=bd
২২ E. Shorter, *The Making of the Modern Family*, Collins, 1976. L. Stone, *The Family, Sex, and Marriage in England 1500 - 1800*, Penguin, 1979
২৩ C. Booth, *Life and Labour of the People of London*, Macmillan, London, 1902. See J. Williams, "Having an Away Day: English Foorball Spectators and the Hooligan Debate", in J. Williams and S. Wagg (Eds), *British Football and Social Change: Getting into Europe*, Leichester University Press, 1991
২৪ G. Pearson, *Hooligan: A History of Respectable Fears*, Macmillan, 1983
২৫ প্রাগুক্ত
২৬ Nacela Sattar and Gopalan Balagopal, Traditional Means of Dealing with Children in Conflict with the Law with Specific Reference to Bangladesh: Bringing Juvenile Justice into Focus, *UNICEF Dhaka*, 1997. https://www.unicef-irc.org/portfolios/ documents/ 480_ bangladesh. htm
২৭ প্রাগুক্ত
২৮ প্রাগুক্ত
২৯ প্রাগুক্ত
৩০ শেখ হাফিজুর রহমান, "কিশোর-অপরাধ ও পুনর্বাসন: শিশু জেলখানায় যাইবেন স্যার?" দৈনিক *প্রথম আলো*, ১২ মার্চ ২০১৪
৩১ Lutfur Rahman Shahjahan and Saira Rahman Khan, "Juvenile Justice", in Ruby Ghuznavi, Farah Ghuznavi and Saira Rahman Khan, eds., *Child Rights: Reality and Challenges*, A Study by Shishu Adhikar Sangjog, The British Council, 2001
৩২ Tim Newburn, "You, Crime, and Justice", in Mike Maguire, Rod Morgan, and Robert Reiner (Eds), *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford University Press, 1997. See C. Griffin, *Representation of Youth: A Study of Youth and Adolescence in Britain and America*, Polity Press, 1993
৩৩ Tim Newburn, *Permission and Regulation: Law and Morals in Post-war Britain*, Routledge, 1991
৩৪ UNICEF Bangladesh – *Overview – The situation of children*, http://www.unicef.org/ bangladesh/ overview.html
৩৫ Unicef Bangladesh, "Adolescents in development", https://www.unicef.org/ bangladesh/ en/adolescents-development
৩৬ *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ এপ্রিল, ২০১৮

৩৭ *Comparative Crime Statistics: 2002 – 2015*, Bangladesh Police, http://www.police.gov.bd/ Crime- Statistics- comparative.php?id=208

৩৮ Nahid Ferdousi, "Trends and Factors of Juvenile Delinquency in Bangladesh: Some Observations", *Bangladesh Journal of Law*, 11:1 and Vol. 2, 2011

৩৯ Mohammad Afsaruddin, *Juvenile Delinquency in Bangladesh*, University of Dhaka: Dhaka, 1993

৪০ প্রাগুক্ত

৪১ Sarmin Akhter, "Female criminality: a way out", *New Age*, March 16, 2019. https:// www.newagebd.net/ article/67468/female-criminality-a-way-out

৪২ Sheikh Hafizur Rahman, "Female Criminality: Brief Theoretical Analysis into the Causes", The Daily Star (Law & Our Rights Page), October 15, 2005. See also Sheikh Hafizur Rahman, "Juvenile Delinquency: An Inquiry into the Causes", The *Daily Star* (Law & Our Rights Page), August 10, 2003

৪৩ দৈনিক *কালের কণ্ঠ*, ১৯ জানুয়ারি, ২০১৭

৪৪ শেখ সাবিহা আলম, "গ্যাং কালচারের নামে ভয়াবহ উঠেছে যে কিশোরেরা", *দৈনিক প্রথম আলো*, ১০ জানুয়ারি, ২০১৭ https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E2%80%98%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0 %A6%BE%E0%A6%82-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A 6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E 0%A6% B0%E0%A7%87%E0%A6%B0%E2%80%99-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87- %E0%A6%AD%E0%A7%9F%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A7%9F %E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A0%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%87- %E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6 %B0%E0%A6%BE

৪৫ বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ও দৈনিক সমকালসহ সকল জাতীয় দৈনিকে ৭ জানুয়ারি, ২০১৭ সালে খবরটি প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, ৬ জানুয়ারি রাতে খবরটি ব্যক্তি মালকানধীন একাধিক টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করা হয়।

৪৬ শেখ সাবিহা আলম, 'নৃশংসতার চর্চা বাস্তবে, ভার্চুয়াল জগতে', দৈনিক *প্রথম আলো*, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

৪৭ শান্তা মারিয়া, "কিভাবে জন্ম হয় কিশোর গ্যাং ও দিহানদের", *বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম*, ১২ জানুয়ারি, ২০২১

৪৮ Udias Islam, "Growth of teen gang culture worrying experts", *Dhaka Tribune*, 28 Januray, 2018

৪৯ আহসান হাবীব, 'গ্যাং কালচারের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', দৈনিক *বণিক বার্তা*, ১৩ জানুয়ারি, ২০১৭

৫০ শেখ সাবিহা আলম, "গ্যাং কালচারের নামে ভয়াবহ উঠেছে যে কিশোরেরা", *দৈনিক প্রথম আলো*, জানুয়ারি, ২০১৭

৫১ প্রাগুক্ত

৫২ হারুন উর রশীদ স্বপন, "কিশোর গ্যাং: দায় কার?" ডয়েচে ভেলে (বাংলা), ১৪ জানুয়ারি, ২০২১

৫৩ James C. Howell, "Youth Gangs", US Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, *OJJDP Fact Sheet*, December 1997 #72. https://usa. usembassy. de/ etexts/soc/youthgangs.pdf

৫৪ *Federal Data*, Gang Involment Prevention, https://youth.gov/youth-topics/preventing-gang-involvement/federal-data

৫৫ প্রাগুক্ত

৫৬ বাংলাদেশ শিশু আইন ২০১৩-এর ১৩ ও ১৪ ধারায় প্রতিটি থানায় 'চাইল্ড ডেস্ক' স্থাপন ও 'চাইল্ড অ্যাফেয়ার্স পুলিশ অফিসার' নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে।

৫৭ ২০১৭ সালে আদনান কবির খুন হওয়ার পরে 'গ্যাং কালচার'-এর ব্যাপারে অনুসন্ধানে নামে পুলিশ, র‍্যাব ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। দৈনিক প্রত্রিকা এবং অনলাইন পোর্টালে এ বিষয়ে নানা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পুলিশি অনুসন্ধান, খবর, ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদনগুলোতে উল্লেখিত স্কুল ও কলেজগুলোর নাম একাধিকবার এসেছে। *বিবিসি বাংলা, ডয়েচে ভেলে, ডেইলি স্টার বাংলা*, দৈনিক *কালের কণ্ঠ*, দৈনিক *প্রথম আলো*, দৈনিক *সমকাল*, দৈনিক *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, *বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম*-এ গত প্রায় সাড়ে ৪ বছরে গ্যাং কালচারের ওপর নানা প্রতিবেদন, কলাম, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, এবং অপরাধ বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, আইনের অধ্যাপক, ও আইনজীবীদের বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে।

৫৮ দৈনিক *প্রথম আলো*, দৈনিক *কালের কণ্ঠ*, ও *ডেইলি স্টার বাংলা*-য় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত।

৫৯ *বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম*, ৩ জুন, ২০১৯

৬০ Udias Islam, 'Growth of teen gang culture worrying experts', *Dhaka Tribune*, 28 Januray, 2018

৬১ Sheikh Hafizur Rahman Karzon, *Theoretical and Applied Criminology*, Palal Prokashoni, Dhaka, June, 2008, pp. 362-384

৬২ নুরুননাহার সাত্তার, "বয়ঃসন্ধিকালে সন্তানকে বন্ধু করে নিন", ডয়েচে ভেলে (বাংলা), ২৮ জুলাই, ২০১৬ https://www.dw.com/bn/% E0%A6%AC%E0%A7 %9F%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0% A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8 D%E0%A6% A4%E0%A6% BE%E0% A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC% E0%A6%A8%E0%A7% 8D%E0%A6% A7%E0%A7%81-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7% 87-%E0%A6%A 8%E0%A6%BF %E0%A6%A8/a-19431348

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/জুন ২০২১

কক্সবাজার জেলার ঐতিহ্যবাহী লবণ-শিল্প: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

কানিজ ফাতেমা*

সারসংক্ষেপ

স্মরণাতীতকাল থেকে কক্সবাজার অর্থনৈতিকভাবে সুসমৃদ্ধ এলাকা। এর প্রাকৃতিক সম্পদ, বনজ সম্পদ ও খনিজ সম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাঁশ ও বেত শিল্প, মৃৎশিল্প, ঝিনুক শিল্প, হস্তশিল্পসহ নানাবিধ কুটিরশিল্প ছাড়াও সমুদ্রসংলগ্ন কক্সবাজারের লবণ-শিল্প হচ্ছে একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প। এই শিল্প কক্সবাজারসহ সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপক চাহিদা মিটিয়ে চলছে। কিন্তু ব্রিটিশ আমল থেকেই লবণ-শিল্প ও লবণ চাষিদের বিরুদ্ধে শুরু হয় নির্যাতন, শোষণ ও ষড়যন্ত্র। পাকিস্তান আমলে তৎকালীন সরকার করাচি থেকে লবণ আমদানি করে এদেশীয় লবণ-শিল্পকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর আওয়ামী লীগ সরকার লবণের উপর থেকে সকল প্রকার ট্যাক্স তুলে নেয় এবং বিদেশ থেকে লবণ আমদানি নিষিদ্ধ করে। ফলে এদেশের লবণ-শিল্প উপযুক্ত মূল্য পেতে শুরু করে। বর্তমানে একটি অসাধু ও অতি মুনাফালোভী লবণ সিন্ডিকেটের কারণে দেশের বাজার অস্থিতিশীল। সঠিক দাম পায় না প্রান্তিক লবণ চাষিরা। লবণ-শিল্পবিরোধী চিহ্নিত চক্রকে দমন করতে না পারলে আগামী দিনে লবণ-শিল্পখাত আরো কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হবে।

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে পাহাড়, নদী ও সমুদ্রবেষ্টিত ঐতিহাসিক সমৃদ্ধ জনপদ কক্সবাজার। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্র উপকূলে যতগুলো শহর রয়েছে তার মধ্যে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের দিক থেকে কক্সবাজার সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্রসৈকত হচ্ছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এ সমুদ্র সৈকতটি অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। স্মরণাতীতকাল থেকে কক্সবাজারের সমুদ্র সম্পদ, বনজ সম্পদ, কৃষিজাত সম্পদ ও খনিজ সম্পদ তথা লবণ-শিল্প এদেশের অর্থনীতিতে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করছে। কক্সবাজার জেলার লবণ-শিল্প বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বৃহৎ শিল্প হিসেবে তালিকাভুক্ত। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে উৎপন্ন লবণকে কেন্দ্র করে বৃহৎ লবণ-শিল্প গড়ে উঠেছে এবং এটি একটি দেশীয় শিল্পোদ্যোগ। মানুষের শারীরিক গঠনে পরিমিত পরিমাণ আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে বিবেচিত, যাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড বলে। একজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক দেহে ২০ভাগ লবণ থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশ পুষ্টিবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও ইউনিসেফ-এর হিসাব অনুযায়ী[১] একজন সুস্থ মানুষের দেহে দৈনিক ১৫ গ্রাম লবণ প্রয়োজন সে হিসেবে একজন লোকের বার্ষিক লবণের চাহিদা ৫ কেজি ৪০ গ্রাম। মানুষের খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার ছাড়াও শিল্পখাত, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্রাণিসম্পদখাতে লবণের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। কক্সবাজার ব্যতীত

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশের এমন কোন জেলা নেই যে জেলার কোন একটি উৎপাদিত সামগ্রী সমগ্র বাংলাদেশের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। শিল্প মন্ত্রণালয়ের দিক-নির্দেশনায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কক্সবাজার লবণ-শিল্পের দায়িত্ব পালন করে আসছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, ইতঃপূর্বে এ বিষয়ে তেমন কোন বস্তুনিষ্ঠ গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।সে বিবেচনা থেকে আলোচ্য প্রবন্ধে কক্সবাজার জেলার লবণ-শিল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে বাংলাদেশ গেজেট, উইকিপিডিয়া, কক্সবাজার জেলা তথ্য বাতায়ন, প্রকাশিত বই, আঞ্চলিক গবেষকদের বর্ণনা, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় লবণ চাষিদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

লবণ-শিল্পের পটভূমি

কক্সবাজারের লবণ-শিল্প একটি প্রাচীন শিল্প। মুসলমানদের আগমনের আগে অর্থাৎ কক্সবাজার যখন আরাকান রাজার অধীনে ছিল তখনও কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে লবণ প্রস্তুত হতো। কক্সবাজারে উৎপাদিত লবণের উপর আরাকান রাজারা শুল্ক আদায় করতেন। কিছুদিন তারা লবণের বাণিজ্য একচেটিয়াভাবে তাদের নিজ হাতে রেখে দিয়েছিলেন এবং এজেন্ট মারফত সংগ্রহ করতেন। ভেনিসের পরিব্রাজক ফ্রেভিসি ১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এশিয়া মহাদেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর বিবরণ হতে জানা যায়, "তৎকালে প্রতিবছর কক্সবাজার থেকে ২০০ জাহাজ বোঝাই লবণ সন্দ্বীপে যেত। উল্লেখ্য তখন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে নৌপথই ছিল পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম এবং তখন সন্দ্বীপ ছিল একটি লবণ ব্যবসা কেন্দ্র।"[২]

মোঘল আমলে 'নিমক জায়গীর মহাল ও নিমক এওজ মহাল' নামক দুটি সরকারি বিভাগ এই শিল্প নিয়ন্ত্রণ করত। নিজামপুর, জুলদিয়া ও বাহারছড়া এই তিনটি চাকলার অধীনে মোট ৩৯টি লবণ সংগ্রহ ক্ষেত্র ছিল।[৩] মোঘল আমল পর্যন্ত লবণ শিল্পে সরকারের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল।এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল জমিদার শ্রেণির হাতে।তারা মলঙ্গীদের[৪] দিয়ে লবণ তৈরি করার জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাদন প্রদান করত।ঐ স্থানীয় লবণ ব্যবসায়ীরা মলঙ্গীদের অগ্রিম দাদন দিতেন। এই দাদন গ্রহণ করে মলঙ্গীরা দাদনের পরিবর্তে লবণ ব্যবসায়ীকে কিছু পরিমাণ লবণ নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট মূল্যে সরবরাহ করতেন।[৫] ১৫৮০-৮২ খ্রিষ্টাব্দে টোডরমল যখন মোঘল সম্রাট আকবরের রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি চট্টগ্রামকে রাজস্ব আদায়ের জন্য ৭টি মহালে ভাগ করেন। তন্মধ্যে একটি মহাল ছিল 'খেরাজ নিমক সর' (লবণের উপর শুল্ক)।[৬] নিমক সর শব্দটি ফার্সি। এর অর্থ লবণের কড়াই বা খনি। এখানে এটাকে লবণের ক্ষেত্রকেই বুঝানো হয়েছে।[৭]

১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ চট্টগ্রামকে ১৩টি মহালে ভাগ করেন। এদের মধ্যে নিমক মহাল ছিল দ্বিতীয়। মোঘল আমলে চট্টগ্রামের নিমক মহাল থেকে ২৩,৫৮৭ টাকার রাজস্ব আদায়

করা হয়।[৮] ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে অনেক ইংরেজ প্রত্যক্ষভাবে ও বেনিয়াদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে লবণ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত চট্টগ্রামের চিফ ভেরেলস্ট সাহেব লবণ উৎপাদনকে উৎসাহ দানের জন্য ২৩,৫৮৭ টাকা থেকে কমিয়ে ৮,৭৬৯ টাকা রাজস্ব ধার্য করেন।[৯] অবশ্য পরে তা বাড়িয়ে ১১,৯০১ টাকা করা হয়।[১০]

মোঘল আমলে নিজামপুর, বাহারছড়া ও জুলদিয়ার ৩০১জন জমিদার তাদের আবাদি জমি সমুদ্রের লোনা পানি দ্বারা নষ্ট করার অজুহাতে এ খাজনা রেহাই দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। তাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হলে তারা এরূপ লবণ সিক্ত জমিতে চাষের পরিবর্তে লবণ তৈরির অনুমতি প্রার্থনা করেন। উপযুক্ত তদন্ত করার পর সরকার সমুদ্র উপকূলে জরিপ চালিয়ে নির্দিষ্ট জমিতে লবণ তৈরি করার জন্য তাদের সনদ প্রদান করেন এবং ঐ জমির খাজনা মূল জমা হতে খারিজ করে তাকে নিমক এওজ মহাল নামকরণ করেন এবং এর জন্য ভিন্নভাবে রাজস্ব নির্ধারণ করেন।[১১]

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মচারী দ্বারা গঠিত "ট্রেড সোসাইটি"কে একচেটিয়া লবণের ব্যবসা করতে দেন। ফলে ১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ১০০ মণ লবণের মূল্য ১২৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৭ টাকা হয়। ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে এই সোসাইটি বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস পুনর্বার লবণ ব্যবসাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ে পরিণত করেন। ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে জনৈক মির্জা মাহমুদকে লবণের ইজারাদার নিয়োগ করা হয়। তিনি কোম্পানিকে বার্ষিক ৮০ হাজার মণ লবণ দিতেন এবং তদুপরি ১০,২৪৪ টাকা খাজনা দিতেন।[১২]

তৎকালীন চট্টগ্রামের কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট এইচ. জে. এস. কটন তাঁর *Memorandum on the Revenue History of Chittagong* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

> A new system was introduced in 1780. There was to be no more farming, but arrangements were made for the provision of salt by agency, under which all the salt of the provinces was to be manufactured for the company and sold for ready money at moderate fixed rates to be ascertained and published at the beginning of every season by the Governor-General and Council.[১৩]

১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে সরকার চট্টগ্রামে একজন সল্ট এজেন্ট নিয়োগ করেন। তাঁর নাম ছিল রবার্ট ওয়ারলেজ। তিনি লবণ-শিল্পের তদারক করতেন এবং লবণ প্রস্তুতকারীকে অগ্রিম টাকা দিতেন। গভর্নর জেনারেল লবণের মূল্য নির্ধারণ করে দিতেন এবং ঐ দরে লবণ প্রস্তুতকারীরা ব্যবসায়ীদের লবণ বিক্রি করতেন। সল্ট এজেন্ট উৎপাদন মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের পার্থক্যের উপর শতকরা সাড়ে সাত ভাগ কমিশন পেতেন। এ ব্যবস্থা ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্যকর ছিল।[১৪]

১৮৩৫-৩৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামে লবণের উৎপাদন ছিল ৪৪,০০০ মণ। ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির আধিপত্য চলতে থাকে। ১৮৬১-৬২ খ্রিষ্টাব্দে যখন লিভারপুল থেকে আমদানিকৃত

১০০ মণ লবণের মূল্য ছিল মাত্র ৬৫ টাকা থেকে ৭৫ টাকা তখন কক্সবাজারে উৎপাদিত ঐ পরিমাণ লবণের মূল্য ৮৩ টাকা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। ফলে গুণগতভাবে উন্নত মানের এবং কম দামে লিভারপুলের লবণের সাথে কক্সবাজারের লবণ টিকে থাকতে পারেনি এবং হাজার হাজার লবণ চাষি ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। তখন সিনেট কমিটির এক প্রশ্নের জবাবে তদানীন্তন বোর্ড অব রেভিনিউ-এর সেক্রেটারি স্যার সেলিল বিডন বলেছেন, "আমার আশঙ্কা হয় লবণ চাষিদের মধ্যে বহু লোক ধরা-পৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।"[১৫] এদের অনেকে মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য প্রতিবেশী রাজ্য আরাকানে পালিয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকার সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন করা বেআইনি ও দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে এবং স্বদেশি লবণের উপর অতিমাত্রায় কর আরোপ করায় এই শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। চট্টগ্রামের বহু মলঙ্গী জীবিকার তাগিদে লুকিয়ে লবণ চাষ করতে গিয়ে ধরা পড়ে শাস্তিও ভোগ করত। এভাবে নির্যাতন চালিয়ে চট্টগ্রামের প্রাচীন লবণ-শিল্পকে ধ্বংসের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল।

১৯৩০ সালের দিকে লবণ একটি বিরাট রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে দেখা দেয়। মহাত্মা গান্ধী তৎকালীন লবণ আইন অমান্য করে পশ্চিম ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী ডান্ডি নামক স্থানে সমুদ্র জল হতে লবণ আহরণ করার জন্য প্রায় ৭৯ জন নারী ও পুরুষ নিয়ে "সবরমতি" আশ্রম হতে ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ যাত্রা করেন এবং ১৪ দিনে ২৪১ মাইল পথ অতিক্রম করে ডান্ডি উপস্থিত হন। এটি ছিল গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম ধাপ।[১৬] পরবর্তীকালে তদানীন্তন ভারতে প্রায় সর্বত্রই লোকজন বেআইনিভাবে লবণ প্রস্তুত এবং ক্রয় ও বিক্রয় আরম্ভ করে। ঐ সময় ডান্ডিতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠিচার্জ করলে অনেক লোক আহত হয়। মহাত্মা গান্ধী কারারুদ্ধ হন এবং তাঁর সাথে বহু লোক কারাবরণ করেন। পরে ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসে মহাত্মা গান্ধীকে কারাগার হতে মুক্তি দেয়া হয়। তাঁর লবণ আন্দোলনের প্রভাবে লবণ উৎপাদন আবার শুরু হলেও নতুন লবণ-শিল্প প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশদের প্রবল বিরোধিতা ছিল।

১৯৪৭-এর পর থেকে এই লবণ-শিল্পটি পুনরুজ্জীবিত হলেও এখানকার উৎপাদিত লবণের উপর অধিক আবগারি শুল্ক ধার্য করায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানিকৃত খনিজ লবণের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম তথা কক্সবাজারে উৎপাদিত সামুদ্রিক লবণ পিছিয়ে পড়ে। পাকিস্তান আমলে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে কক্সবাজারে উৎপাদিত লবণের উপর প্রতি মণে আড়াই টাকা করে ট্যাক্স ধার্য করা হয়। তখন ট্যাক্স বাদ দিয়ে লবণের পাইকারি মূল্য ছিল প্রতি মণ ৪.৫০ টাকা এবং খুচরা দর ছিল প্রতি মণ ১০ টাকা। সুতরাং দেখা যায় যে, তখন দেশি লবণের উপর শতকরা ৫০ টাকার উপর শুল্ক ধার্য করা হয়। এ ট্যাক্স পশ্চিম পাকিস্তানের লবণ যাতে বাংলাদেশে বিক্রয় হয় সে জন্যই ধার্য করা হয়েছিল। ঐ সময় বিদেশ হতে প্রায় ৬৯ লক্ষ মণ লবণ আমদানি করা হয়।[১৭] বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর আওয়ামী লীগ সরকার লবণের উপর থেকে সকল প্রকার ট্যাক্স তুলে নেয় এবং বিদেশ থেকে লবণ আমদানি নিষিদ্ধ করে। ফলে এদেশের লবণ-শিল্প উপযুক্ত মূল্য পেতে শুরু করে। অবহেলিত লবণ-শিল্প মূল্যবান শিল্পে রূপ নেয়। বলতে গেলে এ সময়টা ছিল বাংলাদেশে

লবণ শিল্পের-স্বর্ণযুগ।[১৮] বর্তমানে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে কক্সবাজার জেলায় অধিকাংশ লবণ চাষিদের অবস্থান। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকারের শিল্পনীতির কল্যাণে লবণ-শিল্পে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। কক্সবাজার জেলার লবণ চাষিরা পুনরায় নব উদ্যমে লবণ চাষের দিকে মনোযোগ দেয়। সরকার লবণ-শিল্পকে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার অন্তর্গত বৃহৎ শিল্প হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করে এবং বিনিয়োগকারীরাও লবণ চাষে ও লবণ উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেয়।

লবণ চাষ (উৎপাদন) পদ্ধতি

লবণ-শিল্পের কয়েকটি চাষ পদ্ধতি রয়েছে।সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও দ্বৈতীয়িক উৎসের মাধ্যমে নিম্নোক্ত তিনটি চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়।

সনাতন পদ্ধতি: মলঙ্গী নামে পরিচিত কক্সবাজারের এক শ্রেণির লোক অতীতকাল থেকে সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত মাটি হতে অনুস্রাবণ পদ্ধতিতে লোনা জল প্রস্তুত করত এবং পরে ঐ লোনাজলকে সিদ্ধ করে লবণ আহরণ করত। আবার কোথাও সমুদ্রের লোনাজল সিদ্ধ করে ঘনীভূত করা হত। ঘনীভূত হয়ে ঐ জল ২৫° হতে ২৯° বি (Boron)-এ পৌঁছালে এবং দানা বাঁধলে ঐ রূপ সম্পৃক্ত লোনা জলকে আগুনের তাপে বাষ্পীভূত করে লবণ আহরণ করা হত। তাদের লবণ উৎপাদন ক্ষেত্রকে 'তোফল' বলা হত।[১৯]

সনাতন পদ্ধতিতে লবণ চাষ

সনাতন পদ্ধতিতে লবণ চাষ

সৌর পদ্ধতিতে লবণ তৈরির প্রণালী: সৌর পদ্ধতিতে লবণ তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমত সমুদ্র উপকূলে লোনা জল প্রবেশের জন্য বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ওয়াপদা নির্মিত বেড়ি বাঁধ থাকে। এই বাঁধে একটি স্লুইচ গেইট বা জলকপাট রাখা হয়। বাঁধের ভেতর লবণ পাটিকা (Salt Bed) তৈরি করা হয়। সাধারণত ১০ ফুট দীর্ঘ ৭০ ফুট প্রস্থ এ রকমের ৫টি হতে ৭টি ক্ষেত্র একটির পর একটি করে এক সারিতে তৈরি করা হয়। ঐ ক্ষেত্রগুলো একটি হতে আরেকটি কিঞ্চিৎ নিচু করে প্রস্তুত করা হয়। শেষ ক্ষেত্রটিকে অর্থাৎ সবচেয়ে নিচু ক্ষেত্রটিকে ভাল করে চষে নেয়া হয় এবং মই দিয়ে সমান করে কাস্ট নির্মিত রোলার গড়ানের (স্থানীয় ভাষায় গরা বলা হয়) চাপে শক্ত করে অভেদ্য করা হয়। এ বেডগুলোর চারদিকে নালা কাটা হয়। পরে বেড়ি বাঁধের স্লুইচ গেইট বা জলকপাট দিয়ে জোয়ারের সময় ঐ নালায় লোনা জল প্রবেশ করানো হয়। এরপর ১নং বেডে ঢেঁকি কলের সাহায্যে নালা হতে লোনা জল প্রবেশ করানো হয়। এ লোনাজলকে একদিন পরে ২নং বেডে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। এরূপ একদিন পর একদিন করে ছয় দিনে ১নং হতে ৬নং বেড পর্যন্ত লোনা জল ঢালা হয়। দিনে দিনে লোনা জল ক্রমাগত ঘনীভূত হতে থাকে। এর মধ্যে লবণ প্রস্তুতকারীরা বাঁশের একপ্রকার ছোট নল মিটার বা পরিমাপ যন্ত্র ব্যবহার করে তা ঐ ঘনীভূত জলে যতদূর ডুবল বা ভেসে থাকল তা দেখে লবণ প্রস্তুতকারী বলতে পারেন ঐ জল কখন দানা বাঁধবে। এভাবে লোনা জল শেষ পাটিকায় গেলে তা সূর্যের তাপে বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং ঐখানে কেবল লবণের স্তরই থাকে। ঐ লবণ একপ্রকার আঁচড়া দিয়ে কুড়িয়ে নেয়া হয়। পূর্বেই একটি গর্তে কিছু লোনা জল ঘনীভূত অবস্থায় সঞ্চয় করে রাখা হয়। ঐ জলে সদ্যপ্রাপ্ত লবণকে ধুয়ে নেয়া হয়। এই ধৌত লবণ তখন খাওয়ার উপযুক্ত হয় এবং তা বাজারজাত করা হত।

সৌর পদ্ধতিতে লবণ চাষ

বর্তমান চাষ পদ্ধতি: সমুদ্র ও নদীর লবণাক্ত পানি দিয়েই উৎপাদিত হয় লবণ। সমতল ভূমিকে চারপাশে মাটির ছোট আইল (মাটি দিয়ে উঁচু করে বেড়ার মত) দিয়ে ছোট ছোট প্লট আকৃতির জায়গা বানানো হয়। এরপর ছোট প্লটগুলো রোদে ভালভাবে শুকিয়ে কালো পলিথিন বিছিয়ে দেওয়া হয়। এরপর নদী থেকে ইঞ্জিনচালিত শ্যালো মেশিন দিয়ে লোনা পানি এনে ছোট ছোট ঐ প্লট ভর্তি করা হয়।

এভাবে পানি সংগ্রহ করার পর ৪ থেকে ৫ দিন রোদে রাখা হয়। কড়া রোদে পানি বাষ্পীভূত হয়ে চলে যায় আর লবণ পড়ে থাকে পলিথিনের উপর। লবণের সাদা দানা একটু ঝরঝরে হলেই রিফাইনারি মেশিনের মাধ্যমে লবণ পরিশোধিত করে বস্তা ভর্তি করা হয়। প্রতি বস্তায় ৮০ কেজি করে লবণ থাকে। এ লবণ দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ হয়ে থাকে। এখান থেকে বড় বড় কোম্পানি প্রাথমিকভাবে পরিশোধন করা লবণ নিয়ে নিজেদের মেশিনে আরো ঝরঝরে করে। এরপর কোম্পানি মোড়কজাত করে বাজারে সরবরাহ করে।

লবণ উৎপাদনের জমি, কক্সবাজার

আধুনিক পদ্ধতিতে লবণ চাষ

চকরিয়ায় লবণ চাষে ব্যস্ত চাষি

উত্তর ধুরুং, কুতুবদিয়ায় লবণ চাষ

লবণ চাষ সম্পর্কে কক্সবাজারের ইসলামপুর ইউনিয়নের লবণ চাষি ও হাজী রিফাইনারির মালিক জাবেদ আল মামুন বলেন, "লবণ চাষ মূলত আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। একটু ঝড় বৃষ্টি হলেই লবণ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। শীতের কুয়াশাও লবণের জন্য ক্ষতিকর। তাই এ ব্যবসা খুবই ঝঁকিপূর্ণ।"[২০] তিনি ১৫ বছর ধরে লবণ চাষের সঙ্গে জড়িত। নিজের ও লিজ নেওয়াসহ ৪০ কানি (এক কানি সমান ৪০ শতাংশ) জমি লবণ চাষে ব্যবহার করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, "লবণ চাষের ভরা মৌসুম হচ্ছে ফাল্গুন ও চৈত্র মাস। আরো চার মাস

লবণ উৎপাদন হয় ভালো। রোদ থাকলে চৈত্র মাসে এক কানিতে ১২০ মণ পর্যন্ত লবণ উৎপাদিত হয়। এজন্য চৈত্র মাসকে বলা হয় লবণের জন্য 'কিং অব কিং' অর্থাৎ লবণ চাষের জন্য রাজা।"[২১]

মাতারবাড়ি, মহেশখালি মাঠ থেকে সংগৃহীত লবণের স্তূপ

টেকনাফে লবণ চাষে ব্যস্ত চাষিরা

সারাদেশের লবণের চাহিদার ৮০ ভাগই কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে মেটানো হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ে এক বস্তা (৮০ কেজি) লবণের মূল্য ৬০০ টাকা, মিলে পরিশোধন করার পর তা হয়ে যায় ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা। কক্সবাজারের ইসলামপুর লবণ-শিল্প এলাকা থেকে নৌকা ও ট্রাকে করে বিভিন্ন জেলায় লবণ সরবরাহ করা হয়।

লবণ চাষকে কেন্দ্র করে ইসলামপুরে রয়েছে ৪০টি রিফাইনারি ফ্যাক্টরি। এর মধ্যে বর্তমানে ৩০-৩৫টি সচল রয়েছে। একটি রিফাইনারি ফ্যাক্টরি চালু করতে হলে কমপক্ষে ৭০ টন লবণ

প্রয়োজন। প্রতিটি ফ্যাক্টরিতে ৩০-৪০ জন শ্রমিক কাজ করেন। মিতালী সল্ট রিফাইনারির স্বত্বাধিকারী মো. ইউনূস বলেন, "এ শ্রমিকদের কাজ দিতে হলে সপ্তাহে ৭০ টন লবণ প্রয়োজন।"[২২]

লবণ উৎপাদন এলাকা

আরাকান শাসন আমল থেকে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বাঁশখালি এলাকায় লবণ উৎপাদন হয়ে আসছে। বর্তমানে কক্সবাজারের নিম্নলিখিত উপজেলায় লবণ উৎপাদিত হয়।[২৩]

১. কক্সবাজার সদর উপজেলা
২. রামু উপজেলা
৩. মহেশখালি উপজেলা
৪. চকরিয়া উপজেলা
৫. পেকুয়া উপজেলা
৬. কুতুবদিয়া উপজেলা
৭. টেকনাফ উপজেলা।

বর্তমানে উপরিউক্ত উপজেলার যেসব স্থানে লবণ উৎপাদিত হয় তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হলো:[২৪] খুরুসকুল, পি.এম. খালি, ভারুয়াখালি, ধলিরছড়া, নাপিতখালি, চৌফলদন্ডী, পোকখালি, গোমাতলি, গোরকঘাটা, হোয়ানক, ধলঘাটা, বড় মহেশখালি, শাপলাপুর, কালারমার ছড়া, মাতারবাড়ি, ডুলাহাজরা, ফুলছড়ি, পেকুয়া, পশ্চিম বড় ভেওলা, বদরখালি, দরবেশকাটা, মগনামা, রাজাখালি, লেমশিখালি, বড় ঘোপ, আলী আকবর ডেইল, খাজুর বিল, উত্তর ধুরুং, দক্ষিণ ধুরুং, টেকনাফ।

লবণের শ্রেণিবিভাগ

লবণ ব্যবহারের প্রকারভেদ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ভোজ্য লবণ, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত লবণ, প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যবহৃত লবণ এবংশিল্পের কাঁচামালের সহযোগী হিসেবে ব্যবহৃত লবণ।

ভোজ্য লবণ: মানুষ প্রতিদিন খাদ্যে যে আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ করে থাকে তাকেই ভোজ্য লবণ বলা হয়। আমাদের দেশে আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধে ১৯৮৯ সালের আইন ও ১৯৯৪ সালের বিধিমালা মোতাবেক ভোজ্য লবণে জলীয় অংশের পরিমাণ তার অশুষ্ক নমুনার ওজনের ৬.০ শতাংশের বেশি হবেনা এবং শুষ্ক ওজনের ভিত্তিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড কমপক্ষে ৯৭.০ শতাংশ, পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ অনধিক ০.১ শতাংশ, পানিতে দ্রবণীয় পদার্থ (সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্যতীত) অনধিক ৩.০ শতাংশ, কপার অনধিক ২.০ পিপিএম, লিড অনধিক ২.০ পিপিএম, আর্সেনিক অনধিক ০.৫ পিপিএম, ক্যাডমিয়াম অনধিক ০.৫ পিপিএম, মারকারি অনধিক ০.১ পিপিএম এবং আয়োডিনের পরিমাণ অনধিক ৪৫ হতে ৫০ পিপিএম ও খুচরা বিক্রয়ের সময় ন্যূনতম ২০ পিপিএম উৎপাদন থাকবে।[২৫]

মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত লবণ: কক্সবাজারে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণেও লবণ ব্যবহার করা হয়। মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত লবণের বাংলাদেশ জাতীয় মান (বিডিএস ১৪) রয়েছে। উক্ত মান অনুযায়ী মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত লবণে সোডিয়াম ক্লোরাইড কমপক্ষে ৯৮.০ শতাংশ, পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ অনধিক ০.৫ শতাংশ, ক্যালসিয়াম অনধিক ০.১৫ শতাংশ, ম্যাগনেসিয়াম অনধিক ১.০ শতাংশ, কপার অনধিক ৩.০ পিপিএম, লিড অনধিক ৫.০ পিপিএম, আর্সেনিক অনধিক ১.০ পিপিএম উৎপাদন থাকবে।[২৬]

প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যবহৃত লবণ: হাঁস, মুরগি ও গবাদি পশুর খাদ্য প্রস্তুতের জন্য প্রচুর লবণ ব্যবহার করা হয়।

শিল্পের কাঁচামালের সহযোগী হিসেবে ব্যবহৃত লবণ: শিল্প কারখানায় কিছু কিছু পণ্য উৎপাদনে লবণ ব্যবহার করা হয়। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত লবণের সোডিয়াম ক্লোরাইড কমপক্ষে ৯৮.০ শতাংশ, পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ অনধিক ০.২৫ শতাংশ, ক্যালসিয়াম অনধিক ০.২০ শতাংশ, ম্যাগনেসিয়াম অনধিক ০.২০ শতাংশ, সালফেট অনধিক ১.০ শতাংশ এবং কার্বনেট অনধিক ০.১০ শতাংশ উৎপাদন থাকবে।[২৭]

শিল্পের কাঁচামালের সহযোগী হিসেবে ব্যবহৃত লবণকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে নির্দিষ্ট মানের লবণ ব্যবহার করে লবণ থেকে অন্য রাসায়নিক দ্রব্য যেমন কস্টিক সোডা, ক্লোরিন ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়।
২. এছাড়া শিল্পকারখানায় অন্য কাঁচামালের সাথে সহযোগী কাঁচামাল হিসেবে লবণ ব্যবহার করা হয়। যেমন: সাবান ও ডিটারজেন্ট প্রস্তুত, কাঁচাচামড়া সংরক্ষণ, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, আইসপ্লান্ট, কাপড় ও পাটজাত পণ্য রং করা ইত্যাদি।

লবণশিল্পের বর্তমান অবস্থা

দেশের একমাত্র লবণ উৎপাদনকারী অঞ্চল কক্সবাজারের ছয় উপজেলা এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালির লবণ চাষিদের দুঃখ দুর্দশার শেষ নেই। প্রতি বছর ভোক্তা ও শিল্প খাতে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে উদ্বৃত্ত লবণ উৎপাদন করে আসছে বছরের পর বছর। কিন্তু বিপরীতে ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার পাশাপাশি শিল্পখাতে ব্যবহারের জন্য এক শ্রেণির মিল মালিক ভারত ও চীন থেকে সোডিয়াম সালফেট আমদানি করায় দেশীয় লবণ-শিল্প চরম হুমকির মুখে পতিত হয়েছে। অবশ্য সম্প্রতি কক্সবাজারে লবণ চাষি সমাবেশে শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, "লবণ শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। চাষিদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা সহ নানা সমস্যা মোকাবেলায় লবণ বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।"[২৮] লবণ চাষি কল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের সাথে কথা বলে জানা যায়, শিল্প কারখানায় দেদারছে ব্যবহার করা হচ্ছে চীন ও ভারত থেকে আমদানি করা সোডিয়াম সালফেট লবণ। ভারতের চেয়ে চীনের আমদানি করা সালফেট লবণ দেখতে অধিকতর সাদা। চীন ও ভারত থেকে আনা এই সালফেট লবণ দামেও সস্তা। কক্সবাজারে উৎপাদিত

লবণ একটু কালচে এবং ভেজা। কিন্তু সালফেট লবণ যেমনি সাদা তেমনি শুকনো, ঝরঝরে এবং কার্যকরও।[২৯]

কক্সবাজার ও চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মাছের খামারের খাদ্য তৈরি করতে ভারত এবং চীনের আমদানি করা সালফেট ব্যবহার করা হয়। সাগর থেকে আহৃত ছোট আকৃতির মাছসহ সামুদ্রিক হরেক রকমের পচা মাছ এবং শামুক নিয়ে মাছের খামারের এসব খাদ্য তৈরি করা হয়।

ভারত ও চীনের সালফেট লবণের ৭৪ কেজির এক বস্তার দাম ৫৮০ টাকা, অপরদিকে কক্সবাজারের উপকূলীয় মাঠে উৎপাদিত লবণের এক বস্তার দাম ৬৫০ টাকা। প্রতি বস্তায় ৭০ টাকা কম হওয়ার কারণেই সালফেট লবণ ব্যবহার করা হয় মাছের গুঁড়ি খাবারে, ফলে দেশীয় লবণ বিক্রি হচ্ছে না। এতে করে লবণ চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অপরদিকে শিল্প কারখানার লবণে প্রস্তুত করা খাবারের মাছ মানবদেহে গিয়ে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতি সূত্রে জানা যায়, আমদানিকারকরা এক প্রকার বিনা বাধায় মিসডিকলারেশনের মাধ্যমে সোডিয়াম সালফেট আমদানি করছেন। ব্যাংকসমূহ প্রতিনিয়ত এলসি খুলে আমদানির সুযোগ করে দিচ্ছে আমদানিকারকদের। সমিতির সভাপতি নুরুল কবির বলেন, "এই পণ্যটি ইভাপোরেটেড লবণ সাদৃশ্য হবার কারণে সরাসরি প্যাকেটজাত হয়ে খাদ্য লবণ হিসেবে বাজারজাত হয়ে যাচ্ছে, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।"[৩০] তিনি আরো বলেন, "গার্মেন্টস শিল্পে সোডিয়াম সালফেটের প্রয়োজন নেই। কিন্তু গার্মেন্টস শিল্প কারখানার জন্যও আমদানি করা হচ্ছে সোডিয়াম সালফেট। অথচ সরকার চাইলেই সালফেট আমদানি বন্ধ করতে পারে দেশীয় লবণ শিল্পের স্বার্থে। তদুপরি সোডিয়াম সালফেট, কস্টিক সোডা উৎপাদনের জন্য এবং বিভিন্ন রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য লবণ আমদানিতে বিডা এবং সরকারের অন্যান্য সংস্থা আমদানির অনুমতি দিয়ে থাকে। মিল মালিক সমিতি এক্ষেত্রেও জাতীয় লবণ কমিটি, শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি বাধ্যতামূলক করতে পারে। বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতি এসব দাবি লিখিতভাবে জানিয়েছে শিল্পমন্ত্রীর কাছে।"[৩১]

এদিকে উৎপাদিত লবণের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে মাঠ ছেড়েছেন অনেক লবণ চাষি। লবণ চাষিদের মতে, গত বছরের মৌসুমে নিজস্ব জমিতে উৎপাদিত প্রতি কেজি লবণ বিক্রি করেন ৬ টাকা ৭৫ পয়সা দামে। এতে করে উৎপাদন খরচ মিটিয়ে কেজি প্রতি কমপক্ষে ১ টাকা পর্যন্ত লাভ করতেন। কিন্তু এবার চাষিরা প্রতি কেজি লবণ বিক্রি করেন মাত্র ৪ টাকা দরে। এতে করে তার উৎপাদন খরচে কেজিতে ২ টাকারও বেশি ক্ষতি গুনতে হচ্ছে।[৩২] কক্সবাজার-১ আসনের সংসদ সদস্য ও চকরিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জাফর আলম দৈনিক আজাদীকে বলেন, "প্রতিবছর আমার জেলা কক্সবাজারের লাখের বেশি চাষি তাদের প্রায় ৭০ হাজার একর জমিতে লবণ উৎপাদন করে দেশের ভোক্তা ও শিল্পখাতে লবণের চাহিদা পূরণ করে আসছে। কিন্তু যেসব প্রভাবশালী মিল মালিক সিন্ডিকেট করে

লবণের দাম কমিয়ে দিয়ে এবং অন্যদেশ থেকে লবণ আমদানি করছেন তাতে দেশীয় লবণ শিল্পের বারোটা বাজছে। তাই বিষয়টি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেছিলাম সংসদ অধিবেশনে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পমন্ত্রী লবণ শিল্পকে যথাযথ জায়গায় নিয়ে যেতে কাজ শুরু করেছেন বলে আশ্বস্ত করেন।"[৩৩]

লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যালয়, বিসিক, কক্সবাজার-এর ভূমিকা[৩৪]

লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যালয়, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর একটি তত্ত্বাবধানকারী প্রতিষ্ঠান। এ সংস্থা (বিসিক) বহুবিধ কুটির শিল্পের উন্নয়নে নিয়োজিত। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে লবণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি অন্যতম। লবণ-শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যম উপকূলীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান এবং দেশে লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ইপসিক (বর্তমানে বিসিক) বিগত ১৯৬০ সাল হতে কক্সবাজার এলাকায় কাজ করে আসছে। লবণ-শিল্প দেশের সর্ববৃহৎ শ্রমনিবিড় কুটির শিল্প। লবণ উৎপাদন থেকে মিল পর্যায়ে প্যাকেটজাত হওয়া পর্যন্ত এ শিল্পের সঙ্গে প্রায় ৫ লক্ষ লোক জড়িত এবং তাদের উপর প্রায় ২৫ লক্ষ লোক নির্ভরশীল। জাতীয় অর্থনীতিতে এ শিল্প প্রতি বছর ১২০০ হতে ১৫০০ কোটি টাকার অবদান রাখে, যা ফিনিস গুডস হিসেবে প্রক্রিয়াজাত হয়ে ৩০০০-৩৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৬০ সালে তৎকালীন ইপসিক সর্বপ্রথম উপকূলীয় অঞ্চলের মাত্র ৬০০০ একর জমি নিয়ে সৌর পদ্ধতিতে লবণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন লবণ-শিল্প উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়। এটি বাস্তবায়নের জন্য ১৩ মিলিয়ন টাকার প্রকল্প গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউনিসেফের কাছ থেকে ২২.৬ মিলিয়ন টাকা অর্থ সাহায্য পায়। ১৯৯০ সালে ৩,৭৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বিসিক বিশেষ উন্নয়ন ও উৎপাদন শীর্ষক ৩টি কর্মসূচি গ্রহণ করে যার মধ্যে একটি উপ-প্রকল্প ছিল লবণ শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কিত এবং এর প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৮৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, গুণগত মান বৃদ্ধি, উৎপাদনকারীদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, লবণ চাষিদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং লবণের চাহিদা সরবরাহ ও উৎপাদন পর্যবেক্ষণ করা।

২০০৬-২০০৭ অর্থবছর থেকে এ প্রকল্পটি সরকারের রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ প্রকল্পের কেন্দ্রগুলির অবস্থান কক্সবাজার জেলার ৭টি থানা যথা: সদর, রামু, মহেশখালি, চকরিয়া, পেকুয়া, কুতুবদিয়া, টেকনাফ এবং চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি থানা এলাকার ১২টি কেন্দ্র। লবণের স্বাভাবিক চাহিদা মেটানো এবং আপদকালীন সময়ে সরবরাহ নিশ্চিত করে দাম স্থিতিশীল রাখতে এ প্রকল্পটি ভূমিকা রাখে। বর্তমানে কক্সবাজার জেলায় ২০১৮-২০১৯ লবণ মৌসুমে লবণ চাষি আনীত জমির পরিমাণ ৬০,৫৯৬ একর দাঁড়ায়। এ জমিতে

২৯,২৮৭ জন লবণ চাষি ১৮.২৪ লক্ষ মেট্রিকটন লবণ উৎপাদন করে যা লবণ উৎপাদনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

দেশে গুণগত মানসম্পন্ন লবণ উৎপাদনের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে লবণ-শিল্পের উন্নয়ন কার্যালয়, বিসিক, কক্সবাজার-এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

১. লবণ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিসিকে একটি লবণ ডিভিশন গঠন;
২. লবণ চাষিদের রক্ষা করতে লবণ আমদানি নিরুৎসাহিত করা;
৩. লবণ চাষিদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান;
৪. উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে লবণ উৎপাদনে সহায়তাকরণ;
৫. লবণ চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন এলাকা চিহ্নিত করা;
৬. ১-২ লক্ষ মেট্রিকটন লবণ মজুদের জন্য বাফার গুদাম স্থাপন;
৭. প্রকৃত লবণ চাষিদের মাঝে লবণ চাষের জমি বরাদ্দকরণ;
৮. প্রকৃত লবণ চাষিদের মধ্যে পরিচয়পত্র প্রদান।

বিসিকের সহায়তায় অপরিশোধিত লবণ উৎপাদন :

অর্থবছর	চাহিদা	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	মোট উৎপাদন
২০১৩-১৪	১৫.৮০ লক্ষ মে. টন	১৬.০০ লক্ষ মে. টন	১৭.৫৩ লক্ষ মে. টন
২০১৪-১৫	১৬.৫৮ লক্ষ মে. টন	১৮.০০ লক্ষ মে. টন	১২.৮২ লক্ষ মে. টন
২০১৫-১৬	১৭.৪০ লক্ষ মে. টন	১৮.০০ লক্ষ মে. টন	১৫.৫৫ লক্ষ মে. টন
২০১৬-১৭	১৬.৫৭ লক্ষ মে. টন	১৮.০০ লক্ষ মে. টন	১৩.৬৪ লক্ষ মে. টন
২০১৭-১৮	১৬.৫৭ লক্ষ মে. টন	১৮.০০ লক্ষ মে. টন	১৩.২৫ লক্ষ মে. টন

পরিমিত মাত্রায় আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিবরণ :

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	উৎপাদনের পরিমাণ
২০১৬-১৭	১৯৩	৮.০৭ মে. টন	৭.০৭ লক্ষ মে.টন
২০১৭-১৮	২১০	৮.০৭ মে. টন	৫.০৩ লক্ষ মে.টন

সূত্র: বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ওয়েবসাইট

২০১৬-২০২০ মেয়াদে খাতভিত্তিক বাৎসরিক লবণের মোট চাহিদা নিরূপণ :

অর্থবছর	জনসংখ্যা	ভোজ্য লবণের বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মে. টন)	শিল্পখাতে ব্যবহার্য লবণের বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মে. টন)	প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যবহার্য লবণের বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মে. টন)	মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত লবণের বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মে. টন)	লবণের চাহিদা (৩+৪+৫+৬) (লক্ষ মে. টন)	মোট লবণের চাহিদা (১০% প্রসেস লস ধরে) (লক্ষ মে. টন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১৫-২০১৬	১৬,০৩,১৬,৭৫৫	৮.৪৮	৩.৪৩	২.০২	০.০১	১৩.৯৪	১৫.৩৩
২০১৬-২০১৭	১৬,২৫,১৩,১১৫	৮.৬০	৩.৬০	২.১২	০.০১	১৪.৩৩	১৫.৭৬
২০১৭-২০১৮	১৬,৪৭,৩৯,৫৪৫	৮.৭২	৩.৭৮	২.২৩	০.০১	১৪.৭৪	১৬.২১
২০১৮-২০১৯	১৬,৬৯,৯৬,৪৭৭	৮.৮৪	৩.৯৭	২.২৪	০.০১	১৫.০৬	১৬.৫৭
২০১৯-২০২০	১৬,৯২,৮৪,৩২৯	৮.৯৬	৪.১৭	২.৪৫	০.০১	১৫.৫৯	১৭.১৫

সূত্র : *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত, নভেম্বর ২০, ২০১৬

লবণ-শিল্পের উন্নয়নের সুপারিশমালা

মুক্তবাজার অর্থনীতির বর্তমান প্রতিযোগিতায় দেশে অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের সাথে সাথে লবণ শিল্পের উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় লবণ উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, লবণ চাষি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মতে এ শিল্পের উন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. লবণ উৎপাদনে পলিথিন পদ্ধতি প্রয়োগ করে সাদা লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

২. লবণের গুণগত মান রক্ষা এবং লবণের ন্যায্য বিক্রয়মূল্য প্রাপ্তির জন্য লবণচাষি কর্তৃক কালো লবণ উৎপাদন নিষিদ্ধ করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বিসিককে কালো লবণ উৎপাদন বন্ধের জন্য প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে।

৩. একর প্রতি লবণ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত মানের লবণ মাঠ প্রস্তুত ও লবণ উৎপাদনের জন্য লবণ চাষিদের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদকে (বিসিএসআইআর) একর প্রতি লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নিতে হবে।

৪. প্রাকৃতিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার হাত হতে লবণ চাষযোগ্য জমি রক্ষাকল্পে প্রয়োজনীয় বেড়ি বাঁধ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামতের ব্যাপারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিসিককে যোগাযোগ করতে হবে। বেড়ি বাঁধের বাইরে লবণ চাষ নিরুৎসাহিতকরণে বিসিককে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা নিতে হবে।

৫. সরকারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে লবণ উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ ও বাজারজাতকরণ প্রতিটি ক্ষেত্রে বিসিককে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

৬. লবণের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণসহ আপদকালীন সময়ের জন্য বাফার স্টকের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. প্রান্তিক লবণ চাষি, বর্গাচাষি ও লবণ মিল মালিকদের সহজ শর্তে এবং প্রয়োজনে মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরও)-এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককর্তৃক তফসিলী ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে হবে।
৮. উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতমানের লবণ উৎপাদন বাড়াতে হবে।
৯. আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯ ও বিধিমালা ১৯৯৪ মোতাবেক আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন এবং আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহারে জনসচেতনতা তৈরিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
১০. আবশ্যকীয় ক্ষেত্র ছাড়া ক্রুড লবণ আমদানির অনুমতি দেয়া যাবে না। ক্রুড লবণ আমদানির প্রয়োজন হলে অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে ছোট/বড় সকল চালু লবণ মিল তাদের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী ক্রুড লবণ আমদানির সুবিধা দিতে হবে।
১১. শিল্পে ব্যবহৃত লবণ দেশে উৎপাদনের লক্ষ্যে বিসিক ও বিসিএসআইআরকে যৌথভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
১২. লবণ শিল্পের উন্নয়নে লবণ মিল মালিক সমিতি এবং লবণ চাষিকল্যাণ সমিতিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করতে হবে। লবণ চাষিদের মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। লবণ আমদানি নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি অবৈধ পথে বিদেশি লবণের অনুপ্রবেশ বন্ধের মাধ্যমে দেশীয় এ কুটির শিল্পকে সাফল্যজনক অবস্থায় উন্নীত করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে হবে।
১৩. বিসিককে জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত লবণ চাষে ব্যবহৃত জমির সদ্ব্যবহার ও লবণ চাষির উন্নয়ন করতে হবে।
১৪. লবণ উৎপাদনে কক্সবাজার অঞ্চলে নতুন জমি নির্বাচন করতে হবে এবং নির্বাচিত জমি যাতে কৃষি জমির অন্তর্ভুক্ত না হয় সেদিকে বিসিককে তদারকি করতে হবে।
১৫. ভূমি মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিসিককে প্রদত্ত সরকারি খাসজমি ১০ বছর মেয়াদি লিজ প্রদান করতে হবে।

উপরোক্ত সুপারিশমালা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই শিল্পের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে আগ্রহ আছে।

উপসংহার

কক্সবাজারের লবণ-শিল্প একটি প্রাচীন শিল্প। এই শিল্প কেবল কক্সবাজারের উপকূলীয় এলাকার হতদরিদ্র লবণ চাষিদের স্বার্থ রক্ষা করে না; স্বার্থ রক্ষা করে সমগ্র বাংলাদেশের ১৬কোটি মানুষের। তাই দেশের মানুষের স্বার্থে দেশকে লবণে সক্ষমতা অর্জন করার জন্য বিদেশ থেকে অহেতুক সোডিয়াম সালফেট লবণের নামে সোডিয়াম ক্লোরাইড আমদানি বন্ধ করতে হবে। দেশে লবণের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে লবণ উৎপাদন এলাকা সম্প্রসারিত করতে হবে। লবণ উৎপাদনে নিয়োজিত চাষিদের উৎপাদিত লবণের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করে

সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। লবণ শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ অতিদ্রুত বাস্তবায়ন করা দরকার। এর পাশাপাশি এ শিল্পের উন্নয়নে উন্নত প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অর্জিত জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের যথাযথ ব্যবস্থা থাকা দরকার। এর মাধ্যমে কক্সবাজারের লবণ-শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র

১. মোহাম্মদ আমীন, *চকরিয়ার ইতিহাস*, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন কন্ট্রাক্টর কর্তৃক প্রকাশিত, চট্টগ্রাম, জুন ২০০২, পৃ. ২৬১

২. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কক্সবাজারের অবদান*, শব্দরূপ প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ২য় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৬, পৃ.২১

৩. *https://bn.wikipedia.org/wiki/* বাংলাদেশের লবণ শিল্প।

৪. মলঙ্গী: তৎকালীন সময়ে একশ্রেণির লোক যারা লবণ উৎপাদন করত তাদের মলঙ্গী বলা হত। A.M. Serajuddin, *The Revenue Administration of the East India Company in Chittagong1761-1785*, University of Chittagong, February 1971, p.175

৫. *Ibid*

৬. মাহবুবুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস* [পুরানা আমল], নয়ালোক প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫, পৃ.১১৮

৭. ছৈয়দ আহমেদুল হক, "শিল্প ও বাণিজ্য", *কক্সবাজারের ইতিহাস*, কক্সবাজার ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্পাদিত, কক্সবাজার, ৩০ জুন ১৯৯০, পৃ. ১৬৬

৮. H.J.S. Cotton, *Memorandum on the Revenue History of Chittagong*, Bengal Secretariat Press, Calcutta,1880, p.192

৯. *Ibid*

১০. A.M. Serajuddin, *op.cit*., p. 175

১১. *Ibid,* p. 176

১২. H.J.S. Cotton, *op.cit*., p. 191

১৩. *Ibid*

১৪. ছৈয়দ আহমেদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৭

১৫. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭০

১৬. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৮

১৭. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭০

১৮. নুর আহমদ, *কক্সবাজারের ইতিহাস*, মাহবুবা বেগম কর্তৃক প্রকাশিত; কক্সবাজার, মে ১৯৮৮, পৃ. ৫৫

১৯. A.M. Serajuddin, *op.cit*., p. 233

২০. *বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর.কম*, ৮ এপ্রিল ২০১৬

২১. *পূর্বোক্ত*

২২. *পূর্বোক্ত*

২৩. *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০ নভেম্বর ২০১৬, পৃ. ১৬৬৪৯

২৪. ছৈয়দ আহমেদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৯

২৫. বাংলাদেশ গেজেট, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬৩৯

২৬. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৬৪০
২৭. *পূর্বোক্ত*
২৮. *দৈনিক আজাদী*, চট্টগ্রাম, ১৫ মার্চ ২০২০, পৃ. ১০
২৯. সাক্ষাৎকার: কায়ছার ইদ্রিস (লবণ চাষি কল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক), কক্সবাজার, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০
৩০. *দৈনিক আজাদী*, পূর্বোক্ত
৩১. *পূর্বোক্ত*
৩২. সাক্ষাৎকার: লিয়াকত হোসেন, ইসলামপুর ইউনিয়ন, কক্সবাজার, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০
শামসুল আলম, পোকখালি, কক্সবাজার, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০
গাজীউল হক, হোয়াইক্যং, টেকনাফ, কক্সবাজার, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০
নুরুল আবছার, মাতারবাড়ি, কক্সবাজার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০
৩৩. *দৈনিক আজাদী*, পূর্বোক্ত।
৩৪. লবণ-শিল্পের উন্নয়ন কার্যালয়, বিসিক, কক্সবাজার তথ্য বাতায়ন থেকে সংগৃহীত।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/জুন ২০২১

চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ: কথাসাহিত্যে প্রয়োগবৈচিত্র্য

সরোজকুমার ঘোষ*

সারসংক্ষেপ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপ জুড়ে এক ভয়াবহ বিপর্যয় তথা সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং মনো-দৈহিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় সাহিত্যিকদের জন্য চরিত্রের চেতনালোকের রহস্য উন্মোচন অবশ্য-কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ বা স্ট্রিম অব কনশাসনেস (Stream of consciousness)-এর সাহিত্যকৌশল হিসাবে প্রয়োগ বিশ শতকের শুরুর দিকে পাশ্চাত্যের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। তৎকালীন বাংলায় প্রথম মহাযুদ্ধের ঢেউ প্রবলভাবে না লাগলেও এদেশের কথাশিল্পীরা সাহিত্যের এই নতুন কৌশলটিকে গ্রহণ করতে খুব বেশি বিলম্ব করেননি। আমাদের বর্তমান আলোচনায় সাহিত্যকৌশল হিসাবে ইংরেজি ও বাংলা কথাসাহিত্যে প্রযুক্ত চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহের মুখ্যপ্রবণতাগুলো অনুধাবন এবং তাদের একটি তুলনাচিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ আলোচনায় আকর হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে ইংরেজি ও বাংলা কথাসাহিত্যের স্বীকৃত আটজন চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মকে।

প্রাককথন

চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ বা স্ট্রিম অব কনশাসনেস (Stream of consciousness)-এর ধারণা মনোবিজ্ঞান ও দর্শনে নিয়ে আসেন উইলিয়াম জেমস (১৮৪২–১৯১০) তাঁর *Principles of psychology* (1890-91) গ্রন্থের স্ট্রিম অব থট অধ্যায়ের মাধ্যমে। চেতন অবস্থায় মানুষের অন্তর্ভাবনা ও অনুভূতির ধারাবাহিক পরিবর্তন নির্দেশ করতে গিয়ে উইলিয়াম জেমস এই অভিধা ব্যবহার করেন। সাহিত্যে স্ট্রিম অব কনশাসনেস এক বিশিষ্ট সাহিত্যকৌশল (literary-technique) হিসেবে পরিগণিত। এতে চরিত্রের দৃষ্টিকোণ (point of view) তুলে ধরার জন্য তার চেতনাস্রোতের সমান্তরাল একটি চেতনাস্রোত লেখার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়। ফলে পাঠক ও চরিত্রের চেতনাস্রোতের মধ্যে একটি সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়। পাঠক সেই চরিত্রটির চিন্তা ও অনুভূতির যে প্রবাহ তার সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে মিশে যেতে পারে। বস্তুত পাঠক ও চরিত্রের এই নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই সাহিত্যক্ষেত্রে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-র উদ্ভব ও বিকাশ। সাহিত্যকৌশল হিসেবে এটির সার্থকভাবে প্রয়োগ শুরু হয় বিশ শতকের প্রথম দিকে। এসময় চরিত্রের অন্তর্জীবন পাঠকের সামনে উন্মুক্ত করার একটা প্রবণতা লেখকদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ একটি অব্যর্থ মাধ্যম রূপে আবির্ভূত হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪–১৯১৮) পরবর্তীকালে যথাযথভাবে বিকাশ লাভ করলেও তার উন্মেষ পর্ব শুরু হয় সতের শতকে। ১৬৫৮ সালে প্রকাশিত স্যার টমাস ব্রাউন

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, বগুড়া।

(১৬০৫–১৬৮২)-এর *দ্যা গার্ডেন অফ সাইরাস* উপন্যাসে প্রথম চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-র লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু এর যথার্থ উৎকর্ষ ঘটেছে জেমস অগাস্টিন অ্যালোসিয়াস জয়েস (১৮৮২–১৯৪১), অ্যাডলিন ভার্জিনিয়া উলফ (১৮৮২-১৯৪১), ডরোথি মিলার রিচার্ডসন (১৮৭৩–১৯৫৭), উইলিয়াম ফকনার (১৮৯৭–১৯৬২), জ্যাক কেরোয়াক (১৯২২–১৯৬৯) প্রমুখ কথাসাহিত্যিকের লেখার মধ্য দিয়ে। সাহিত্যসমালোচনায় স্ট্রিম অব কনশাসনেস অভিধা প্রথম প্রয়োগ করেন মেরি আমেলিয়া সেন্ট ক্লেয়ার (১৮৬২–১৯৪৬), যিনি মে সিনক্লেয়ার নামে পরিচিত। ১৯১৮ সালে ডরোথি রিচার্ডসনের *Pilgrimage* (১৯১৫-১৯৩৮) উপন্যাসের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি এটি প্রয়োগ করেন। এ জন্য তাঁকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। স্বয়ং ডরোথি রিচার্ডসনের কাছে স্ট্রিম অব কনশাসনেস অভিধাটি তেমন গ্রহণযোগ্য ছিল না। যদিও বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত যে, তাঁর লেখাতেই সর্বপ্রথম চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-র বহু বিচিত্র রূপ সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যে এক বা একাধিক চরিত্রের সামগ্রিক অবস্থাকে তুলে ধরা হয়। চরিত্রের চেতনায় যে বিভিন্নমুখী, বিচ্ছিন্ন ভাবনা-অনুভূতি, স্মৃতি, অভিব্যক্তি, কল্পনা, অসংগঠিত-অজ্ঞেয় চিন্তা প্রবাহিত হয়ে চলেছে স্ট্রিম অব কনশাসনেসের লেখক তাকে অবিকৃতভাবে তুলে ধরেন। লেখক কাজটি করেন পর্দার অন্তরালে থেকে অর্থাৎ তাঁর কোনো ব্যাখ্যা বা মন্তব্য ছাড়াই চরিত্রের চেতনালোক উদ্‌ঘাটিত হয়। এ সম্পর্কে *Encyclopedia Americana*-য় বলা হয়েছে: "It attempts, without explanation by the author, to represent the thoughts of a character as they flow through his mind."[১] লক্ষণীয়, এখানে থট (Thought) শব্দটি কনশাসনেস (Consciousness)-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সাহিত্যে ব্যবহৃত কৌশলগুলোর মধ্যে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ সবচেয়ে বিভ্রান্তিমূলক (Delusive) সাহিত্যকৌশল হিসেবে স্বীকৃত। এ সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য: "Stream of Consciousness is one of the delusive terms which writers and critics use. It is delusive because it sounds concrete and yet it is used as variously-and vaguely-as romanticism, symbolism and surrealism."[২] সাহিত্যের একটি কৌশল হিসেবে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ বিভ্রান্তিমূলক হয়ে উঠেছে মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, চেতনার বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বরূপের জন্য। দ্বিতীয়ত, চরিত্রের চেতনাস্রোত রূপায়ণে লেখক সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ কলাকৌশল (Technique) প্রয়োগের জন্য।

চেতনা (consciousness)

চেতনা (consciousness) নিয়ে অতীতে বহু গবেষণা হয়েছে এবং এখনো গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন: ফিলোসোফি অব মাইন্ড (philosophy of mind), মনোবিজ্ঞান (psychology), নিউরোসায়েন্স (neuroscience) এবং কগনেটিভ সায়েন্স (cognitive science) নিজ নিজ অবস্থানে থেকে চেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে চেতনা নিয়ে শেষকথা বলার সময় এখনো আসেনি। আমরা এখানে চেতনার একটি সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা দেয়ার চেষ্টা করতে পারি। চেতনার প্রাথমিক ধারণায় বলা যায় এটি মস্তিষ্কের একটি গুণ, যা সাধারণত

আত্মিকতা (subjectivity), আত্মসচেতনতা (self-awareness), সংবেদনশীলতা (sentience) ও জ্ঞানের (sapience) সমন্বিত রূপ। চেতনা তাই যা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির কিংবা ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করতে সক্ষম। সাধারণভাবে বলা যায়, চেতনা বলতে বোঝায় সজাগ হওয়া বা জাগ্রত হওয়া। অন্য অর্থে কোনো বিশেষ ব্যক্তি, বস্তু বা অবস্থা সম্পর্কে সজাগ হওয়া। এই যে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা অবস্থা সম্পর্কে সজাগ হওয়া তার অপর নামই সচেতন হওয়া। কিন্তু ব্যক্তির এই চেতনা কোথায় সংগঠিত হয় বা ব্যক্তি এই চেতনা কোথা থেকে লাভ করে তা নিয়ে মতান্তর রয়েছে। নিউরোলজিস্টদের মতে, চেতনার জন্ম মস্তিষ্কে এবং চেতনা মস্তিষ্কের একটি ক্রিয়া মাত্র। আবার দার্শনিকদের মতে, চেতনা একটি ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধারণা ব্যক্তি লাভ করে ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতির মধ্য দিয়ে, যাকে বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) বলেছেন পারসেপশন (perception)। সাধারণত আমরা যা কিছু শুনি বা দেখি, যা স্মরণ করি, চিন্তা করি তার সম্বন্ধে আমরা সচেতন: "We say that we are "conscious" of what we see and hear, of what we remember, and of our own thoughts and feelings."[৩] বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, আমরা কনশাস (conscious) হই নির্দিষ্ট কিছু উপায়ে যেমন: পারসেপশন, মেমোরি (memory), বিলিভ (belive) প্রভৃতির মাধ্যমে। যার মধ্যে পারসেপশনকে তিনি কনশাসনেস (consciousness)-এর সুস্পষ্ট উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। পারসেপশন সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "I am merely concerned to note that perception of objects is one of the most obvious examples of what is called "consciousness." We are "conscious" of anything that we perceive."[৪] তাঁর মতে, আমরা যা কিছু পারসিভ (Perceive) করি তার সম্পর্কে সচেতন। অর্থাৎ চেতনা সংগঠনে তিনি পারসেপশন বা ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) চেতনার তিনটি স্তর নির্দেশ করেছেন– চেতন (conscious), অবচেতন (unconscious), প্রাক্‌চেতন (precociousness)। এর মধ্যে তিনি অবচেতনকে মনের সবচেয়ে বড় প্রকোষ্ঠ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং চেতন স্তরের চেয়ে এই স্তরকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের অবদমিত আশা, স্বপ্ন, কামনা-বাসনার বাস এই অবচেতন স্তরে। এগুলো প্রকাশ পায় ভ্রম, স্মৃতি, স্বপ্ন প্রভৃতি ক্ষণিক আত্মচেতনার মাধ্যমে। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের চেয়ে কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং (১৮৭৫–১৯৬১) অবচেতনের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর অবচেতনের ধারণা সিগমুন্ড ফ্রয়েডের থেকে পৃথক। তিনি মনে করেন, মানসিক সত্তা পৃথক কতগুলো সিস্টেম (system) নিয়ে গঠিত। এগুলো হলো: অহংবোধ (Ego), অবচেতন, গূঢ়ৈষাসমূহ (complexes), এনিমা (anima) ও ছায়া (shadow)। ইয়ুং মনে করেন অহংবোধ হলো ব্যক্তির আত্মধারণা। এই অহংবোধ বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত মনের চেতন অংশ এবং অচেতন স্মৃতির আধার। আর অহংবোধের ভিতরে রয়েছে ব্যক্তিগত অবচেতন মন (Personal unconscious) এবং আরো গভীরে রয়েছে সমষ্টিগত অবচেতন (collective unconscious)। এই সমষ্টিগত অবচেতন হলো "মনের একটি অন্ধকার রহস্যময় অংশ সেখানে লুকিয়ে থাকে বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাসমূহ।"[৫] কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং ও সিগমুন্ড ফ্রয়েড নির্দেশিত অবচেতন, প্রাক্‌চেতন, ব্যক্তিগত অবচেতন, সমষ্টিগত অবচেতন প্রভৃতি স্তরের চেতনমনের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে। এই অবচেতন মনই চেতনমনের ভিত্তি বলে তাঁদের বিশ্বাস।

এছাড়া নেড ব্লক (১৯৪২) চেতনাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন[৬]: ক. ফেনোমেনাল কনশাসনেস (phenomenal consciousness), খ. অ্যাকসেস কনশাসনেস (access consciousness)। তাঁর মতে ফেনোমেনাল কনশাসনেস চেতনার সেই অংশ যা সজাগ রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, এটি চেতনার এমন একটি অংশ যার দ্বারা ব্যক্তি বাইরের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ লাভ করে বা বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। অপরদিকে অ্যাকসেস কনশাসনেস হচ্ছে চেতনার সে স্তর যেখানে বিমূর্ত ধারণাগুলো কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, অ্যাকসেস কনশাসনেসে রক্ষিত চিন্তা-অনুভূতি-ভাবনা, অবদমিত কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ফেনোমেনাল কনশাসনেসের মাধ্যমে বাইরের জগতে প্রকাশিত হয়। চেতনা স্থির নয়, চেতনা সবসময় প্রবহমান। তাছাড়া চেতনা একক কোনো ধারণা বা অবস্থা নয়। চেতনা মূলত খণ্ড খণ্ড সংগঠিত-অসংগঠিত-প্রায়সংগঠিত-বিচ্ছিন্ন-আপাত বিচ্ছিন্ন ভাবনা, অনুভূতি, স্মৃতি, স্বপ্ন, চিত্র, অনুচিত্রের সম্মিলিত প্রবাহ। চেতনার এই উপাদানগুলোকে উইলিয়াম জেমস নাম দিয়েছেন "mind-stuf"।[৭] তিনি চেতনার পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন[৮]:

ক. প্রত্যেক চেতনা ব্যক্তি সংলগ্ন;
খ. চেতনা সবসময় পরিবর্তনশীল;
গ. চেতনা সবসময় প্রবহমান;
ঘ. চেতনা স্বাধীনভাবে যেকোনো বস্তুকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হতে পারে;
ঙ. চেতনা স্বাধীনভাবে একই সময়ে যেকোনো বস্তুকে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে।

চেতনার প্রবহমানতা নদীর স্রোতের সঙ্গে তুলনীয়। খণ্ড খণ্ড ঢেউয়ের মিলিত প্রবাহ যেমন নদীর স্রোতের সৃষ্টি করে; তেমনি খণ্ড খণ্ড সংগঠিত-অসংগঠিত-প্রায়সংগঠিত-বিচ্ছিন্ন-অপাত বিচ্ছিন্ন ভাবনা, অনুভূতি, স্মৃতি, স্বপ্ন, চিত্র, অনুচিত্রের সম্মিলিত প্রবাহ সৃষ্টি করে স্ট্রিম অব কনশাসনেস বা চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ। উইলিয়াম জেমসের মতে, চেতনা শিকলের মতো একটির সঙ্গে অপরটি সংযুক্ত নয়। দুটি সক্রিয় চেতনার মধ্যে একটি ফাঁকা স্থান থাকে। কিংবা বলা যেতে পারে দুটি সক্রিয় চেতনার মধ্যে একটি সময় ব্যবধান থাকে। কিন্তু সে ব্যবধান কতটুকু? এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম জেমস বলেছেন: "I do not mean necessarily that anyone state of mind has any duration-even if true, that would be hard to establish. The change which I have more particularly in view is that which takes place in sensible intervals of time."[৯] অর্থাৎ চেতনাগুলোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত? কিংবা আদৌ কোন ব্যবধান আছে কিনা? সে তর্কে না গিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন চেতনা একটি নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে প্রবাহিত হয়। চেতনার প্রবহমানতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি উড়ন্ত পাখির চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন: "...in fact, a general view of the wonderful stream of our consciousness, what strikes us first is this different pace of its parts. Like a bird's life, it seems to be made of an alternation of flights and perching."[১০] কোন অন্তঃপ্রেরণা বা বহিরুদ্দীপকে বাধাগ্রস্ত না হলে চেতনা সক্রিয় হবার পর তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। একটি চেতনা শেষ হবার পর কিছুটা সময় বিরতি নিয়ে নতুন চেতনা সক্রিয় হয়। অর্থাৎ দুটি চেতনার মধ্যে

একটি সময় ব্যবধান থাকে। আমরা বলতে পারি একটি চেতনা শেষ হবার পর নতুন চেতনা শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রথম চেতনার রেশ বর্তমান থাকে। চেতনার প্রবহমানতা অন্তঃপ্রেরণা ও বহিরুদ্দীপকের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। চেতনা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের চেতনা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। তাছাড়া একটি চেতনা নদীর স্রোতের মতো একবার প্রবাহিত হয়ে গেলে তা আর ফিরে আসে না। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাস (খ্রি.পূ.৫৩৫-৪৭৫)-এর সেই বিখ্যাত উক্তি: একজন মানুষ এক নদীতে দুই বার স্নান করতে পারে না। গ্রিক দার্শনিকের এই উক্তিটি চেতনাপ্রবাহ সম্পর্কেও সমান সত্য। চেতনাস্রোত মূলত দুটি বিন্দুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। যার সর্বোচ্চ বিন্দুটি হচ্ছে এক্সাইটমেন্ট (excitement) এবং সর্বনিম্নটি কোমা (coma)। এ প্রসঙ্গে পেরি লন্ডন লিখেছেন: "Consciousness is a continuous thing, shifting constantly in an amount and quality, running between comas, the lowest possible state of arousal above death and frenzy, the highest state of excitement."[১১] বলা যেতে পারে এক্সাইটমেন্ট ও কোমা নদীর দুটি কূল, যার মধ্য দিয়ে চেতনাস্রোত তার সংগঠিত-অসংগঠিত আপাত বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা-অনুভূতি-স্বপ্ন বা এক কথায় মাইন্ড স্টাফ (mind-stuf) সহ প্রবাহিত হয়।

কলাকৌশল (technique)

চেতনার স্রোতকে সাহিত্যে মূর্ত করার মানসে "Textual Stream of Consciousness"[১২] বা সাহিত্যিক চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-র উদ্ভব ও বিকাশ। প্রশ্ন আসতে পারে কথাসাহিত্যিক চেতনার কোন অংশটিকে তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করবেন? উত্তরে বলা যেতে পারে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এক্সাইটমেন্ট ও কোমা এই দুই বিন্দুর মধ্যে প্রবাহিত সবকিছুই চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের লেখকের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু তাঁরা গুরুত্ব দেন প্রধানত চেতনার সেই অংশটির ওপর, যা সবেমাত্র সংগঠিত হতে শুরু করেছে বা কিছুটা সংগঠিত হয়েছে। বিষয়টি একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মনে করি, চেতনা জলে ভাসমান একটি বরফখণ্ড। আর এই বরফখণ্ডের দৃশ্যমান উপরিতল হলো চেতন স্তর। এই উপরিতলের ঠিক নিচে যে স্তরটি জলে নিমজ্জিত অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ চেতন স্তরের ঠিক নিচে যে স্তর রয়েছে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের লেখক তাকে কথাসাহিত্যের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের বিষয় প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সমালোচক রবার্ট হামফ্রে চেতনার প্রি-স্পিচ (pre-speech) স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, মূলত এই প্রি-স্পিচ স্তর নিয়েই চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের অধিকাংশ লেখকের কারবার। তিনি হেনরি জেমস (১৮৪৩–১৯১৬)-এর উপন্যাস প্রসঙ্গে বলেছেন :

> Henry James has written novels which reveal psychological processes in which a single point of view is maintained so that the entire novel is presented through the intelligence of a character. But these, since they do not deal at all with pre-speech levels of consciousness, are not what I have defined as stream of consciousness novels.[১৩]

সমালোচকের মন্তব্যে মনস্তাত্ত্বিক ও চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা স্পষ্ট হয়ে যায়। হেনরি জেমসের বিরুদ্ধে সমালোচকের প্রধান অভিযোগ, তিনি একক দৃষ্টিকোণ (single point of view) থেকে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মানসিক অবস্থা তুলে ধরেছেন এবং এ কাজটি করেছেন চরিত্রের বুদ্ধিমত্তার মধ্য দিয়ে। সেখানে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের মূল বিষয় চরিত্রের অসংগঠিত, প্রায় সংগঠিত, বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন চেতনালোক এবং সেই চেতনার প্রবহমানতা অনুপস্থিত। ফলে রবার্ট হামফ্রে মনে করেন, হেনরি জেমসের উপন্যাসকে মনস্তাত্ত্বিক হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। কিন্তু তাকে কখনো চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। লক্ষণীয়, সমালোচক প্রি-স্পিচ স্তর বলতে বুঝিয়েছেন চেতনার সেই স্তরটিকে যাতে প্রকাশ হতে চাওয়া ভাবনা-অনুভূতি-স্মৃতি প্রভৃতি সঞ্চিত হয়। এই স্তর থেকে ভাবনা-অনুভূতি-স্মৃতি প্রভৃতি চেতনমনে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে ভাষার মাধ্যমে বাইরের জগতে প্রকাশিত হয়।

চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের কেন্দ্রীয় বিষয় চরিত্র-চিত্রণ। এই চরিত্র গড়ে তোলা হয় তাদের মানসিক মানচিত্রের নিরিখে, বাইরের আচরণে নয়। চেতনাস্রোতের বাস্তবানুগ রূপ আঁকতে সাহিত্যিক চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-র দিকপাল স্রষ্টারা বিচিত্র ধরনের কলাকৌশল ব্যবহার করেছেন। কৌশলগুলো তারা কখনো নিয়েছেন প্রচলিত উপন্যাসের কৌশল থেকে, আবার কখনো সৃষ্টি করেছেন চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-র উপযোগী নতুন এক একটি কলাকৌশল। এক্ষেত্রে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-র প্রতিষ্ঠিত লেখকদের ব্যবহৃত কৌশলগুলো হলো[১৪]:

ক. অন্তঃসংলাপ (interior monologue)
খ. সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনা (omniscient description)
গ. স্বগতোক্তি (soliloquy)

ক. অন্তঃসংলাপ (interior monologue)

মানুষ কোনো কোনো সময় অনুচ্চস্বরে নিজের সঙ্গে কথা বলে। সে আপন মনে নিজ চেতনার অতলের ভাবনা-অনুভূতি প্রভৃতি নিয়ে নিজ মনে নিজের সাথে অনুচ্চারিত কথোপকথনে ব্যাপৃত হয়। তার এই অনুচ্চকথন যখন চলমান থাকে তখন কোনো শ্রোতা থাকে না বা সে অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বাক্য বিনিময় করে না। মানব চেতনার এ অবস্থাকে সাহিত্যে মূর্ত করার জন্য চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের শিল্পী অন্তঃসংলাপের প্রয়োগ করে থাকেন। এই অন্তঃসংলাপের মধ্য দিয়ে একটি চরিত্রের অন্তর্জীবন পাঠকের সামনে উন্মোচিত হয়। এই কৌশলটি চরিত্রের চেতনাস্রোতকে লেখকের কোন মন্তব্য বা ভাষ্য ছাড়াই সরাসরি পাঠকের কাছে উপস্থাপন করে। এতে লেখক সাহিত্যের পাতায় অনুপস্থিত বা প্রায়-অনুপস্থিত থাকেন। অন্তঃসংলাপের সার্থক ব্যবহার পাওয়া যায় জেমস জয়েসের *Ulysses* (১৯১৪-১৯২১), *Finnegan's Wake* (১৯৩৯) প্রভৃতি উপন্যাসে। এর মধ্যে *Ulysses* উপন্যাসের মলি ব্লুমের অন্তঃসংলাপটি বহুল আলোচিত। এটি বহুল আলোচিত, প্রধানত এর দৈর্ঘ্য, অসংগঠিত-অসংলগ্ন-পরিবর্তনশীল

প্রবহমান চেতনা এবং বিরামচিহ্ন প্রয়োগের বৈচিত্র্যের কারণে। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে দেখা যায় বিনিদ্র মলি ব্লুম নিজ বিছানায় শুয়ে আছে। পাশে স্বামী লিওপোল্ড ব্লুম নিদ্রামগ্ন। এ সময় লেখক মলি ব্লুমের চেতনালোক উন্মোচিত করেন এভাবে :

> Yes because he never did a thing like that before as ask to get his breakfast in bed with a couple of eggs since the CITY ARMS hotel when he used to be pretending to be laid up with a sick voice doing his highness to make himself interesting for that old faggot Mrs Riordan that he thought he had a great leg of and she never left us a farthing all for masses for herself and her soul greatest miser ever was actually afraid to lay out for her methylated spirit telling me all her ailments she had too much old chat in her about politics and earthquakes and the end of the world let us have a bit of fun first God help the world if all the women were her sort down on bathing suits and low necks of course nobody wanted her to wear them.[১৫]

কোনো রকম দিকনির্দেশনা না দিয়ে লেখক এখানে চরিত্রের চেতনাস্রোতকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। উপর্যুক্ত অংশে চরিত্রের অন্তঃসংলাপের মধ্যে লেখকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। এমনকি এ অন্তঃসংলাপটি যে মলি ব্লুম চরিত্রের সেটিও লেখক নির্দেশ করেননি। পাঠককে কোন পূর্ব ধারণা না দিয়ে পেনেলোপি (penelope) অধ্যায়ের একেবারে প্রথমে শুরু হয় অন্তঃসংলাপটি। আর শেষ হয় অধ্যায় তথা উপন্যাসের সমাপ্তিতে। অন্তঃসংলাপটি বর্ণিত হয়েছে উত্তম পুরুষে, যা অন্তঃসংলাপের একটি বিশিষ্টভঙ্গি। আলোচ্য অংশে দেখা যায়, মলি ব্লুমের চেতনায় অতীত ও বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসা-যাওয়া করেছে। যার প্রভাব পড়েছে জয়েসের বাক্য গঠনরীতির ওপর। আলোচ্য অংশটিতে ক্রিয়ার কালের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে সেখানে অতীত ও বর্তমান কালের সম্মিলিত প্রয়োগ করা হয়েছে। দীর্ঘ অন্তঃসংলাপটির আরো একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এতে কোনো বিরামচিহ্নের ব্যবহার নেই। ব্যক্তিচেতনা কখনো কখনো নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়। একটি চেতনার সূত্র ধরে আর একটি চেতনা এসে হাজির হয়। আলোচ্য অন্তঃসংলাপটিতে একটির পর একটি চেতনা এসেছে বিরামহীনভাবে। সংগত কারণে মলি ব্লুমের চেতনার বিরামহীনতা নির্দেশ করতে লেখক এই অন্তঃসংলাপটিতে বিরামচিহ্নের ব্যবহার করেননি। সূক্ষ্ম বিচারে ইন্টেরিয়র মনোলগ অন্তঃসংলাপকে (interior monologue) দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যেমন:

ক. প্রত্যক্ষ অন্তঃসংলাপ (direct interior monologue)
খ. পরোক্ষ অন্তঃসংলাপ (indirect interior monologue)

প্রত্যক্ষ অন্তঃসংলাপ ও পরোক্ষ অন্তঃসংলাপের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে রবার্ট হামফ্রে বলেছেন: "The basic difference between the two techniques is that indirect monologue gives to the reader a sense of the author's continuous presence; whereas direct monologue either completely or greatly excludes it."[১৬] প্রকৃতপক্ষে এই দুই ধরনের অন্তঃসংলাপের মধ্যে পার্থক্য মূলত দুটি। প্রথমত, প্রত্যক্ষ অন্তঃসংলাপে লেখক অনুপস্থিত থাকেন। আর পরোক্ষ অন্তঃসংলাপে লেখক তাঁর ভাষ্য ও মন্তব্য নিয়ে সর্বক্ষণ পাঠকের কাছে নিজ উপস্থিতি জানান দেন। এ শ্রেণির অন্তঃসংলাপে লেখক– সে ভাবছে; তার মনে হলো প্রভৃতি

মন্তব্য সংযোজন ও প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণের দ্বারা চরিত্রের চেতনালোকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন। কার্যত পরোক্ষ অন্তঃসংলাপে লেখক পাঠকের পথপ্রদর্শক (guide) হিসেবে কাজ করেন। দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ অন্তঃসংলাপের বর্ণনা উত্তম পুরুষে হয়ে থাকে। অপরপক্ষে পরোক্ষ অন্তঃসংলাপের বর্ণনা হয় মধ্যম কিংবা নাম পুরুষে। উল্লেখ্য, বাংলা কথাসাহিত্যে প্রধানত গোপাল হালদার (১৯০২–১৯৯৩) ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্(১৯২২-১৯৭১)-এর রচনায় উত্তম পুরুষে পরোক্ষ অন্তঃসংলাপের বর্ণনা দেখা যায়। তাঁদের এ প্রচেষ্টা চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের ধারায় উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বস্তুত তাঁদের রচনায় লেখক ও চরিত্রের চেতনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাওয়ায় এমনটি সম্ভব হয়েছে। উপরে যে উদাহরণটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা প্রত্যক্ষ অন্তঃসংলাপের শ্রেণিভুক্ত।

বাংলা কথাসাহিত্যে প্রত্যক্ষ অন্তঃসংলাপের প্রয়োগ লক্ষ করা যায় গোপাল হালদার, সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র রচনায়। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর *জাগরী* (১৯৪৫) উপন্যাসে এ ধরনের অন্তঃসংলাপের সফল প্রয়োগ করেছেন। ১৯৪২ সালের ভারত-ছাড় আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত *জাগরী*তে মূলত চারটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এক রাতের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কারাগারে বন্দি ফাঁসির আসামি স্বাধীনতা সংগ্রামী বিলুর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা এবং সে দুর্বিষহ মুহূর্তে তার চেতনায় প্রতিফলিত নানা ভাবনা, স্মৃতি, অনুভূতির যে সমাহার তাকে লেখক তুলে ধরেছেন। এই একই সময়ে তার বাবা-মা (যারা একই কারাগারে বন্দি রয়েছে) এবং জেল-গেটে অপেক্ষমাণ ছোট ভাই নিলুর চেতনাস্রোতকে লেখক পৃথক তিনটি পর্বে তুলে ধরেছেন। *জাগরী*র কাহিনি মূলত বিলু-নিলু এবং তাদের বাবা-মায়ের রাত্রি জাগরণের কাহিনি। বিলুর ফাঁসির আদেশ হয়েছে। রাত পোহালেই তার ফাঁসি হবে। সে জেলখানায় ফাঁসির সেলে মৃত্যুর প্রহর গুণছে। একই জেলে বন্দি রয়েছে বিলুর বাবা ও মা। তারা আসন্ন সন্তান-বিয়োগের দুশ্চিন্তায় কাতর। এ সময়ে বিলুর মায়ের উদ্বিগ্ন চেতনাস্রোতকে লেখক তুলে ধরেছেন প্রত্যক্ষ অন্তঃসংলাপের সাহায্যে। রাত প্রায় শেষ. ফাঁসির রায় কার্যকর করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট চলে এসেছে। এ সময়ে বিলুর মায়ের চেতনাকে লেখক রূপ দিয়েছেন এভাবে:

> খালি হাত পাখা টা থেকে একটা একটানা শব্দ হচ্ছে।...একটা গুবরে পোকা উড়ছে। শব্দ হচ্ছে ভোঁ-ও...। ঠক্ করে মাটিতে পড়ে গেল। আবার উড়ছে, আবার কিসে যেন ঠোকর খেয়ে পড়লো। এখনও ওড়েনি–এখনও না–এখনও না। এইবার যেই উড়বে, অমনি এক দুই তিন করে দশ গুনতে হবে। দশ গোনার আগেই যদি পড়ে যায়, তাহলে বিলু কিছুতেই বাঁচবে না। আর যদি পোকাটা পড়বার আগে দশ গুনে ফেলতে পারি, তাহলে ভগবান যেমন করে হোক বিলুকে বাঁচাবেনই বাঁচাবেন। খুব তাড়াতাড়ি গুনতে হবে; যত তাড়াতাড়ি পারি। ঐ উড়লো–এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত– ঐ যাঃ। পোকাটা পড়ে গেল। এ কী করলে ভগবান! যা'ও একটু আশা ছিল তাতেও তুমি বাদ সাধলে? যাঃ এসব মনগড়া খেয়ালের কিছু মাথামুণ্ডু আছে? নিজে ভাঙ্গি নিজেই গড়ি। পোকাটা সম্বন্ধে আমি যা ভেবেছিলাম তা কখনই ঠিক নয়। সবই ভগবানের হাত। সেই ভগবানকে আমি এতদিন কি হেনস্তাই করেছি। মা পূর্ণেশ্বরী আমার সব দোষ ত্রুটি ক্ষমা করো। তোমারই দয়াতে তো বিলুকে কোলে পেয়েছিলাম। তোমার নামেই তো বিলুর নাম রেখেছিলাম পূর্ণ! বাড়িসুদ্ধ সবাই তোমার মন্দিরের মহাপ্রসাদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বলেই কি তুমি আমার ওপর বিরূপ? বিলুর অসুখের সময় যে মানত করেছিলাম, সে পূজো পূর্ণেশ্বরীর ওখানে দিয়েছিলাম তো? মনে তো পড়ছে না। ভুলে গিয়েছিলাম নাকি? দেখেছো? দ্যাখ দেখি, একটা সামান্য ভুল থেকে কী কাণ্ড হল? মা পূর্ণেশ্বরী, কেন তুমি একথা আগে আমায় মনে পড়িয়ে দাও নি? না নিশ্চয়ই দেওয়া হয়েছিল। তবে কেন এমন হল?

> মা, তুমি তো জাগ্রত দেবী, বিলু তো একরকম তোমারই ছেলে, ওকে এবার বাঁচিয়ে দাও! আর আমি তোমার কাছে কোন দোষ করবো না। আর আমি গান্ধীজিকে তোমার চাইতে বড় মনে করবো না।...[১৭]

অন্তঃসংলাপটি আরো কিছুক্ষণ চলেছে। বিলুর মায়ের এই বিক্ষুব্ধ চেতনা ক্রমে এক্সাইটমেন্ট পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। যার ফলে সে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে। আলোচ্য অন্তঃসংলাপটির সঙ্গে মলি ব্লুমের অন্তঃসংলাপের তুলনা করলে গঠনগত সাদৃশ্য এবং উপাদানগত বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। দুটি অন্তঃসংলাপই বর্ণিত হয়েছে উত্তম পুরুষে এবং ক্রিয়ার কাল বর্তমান ও অতীত। দুটিতেই লেখক অনুপস্থিত এবং চরিত্রের চেতনা সরাসরি প্রায় অবিকৃতভাবে রূপায়িত হয়েছে। আলোচ্য অন্তঃসংলাপ দুটির মধ্যে উপাদানগত পার্থক্য হচ্ছে– মলি ব্লুমের অন্তঃসংলাপটি শুরু হয়েছে একান্ত নিভৃতে। ঘুমন্ত স্বামীর পাশে বিনিদ্র মলি ব্লুমের চেতনা এতে রূপায়িত হয়েছে। তার চেতনাস্রোত সেই সময় শান্ত-নিমগ্ন। অপর পক্ষে বিলুর মায়ের চেতনা আসন্ন সন্তান বিয়োগের বেদনায় বিক্ষুব্ধ-উত্তাল। চোখের সামনে সন্তান বিয়োগ এবং তা প্রতিকারে উপায়হীনতার বেদনায় লীন চেতনা। সংগত কারণে এখানে সতীনাথ ভাদুড়ীকে অনেক বেশি দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়েছে। উচ্চকিত চেতনায় মতিভ্রম বা হেলুসিনেশন (hallucination) সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়। *জাগরী*র উদ্ধৃত অংশে দেখা যায় বিলুর মার হেলুসিনেশনের (উড়ন্ত গুবরে পোকা দেখা) সার্থক রূপায়ণ। লক্ষণীয়, আলোচ্য অংশে লেখক চরিত্রের অন্তর্লোকের পাশাপাশি তার বহির্জগতের (খালি হাত পাখাটা থেকে একটা একটানা শব্দ হচ্ছে) রূপায়ণে মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। সার্বিক বিবেচনায় উদ্ধৃত অংশটি বাংলা কথাসাহিত্য থেকে নেয়া সফল প্রত্যক্ষ অন্তঃসংলাপ প্রয়োগের একটি যথার্থ উদাহরণ। বিশ্বসাহিত্যে চরিত্রের চেতনাস্রোত রূপায়ণে প্রত্যক্ষ অন্তঃসংলাপ ও পরোক্ষ অন্তঃসংলাপকে মিলিতভাবে ব্যবহার করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ভার্জিনিয়া উলফ ও ডরোথি রিচার্ডসন তাঁদের উপন্যাসে একটি চেতনাস্রোত রূপায়ণে দুই শ্রেণির অন্তঃসংলাপের সফল প্রয়োগ করেছেন। এমন প্রচেষ্টা বাংলা কথাসাহিত্যেও দুর্লক্ষ নয়।

পরোক্ষ অন্তঃসংলাপ সাধারণত স্ট্রিম অব কনশাসনেসের অন্য কৌশল বিশেষত সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনার সঙ্গে যৌথভাবে প্রয়োগ করা হয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য, ভার্জিনিয়া উলফের *Mrs Dalloway* (1925), *To the Light House* (1927) উপন্যাস দুটিতে পরোক্ষ অন্তঃসংলাপ ও সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনার যৌথ প্রয়োগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু এককভাবে পরোক্ষ অন্তঃসংলাপ প্রয়োগের সার্থক ও সুন্দর দৃষ্টান্তের জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে জেমস জয়েসের কাছে। *Ulysses* উপন্যাসের নওসিকা (nausicaa) অধ্যায়ে লেখক গের্টি ম্যাকডওয়েল চরিত্রের চেতনাকে রূপায়ণ করেছেন এই কৌশলটির সাহায্যে। উপন্যাসের এ ভাগটি লেখক গের্টি ম্যাকডওয়েলের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। সে সমুদ্রের তীরে একটি পাথরের ওপর বসে আছে। নিচে সমুদ্র সৈকতে তার বন্ধুরা খেলায় মত্ত। কিছু দূরে একটি সেতুর ওপর লিওপোল্ড ব্লুম দাঁড়িয়ে গের্টি ম্যাকডওয়েলকে লক্ষ করছে। এ সময় ধীরে ধীরে অন্তঃসংলাপটি উন্মুক্ত হয় :

> Canon O'Hanlon handed the thurible back to Father Conroy and knelt down looking up at the Blessed Sacrament and the choir began to sing the TANTUM ERGO and she just swung her foot in and out in time as the music rose and fell to the TANTUMER GOSA CRAMEN TUM. Three and eleven she paid for those stockings in Sparrow's of George's street on the Tuesday, no the Monday before Easter and there wasn't a brack

> on them and that was what he was looking at, transparent, and not at her insignificant ones that had neither shape nor form (the cheek of her!) because he had eyes in his head to see the difference for himself.[১৮]

উপরের অংশটি ভালোভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এতে লেখক গের্টি ম্যাকডওয়েল ও পাঠকের মাঝে মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ স্থাপনের জন্য উপস্থিত রয়েছেন। তিনি কল্পনাপ্রবণ গের্টি চরিত্রের চেতনাস্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন তার ছোট ছোট মন্তব্য দিয়ে যেমন: he [leopold, her friend, the cheek of her!]। তাছাড়া এই অন্তঃসংলাপটিতে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, এর বর্ণনারীতিটা (Three and eleven she paid for those stockings in Sparrow's of George's street on the Tuesday) উপন্যাসের প্রথাগত বর্ণনারীতির খুব কাছাকাছি। অন্তঃসংলাপটি বর্ণনা করা হয়েছে নাম পুরুষে, যা পরোক্ষ অন্তঃসংলাপের একটি বিশিষ্টভঙ্গি। বাংলা কথাসাহিত্যে পরোক্ষ অন্তঃসংলাপের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করা যায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনায়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) উপন্যাসে এ কৌশলের সুন্দর প্রয়োগ দেখা যায়। মুহাম্মদ মুস্তফার ছোট ফুপু বিধবা এবং তাদের বাড়িতে আশ্রিত। তার একটি ছয় বছর বয়সের মেয়ে আছে, যার নাম খোদেজা। মুহাম্মদ মুস্তফার পিতা খেদমতুল্লাহ্‌ খোদেজার সঙ্গে মুহাম্মদ মুস্তফার বিয়ে দেবে বলে তার বিধবা বোনকে প্রতিশ্রুতি দেয়। খেদমতুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর প্রায় সবাই সে প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায়। পরবর্তীকালে মুহাম্মদ মুস্তফা অন্যত্র বিয়ে করতে যাচ্ছে জানিয়ে বাড়িতে চিঠি লেখে। যেদিন চিঠিটি বাড়িতে পৌঁছায় সেদিন খোদেজা পানিতে ডুবে মারা যায়। সে খবর মুহাম্মদ মুস্তফার কাছে পৌঁছালে সে খোদেজার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করতে থাকে। এ সময় মুহাম্মদ মুস্তফা চরিত্রের যে বিক্ষুব্ধ চেতনাস্রোত তা লেখক চিত্রায়িত করেছেন পরোক্ষ অন্তঃসংলাপের সাহায্যে। নিচে দৃষ্টান্ত দেয়া হলো:

> দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পর সহসা মুহাম্মদ মুস্তফার মনে ঈষৎ ক্রোধভাবের সঞ্চার হয়। আপন মনে সে বলে, রূপকথার জন্যে সদা ক্ষুধিত মানুষেরা হঠাৎ একটি রূপকথা সৃষ্টি করে ফেলে তার নেশায় এমন নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে সত্যাসত্য ন্যায়-অন্যায় বিচারজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, এ-কথা বুঝতে পারছে না যে তারা তাকেই খোদেজার মৃত্যুর জন্যে দায়ী করছে। ক্রোধউষ্ণ মনে এ-সবের মধ্যে সে গূঢ় অভিসন্ধিও খুঁজে পায়। একবার মনে হয়, সে যে তাদের পশ্চাতে ফেলে দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে এ কথা তার মঙ্গল কামনা করলেও তারা গ্রহণ করতে পারছে না বলে একটি বিকৃত উপায়ে তার কাছে তাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছে, এবং এত শ্রম-সাধনার সাহায্যে যে-জীবনের দেহলিতে সে এসে পৌঁছেছে সে-দেহলি যদি তার ফলে ছায়াচ্ছন্ন হয় তাতেও তাদের আপত্তি নেই। আরেকবার মনে হয়, সে যে পিতৃদত্ত প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা করেনি সে-কথা জোর গলায় বলবার সাহস না পেলেও সে-জন্যই তারা শাস্তি দিতে উদ্যত। অন্য ধরনের কথাও মনে জাগে। তার মনে হয়, এই কাহিনীতে তার অংশ নিতান্ত নগণ্য, সে একটি উছিলামাত্র। মৃত মেয়েটিই কাহিনীটির উদ্দেশ্য, সেই তাদের লক্ষ্যস্থল, এবং একটি ঘোরালো উপায়ে মৃত মেয়েটিকে জীবিত করার চেষ্টা করছে তারা, মৃত্যুর পর একটি অতিশয় স্নেহশীল দরদী আত্মা সৃষ্টি করার প্রয়াস পাচ্ছে। স্নেহান্ধ লোকেরা কেবল এ-কথা বুঝতে পারছে না যে মেয়েটিকে সৃষ্টি করতে গিয়ে তাকেই ধ্বংস করছে।[১৯]

মুহাম্মদ মুস্তফা যে এখানে আপন মনে অনুচ্চস্বরে কথা বলেছে তা স্পষ্ট। অনুচ্ছেদের একেবারে প্রথমে লেখক আমাদের জানাচ্ছেন– আপন মনে সে বলে, অর্থাৎ মুহাম্মদ মুস্তফা বলে। এ অংশে লক্ষ করা যায় লেখক চরিত্রের চেতনা কোন দিকে যাচ্ছে তা পাঠককে সব সময় নির্দেশ করছেন।

ক্রোধউষ্ণ মনে সে-সবের মধ্যে সে গূঢ় অভিসন্ধিও খুঁজে পায়; আরেকবার মনে হয়; অন্যধরনের কথাও মনে জাগে– প্রভৃতি বাক্যগুলো তার সাক্ষ্য বহন করে। গের্টি ম্যাকডওয়েল চরিত্রের মতো লেখক এখানে মুহাম্মদ মুস্তফাকে 'সে' সর্বনামের দ্বারা নির্দেশ করেছেন। তাছাড়া অংশটি বর্ণিত হয়েছে নাম পুরুষে, যা পরোক্ষ অন্তঃসংলাপের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, ভার্জিনিয়া উলফের রচনায় দুই ধরনের অন্তঃসংলাপের মিলিত প্রয়োগের মাধ্যমে চেতনাস্রোত রূপায়ণের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। তাঁর *To the Light House* ও *The Waves* (১৯৩১) উপন্যাসে তিনি এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। বাংলা ভাষায় এ ধরনের প্রয়োগ লক্ষ করা যায় গোপাল হালদারের রচনায়। তাঁর *একদা* (১৯৩৯) উপন্যাসে বুদ্ধিজীবী তরুণ অমিতের প্রবল জীবন-জিজ্ঞাসা ও বিক্ষুব্ধ মানসিক অবস্থা রূপায়ণে লেখক ভার্জিনিয়া উলফ প্রযুক্ত এ কৌশলটির প্রয়োগ করেছেন। কমিউনিস্টকর্মী দীনুর সঙ্গে পার্টি অপিস থেকে বের হয়ে অমিত বাসে ওঠে। তাদের গন্তব্য কলেজ স্ট্রিট। অমিত ও দীনু দুই জনেরই টাকার প্রয়োজন। তাই টাকা জোগাড়ের জন্য তারা বের হয়েছে। পথে কথা প্রসঙ্গে বের হয়ে আসে বিপ্লবী হবার পথে দীনুর পরিবারের পক্ষ থেকে আসা বাধার ব্যাপারটি। দীনুর বিপ্লবী হওয়াতে ব্যথিত-মর্মাহত-উদ্বিগ্ন দীনুর পরিবার চায় সে সংসারী হোক। দীনুর এসব কথা অমিতের অবচেতন মনে চলা সংঘাতকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। এ সময় অমিতের অন্তঃসংলাপটি শুরু হয় :

> সংসারই দেয় তৃপ্তি। অমিত, ভাবিল, যেমন শৈলেন পাইয়াছে তৃপ্তি। এখন আর নবম শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের কথা তাহার মনেই জাগে না। যদি মনে জাগিত, তাহা হইল শৈলেনের মাথায় সে তাড়না চাপিয়া বসিত, তাহার দেহ এমন পুষ্ট হইতে পারিত না, মন এমন স্থির রূঢ় হইতে পারিত না। সংসার শৈলেনকে তৃপ্তি দিয়াছে, একমাত্র সাংসারই মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে। আইডিয়াল দেয় ক্রাউন অব থরনস্ ...সত্যই সংসার তৃপ্তি দিতে পারে কি? ইন্দ্রাণীকে, সুধীরাকে দিয়াছে তৃপ্তি? সাতকড়িকে, শৈলেনকে দিয়াছে কি? দুই-এক নিমিষে তাহার সে মায়া ভাঙ্গিয়া পড়ে না? সংসার তোমাকে তৃপ্তি দিতে পারিত কি অমিত? তুমি পারিতে সকালে কাগজ পড়িয়া, চা টোস্ট খাইয়া, নীরোগ দেহ আরামে দুলাইয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে কলেজে যাইতে? অধ্যাপক সহযোগীদের সঙ্গে চোঁয়া ঢেকুর তুলিয়া নতুন কপি ও গলদা-চিংড়ির দর লইয়া গবেষণা করিতে? বাড়িতে ফিরিয়া টিফিন, শেষ সন্ধ্যায় হয় টিউশনি না হয় কালচারিস্ট মহলে আড্ডা দিয়া রাত্রির আহারে বসিতে? তারপর বড় জাজিম-পাতা নরম বিছানায় গৃহিণীর আলিঙ্গন-পাশ-বদ্ধ হইয়া শুনিতে 'হ্যাঁগা, 'সেই লাল রঙের বেনারসী খোঁজ করেছিলে?' পারিতে তুমি অমিত? এই পরম তৃপ্তিকর নির্ঝঞ্ঝাট কাল্‌চার্ড সাংসারিক জীবনে তৃপ্তি পাইতে? ভাবিয়া দেখ অমিত, কি চমৎকার প্রস্পেকট...
>
> একটা গুমোট দিনের অন্ধকার,– পৃথিবী হাঁপ ধরিয়াছে, রাত্রির মুখও ছাইরঙের মেঘে ঢাকা, ইহাই সংসার। Inferno! অমিতই খেলাচ্ছলে বন্ধুকে লিখিয়াছে– All hopes abandon ye who enter here.
>
> দান্তের ইনফার্নো অমিতের মনে পড়িল।– না, সংসার তেমনতর বড় নরকুণ্ডও নয়। এ একটা পেইনলেস্ স্লটার। উহার কবলে মানুষ আপন সত্তাকেও হারাইয়া ফেলে। ইহার ভিতরে এক জারক রস আছে, যেন সেই জিঘাংসু বৃক্ষপত্র কীটপতঙ্গ যাহা হাত বাড়াইয়া টানিয়া লয়, আপনার বক্ষতলে চাপিয়া ধরে। সংসারও তেমনই– মানুষ যেন দমে সিদ্ধ হইতেছে।
>
> অমিতের মনে পড়িল— সুনীলের প্রসন্ন হাস্য। সংসার ছাড়া উহাদের হাসি, চোখে অতৃপ্তির জ্বালা; কিন্তু সাংসারিকের জীবনের নিস্প্রভতা নাই। মনে যেন উহাদের একটা কি রঙ ধরিয়াছে! প্রেমে পড়িলে মানুষের জীবনে যে অতৃপ্তি আসে, যে রঙিনতা আসে, আইডিয়ালের আলিঙ্গনে তেমনই অতৃপ্তি, তেমনই নেশা, তাই না অমিত? একদিন তুমিও ইহার স্বাদ পাইয়াছ। আজ? সুনীলদের দেখিলে তোমার তাহাই মনে হয় না? অতৃপ্তি! কিন্তু, কি তাহার নেশা। না হইলে তুমিই বা ঘুরিয়া মরিতেছ কোন আনন্দে?[২০]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে এখানে দুই ধরনের অন্তঃসংলাপের মিশ্রিত প্রয়োগ করা হয়েছে। উদ্ধৃতাংশের প্রথমভাগে লেখক অমিতের চেতনাস্রোতের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অন্তঃসংলাপটি যে অমিতের তা লেখক মন্তব্য (অমিত ভাবিল) দিয়ে নির্দেশ করেছেন। লেখকের স্পষ্ট উপস্থিতির ফলে প্রথমভাগটিকে পরোক্ষ অন্তঃসংলাপ পদ্ধতিতে রচিত বলা যায়। দ্বিতীয় ভাগে অমিত অনুচ্চস্বরে নিজের সাথে কথা বলেছে (সত্যই সংসার তৃপ্তি দিতে পারে কি? ইন্দ্রাণীকে, সুধীরাকে দিয়াছে তৃপ্তি? সাতকড়িকে, শৈলেনকে দিয়াছে কি?) সেখানে লেখক সরাসরি অমিতের চেতনাকে তুলে ধরেছেন। উত্তম পুরুষে বর্ণিত এ অংশে লেখক সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। তিনি পাঠককে কোনো রকম নির্দেশনা না দিয়ে অমিতের চেতনাস্রোত উপস্থাপন করেছেন। সংগত কারণে দ্বিতীয় ভাগের অন্তঃসংলাপটিকে প্রত্যক্ষ অন্তঃসংলাপের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। অমিতের ভাবনা কিছুটা অগ্রসর হলে লেখক আবার পরোক্ষ অন্তঃসংলাপের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন মন্তব্য (অমিতই খেলাচ্ছলে বন্ধুকে লিখিয়াছে; অমিতের মনে পড়িল; দান্তের ইনফার্নো অমিতের মনে পড়িল) অমিতের চেতনা পাঠকের কাছে উন্মুক্ত করে দেয়। এর ফলে পাঠক সহজে সে চেতনাস্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। উপর্যুক্ত অংশে আমরা লক্ষ করি একটি বিশেষ মুহূর্তের চেতনা রূপায়ণে দুটি ভিন্ন কৌশলের মিলিত প্রয়োগ। এ প্রয়োগের ফলে চেতনার নিরবচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত রূপ বিকৃত হয়নি, বরং বাস্তবানুগ হয়েছে। মনোযোগী পাঠক অবশ্যই তা লক্ষ করে থাকবেন।

প্রত্যক্ষ অন্তঃসংলাপের সাহায্যে স্বপ্নচেতনা (dream consciousness) বা অচেতন মনের রূপায়ণ সাহিত্যিক চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-র একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু এর সার্থক প্রয়োগ খুব কমই দেখা যায়। জেমস জয়েস *Finnegan's Wake* উপন্যাসে স্বপ্নচেতনা বা অবচেতন মনের রূপায়ণে মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি নির্ভর করেছেন মূলত সিগমুন্ড ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্বের ওপর। উল্লেখ্য, চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যে এই একটিমাত্র প্রসঙ্গে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের তত্ত্বের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সিগমুন্ড ফ্রয়েড স্বপ্নকে দেখেছেন "নিদ্রা এবং জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থা হিসেবে।"[২১] তিনি স্বপ্ন সৃষ্টির যে সমস্ত কারণ নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো বহিরুদ্দীপকের প্রভাব। বাংলা কথাসাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাস এবং *নয়নচারা* (১৯৪৫) গল্পগ্রন্থের 'নয়নচারা' ও 'মৃত্যুযাত্রা' ছোটগল্পে তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনা রূপায়িত হয়েছে। এছাড়া স্বপ্নচেতনা বা অচেতন মনের রূপদানের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় গোপাল হালদারের রচনায়। তবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও গোপাল হালদার উভয়ই তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনা বা স্বপ্নচেতনা রূপায়ণে প্রত্যক্ষ অন্তঃসংলাপের ব্যবহার করেননি। তারা এক্ষেত্রে নির্ভর করেছেন মূলত পরোক্ষ অন্তঃসংলাপের ওপর। গোপাল হালদার তাঁর প্রথম উপন্যাস *একদার* শেষ অংশে অমিতের স্বপ্নচেতনাকে পরোক্ষ অন্তঃসংলাপের সাহায্যে সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। *একদায়* দেখা যায় সুনীলের জন্য থাকার জায়গা ঠিক করে অমিত বাড়ি ফেরে মধ্যরাতে। বাড়ি এসে শুনতে পায় ইন্দ্রাণী চিঠি রেখে গেছে। অমিত চিঠি পড়ে জানতে পারে তাকে সেই রাতেই ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। কিন্তু বাড়ির আপত্তির কারণে অমিত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারে না। সে ঘুমোতে যায় এবং এক সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। লেখক অমিতের এই স্বপ্নচেতনা বা তন্দ্রাচ্ছন্নতাকে তুলে ধরেছেন এভাবে:

অনন্তকাল এমনই ডাক চলিতেছে। যুগান্তের অন্তরশ্মি মাথায় লইয়া আমরা আসিয়াছি– নিজেদের ডালি দিয়া না গেলে আমাদের মুক্তি নাই– নিমিষের বিদ্যুতালোকে আমরা জ্বলিয়া উঠিব...– অনন্তকালের জন্য জ্বলিতে থাকিব–বার্নিং বুশ...।
আমাদের দান--- আত্মদান---ইনটেন্স্ লিভিং।
চোখ অমিতের বুঝিয়া আসিয়াছে, মনে মনে সে কহিতেছে বার্নিং বুশ, বার্নিং বুশ...
সুনীল। সুনীল---দীনু---যুগল---মোতাহের...
These laid the world away; poured out the red
Sweet wine of youth; gave up the years to be
of work and joy and that un-hoped or serene
That men call age; and those who would have been
Their sons, they gave their immortality.
অমিত জিহ্বাতে স্বাদ লইতে লইতে নীরবে আওড়াইল-
'The red sweet wine of youth'
মণীশ---সুনীল---যুগল---দীনু---মোতাহের...
তারপর—
ইন্দ্রাণী---বুলু---সুধীরা---সবিতা---সুরো---
Sufferance is the badge of this tribe-
চিরদিনের মায়ের জাতের ওই পরিচয়---
For you, you too, to battle go,
Not with marching drums and cheers,
But in the Watch of solitude,
And through the boundless night of fears,
Your infinite passion is out poured.
আহত প্রাণের সহস্র ফাটল দিয়া ঝরিয়া পড়ে, সেই বেদনা...আহত মৌন সেই প্রাণগুলি।...মা।
আজও মুখ বুজিয়া মৌন রহিয়াছেন---মুখ বুজিয়াই তিনি আঘাত সহেন।
না, মা বড় জঞ্জাল! মরেও না![২২]

আলোচ্য অন্তঃসংলাপটিকে পরোক্ষ অন্তঃসংলাপ বলার কারণ এতে লেখকের উপস্থিতি স্পষ্ট। চোখ অমিতের বুজিয়া আসিয়াছে; মনে মনে সে কহিতেছে; অমিত জিহ্বাতে স্বাদ লইতে লইতে নীরবে আওড়াইল– প্রভৃতি বাক্য প্রমাণ করে লেখক এখানে অমিতের চেতনার ভাষ্যকার। তাছাড়া এটি বর্ণনা করা হয়েছে নাম পুরুষে যা পরোক্ষ অন্তঃসংলাপের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি। সিগমুন্ড ফ্রয়েড দেখিয়েছেন, মানুষের অবচেতন ও অচেতন মনে অবদমিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা এবং চেতনমনের কর্মপ্রক্রিয়া তার স্বপ্নে প্রতিফলিত হয়। *একদা* উপন্যাসের শুরু থেকেই দেখা যায়, অমিত পারিবারিক পরিমণ্ডল ও মননচর্চা এবং সময়ের দাবি ও স্বদেশের প্রয়োজনীয়তা এই দুই বিন্দুর মধ্যে দোদুল্যমান। বাবা-মা, ব্রজেন্দ্রবাবু, অপূর্ব, সুহৃদয়, সুরোদের অনুযোগে তার চেতনমন কখনো নিরাপদ জীবিকা গ্রহণ কিংবা মননচর্চায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখার কথা ভাবেনি। কিন্তু তার অবচেতনে চলেছে এ নিয়ে নিরন্তর সংঘাত। পুরো দিন ধরে চলা এ সংঘাত দেখা যায় অমিতের স্বপ্নচেতনার মধ্যে। অবচেতন মনে চলা এ সংঘাতের পাশাপাশি অমিতের স্বপ্ন চেতনায় লক্ষ করা যায় তার সারাদিনের কর্মপ্রক্রিয়ার ছাপ। সবকিছু মিলিয়ে আলোচ্য অংশটি অনন্য।

খ. সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনা (omniscient description)

অন্তঃসংলাপের পর সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনা নামক কৌশলের প্রয়োগ চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যে সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। এই রীতিতে সর্বজ্ঞ (omniscient) লেখক চরিত্রের চেতনালোকের রহস্য উন্মোচন করেন প্রচলিত বর্ণনারীতির মাধ্যমে। প্রচলিত বর্ণনারীতি বলতে আমরা নির্দেশ করছি গল্প-উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকে চলে আসা সেই বর্ণনারীতিকে, যাতে লেখক তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনি বর্ণনা করেন। যে বর্ণনারীতিতে লেখক চরিত্রের অন্তর্লোক ও বহির্লোক সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত। যে বর্ণনারীতিতে লেখক বিভিন্ন মন্তব্য ও বিশ্লেষণ এবং নিজ জীবনদর্শন নিয়ে সবসময় হাজির– সে বর্ণনারীতিকে। প্রচলিত এই বর্ণনারীতির মাধ্যমে চরিত্রের চেতনার বিভিন্ন মাত্রা (dimension) কৃতিত্বের সঙ্গে ডরোথি রিচার্ডসন তাঁর *Pilgrimage* উপন্যাসে মূর্ত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মরিয়াম হেন্ডারসনের চেতনাস্রোতকে গঠন-কাঠামোসহ তুলে এনেছেন। শুধু তাই নয়, চেতনাস্রোতের টেক্সচার (texture) তুলে আনতে তিনি শব্দের বানান ও বিরামচিহ্নের অপ্রচলিত-বিচিত্র ব্যবহার করেছেন। দুটি চেতনার মধ্যে ফাঁকা স্থান নির্দেশের জন্য শব্দগুলোর মধ্যে অস্বাভাবিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে ফাঁকা স্থান (space) দিয়েছেন। পাশাপাশি অসম্পূর্ণ-অপ্রত্যাশিত খণ্ড খণ্ড বাক্যের প্রয়োগ করেছেন। আলোচ্য অংশে দেখা যায়, মরিয়াম হেন্ডারসন চার্চে প্রার্থনা করার জন্য গিয়েছে। সেখানে গিয়ে সে আধ্যাত্মিক-জীবন ও ধর্ম নিয়ে ভাবছে :

> Then nothing matters. Just one little short life . . . .
> "A few more years shall roll . . .
> A few more seasons pass. . . ."
>
> There was a better one than that . . . not so organ-grindery.
>
> "Swift to its close ebbs out life's little day;
> Earth's joys grow dim, its glories fade away;
> Change and decay in all around I see."
>
> Wow-wow-wow-whiney-caterwauley. . . .
>
> Mr. Brough quoted Milton in a sermon and said he was a materialist. . .
> . Pater said it was a bold thing to say. . . . Mr. Brough was a
> clear-headed man. She couldn't imagine how he stayed in the Church. . .
> . She hoped he hated that sickening, sickening, idiot humbug, Eve . . .
> meek . . . with silly long hair . . . "divinely smiling" . . . Impudent bombastic
> creature . . .
> a sort of man who would call his wife "my dear." There was a hymn that
> even Pater liked . . . the tune was like a garden in the autumn. . . .
>
> O . . . Strengthen _Stay_--up-- . . . Holding--all
> Cre--ay--ay--tion. . . . Who . . . ever Dost Thy . . . self--un . . .
> Moved--a--Bide. . . . Thyself unmoved abide . . . Thyself unmoved abide
> . . . Unmoved abide . . . [২৩]

এটি একটি সার্থক সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনার উদাহরণ। এখানে মরিয়াম হেন্ডারসনকে নির্দেশ করা হয়েছে She সর্বনামের দ্বারা এবং বর্ণনায় ক্রিয়ার কাল অতীত কাল। এ অংশটিতে লেখকের উপস্থিতি সত্ত্বেও পাঠক সরাসরি চরিত্রের চেতনাস্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। উদ্ধৃত অংশটি তার বৈচিত্র্যপূর্ণ বিরামচিহ্ন, শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য-গঠনের জন্য অনেকের কাছে প্রচলিত বর্ণনারীতি হিসেবে পরিগণিত নাও হতে পারে। বর্ণনার কিছু অংশ (Brough quoted Milton in a sermon and said he was a materialist'... Mr. Brough was a clear-headed man. She couldn't imagine how he stayed in the Church…) একটু নিবিড়ভাবে নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে এটি প্রথাগত বর্ণনারীতিই। তবে প্রথাগত বর্ণনারীতির সঙ্গে এর পার্থক্য উপাদানগত। সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনার প্রয়োগ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসে খুব সফলভাবে করেছেন। ডরোথি রিচার্ডসন যেমন তাঁর *Pilgrimage* উপন্যাসে সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনার বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রয়োগ করে মরিয়াম হেন্ডারসনের চেতনাকে মূর্ত করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসে সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনার তেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার করেননি। তিনি অন্যান্য কৌশলের সঙ্গে বিশেষত পরোক্ষ অন্তঃসংলাপের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনার প্রয়োগ করেছেন। *কাঁদো নদী কাঁদো* ও *Pilgrimage* উপন্যাসে সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনা প্রয়োগের যে পার্থক্য তা উপন্যাস দুটির গঠন-কাঠামোগত। দুটি উপন্যাসের কাহিনির কাঠামো এক ধরনের নয়। *Pilgrimage* উপন্যাসের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে মরিয়াম হেন্ডারসনের দৃষ্টিকোণ থেকে। আর *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসে দেখা যায়, কাহিনি বর্ণিত হচ্ছে উপন্যাসের কথক আর তবারক ভুইঞা এই দুটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে। উপন্যাসের শুরু হয়েছে চলন্ত স্টিমারের যাত্রীদের বর্ণনা দিয়ে। যাত্রীদের বর্ণনার পর লেখক বর্ণনা করেছেন স্টিমারের পরিবেশ। এসব কিছু বর্ণনা করা হয়েছে উপন্যাসের কথক (যে তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে। বর্ণনা কিছুটা অগ্রসর হলে লেখক কথকের তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনাকে রূপ দেবার জন্য সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনা প্রয়োগ করেছেন:

> তারপর হয়তো কিছুক্ষণ তার কথা শুনিনি, হয়তো সে নীরব হয়ে পড়েছিলো। তবে নিশ্চয় বেশিক্ষণের জন্য নয়। এবার তার কণ্ঠস্বর আমার অর্ধঘুমন্ত কানে এসে পৌছালে তা গুঞ্জনের মত শোনায়, যে-গুঞ্জনে ঈষৎ রহস্যের ভাব, একটু গাম্ভীর্যের আভাস। মনে হয় সে যেন জিজ্ঞাসা করছে কোথা থেকে মানুষ আসে, কোথায় সে ফিরে যায়। শ্রোতাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই না, পরে দূরে কোথাও একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর কান্নার আওয়াজ জেগে উঠলে তাতে লোকটির গলার শব্দ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ততক্ষণে দিগন্তে হেলেপড়া সূর্যের ওপর মেঘ উঠেছে, কিছু শীতল হাওয়াও বইতে শুরু করেছে, এবং মুখে-চোখে সে-শীতল হাওয়া এসে লাগলে তন্দ্রার ভাবটা বেশ জমে উঠে থাকবে। হাওয়া দেখতে-না-দেখতে প্রবল হয়ে ওঠে এবং আঘাতে ছাদের প্রান্তে গুটানো তেরপালের ঝুলে-পড়া একটি অংশ সশব্দে দুলতে থাকে। কখনো সে শব্দ, কখনো লোকটির ধীর-মন্থর কণ্ঠস্বর ঢেউ এর মত কানে এসে বাজে। তবে আবার তার কণ্ঠস্বর কানে এসে পৌঁছালে বিস্মিত হই, কারণ ছালাম মিঞা নামক জোতদারটির সঙ্গে দর্শনমূলক বিষয়টির যোগসূত্র ঠিক বুঝতে পারি না। যে-টুকু বুঝতে সক্ষম হই তা এই যে, জোতদারটি বড় উদ্যোগ-আয়োজন করে বহুদিনের বাসনা চরিতার্থ করতে গিয়েছিল মক্কাদেশে কিন্তু কোন কারণে কাবাশরীফে পৌছে আচম্বিতে অন্ধ হয়ে পড়ে। কেন? সে কী ঘোর গুনাহ্গারি যে-গুনাহ্র মাফ নেই? শীঘ্র একটা কান্না শুনতে পাই। কান্না নয়, আর্তনাদ। হয়তো জোতদারটিই আর্তনাদ করে। হঠাৎ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়া মানুষটির অন্তরে যে-প্রগাঢ় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে দিশেহারাভাবে সে হয়তো পথ সন্ধান করছে, একটু আলো খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোথাও পথ বা আলো দেখতে পাচ্ছে না। জোতদার আর্তনাদ করে চলে, যে-আর্তনাদ অতল কোন গহ্বর থেকে উঠে এসে অন্ধকারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে; অন্ধকার অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।[২৪]

আলোচ্য অংশটিতে দেখা যাবে লেখক এখানে কথক চরিত্রের তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনার একটি ধারাবিবরণী পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এটিকে ধারাবিবরণী বলার কারণ– লেখক এখানে কথকের চেতনার প্রতিটি পরিবর্তন, ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি ও স্মৃতির রূপান্তর সম্পর্কে পাঠককে তার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবহিত করেছেন। আলোচ্য অংশটুকু পরীক্ষা করলে আরো দেখা যাবে লেখক কথকের চেতনার মধ্যে সব সময় উপস্থিত থেকে পাঠককে চেতনার চোরাগলিতে পথ চলতে সাহায্যে করেছেন। অর্থাৎ লেখক এখানে সর্বজ্ঞ। তিনি চরিত্রের অন্তর্লোক ও বহির্জগতের সম্পূর্ণ খবর রাখেন। এ খবর তিনি যে পদ্ধতি পাঠককে দিয়েছেন তা কথাসাহিত্যের বহুল প্রচলিত বর্ণনা পদ্ধতি। প্রচলিত বর্ণনা পদ্ধতির সঙ্গে আলোচ্য অংশটির যে পার্থক্য তা উপাদানগত, গঠনগত নয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এখানে রূপদান করেছেন চেতনার প্রবহমানতাকে। আর সাধারণ কথাসাহিত্যে একই পদ্ধতিতে রূপদান করা হয় চরিত্রের আত্মিক অনুভব কিংবা বহিঃক্রিয়া ।

সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনা ও অন্তঃসংলাপের সমন্বিত প্রয়োগ লক্ষ করা যায় জেমস জয়েস, ডরোথি রিচার্ডসন, ভার্জিনিয়া উলফ প্রমুখ কথাসাহিত্যিকের রচনায়। তবে এই সমন্বিত প্রয়োগ প্রথম করেন ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড (১৮৭৩-১৯৩৯) তাঁর *Parade's End* (১৯২৪-১৯২৮) উপন্যাসে। সমালোচক তাঁর এ প্রয়োগ সম্পর্কে বলেছেন: "Here is an inventive and dazzling example of a mixed style of stream of consciousness writing, from Ford Madox. Ford's Parade's End, one of the great innovative, experimental novels of the modernist period."[২৫] ফোর্ড ম্যাডক্স তাঁর *Parade's End* উপন্যাসে যে কৌশলের প্রথম প্রয়োগ করেছেন তার সার্থক রূপ দেখা যায় ভার্জিনিয়া উলফের *The Waves* উপন্যাসে। ভার্জিনিয়া উলফ তাঁর এই বর্ণনারীতি প্রসঙ্গে 'Modern Fiction' প্রবন্ধে বলেছেন: "Let us record the atoms as they fall upon the mind in the order in which they fall, let us trace the pattern, however disconnected and incoherent in appearances, which each sight or incident scores upon the consciousness."[২৬] ভার্জিনিয়া উলফের উক্তি থেকে তাঁর বর্ণনারীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর মন্তব্যের যথার্থতা *Mrs Dalloway* উপন্যাসে একেবারে শুরুর অংশটি পরীক্ষা করলে উপলব্ধি করা যায়:

> MRS. DALLOWAY said she would buy the flowers herself. For Lucy had her work cut out for her. The doors would be taken off their hinges; Rumpelmayer's men were coming. And then, thought Clarissa Dalloway, what a morning—fresh as if issued to children on a beach.
>
> What a lark! What a plunge! For so it had always seemed to her, when, with a little squeak of the hinges, which she could hear now, she had burst open the French windows and plunged at Bourton into the open air. How fresh, how calm, stiller than this of course, the air was in the early morning; like the flap of a wave; the kiss of a wave; chill and sharp and yet (for a girl of eighteen as she then was) solemn, feeling as she did, standing there at the open window, that something awful was about to happen; looking at the flowers, at the trees with the smoke winding off them and the rooks rising, falling; standing and looking until Peter Walsh said, "Musing among the vegetables?"—was that it?—"I prefer men to cauliflowers"—was that it? He must have said it at breakfast one

> morning when she had gone out on to the terrace—Peter Walsh. He would be back from India one of these days, June or July, she forgot which, for his letters were awfully dull.[২৭]

মলি ব্লুমের অন্তঃসংলাপটির তুলনায় এখানে ক্লারিশা ডালওয়ের চেতনাস্রোত অনেক বেশি অসংলগ্ন ও অসংগঠিত। এতে পাঠককে পূর্বধারণা না দিয়ে লেখক স্বল্প সময়ের জন্য মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। লেখকের এই উপস্থিতি পাঠককে ক্লারিশা ডালওয়ের চেতনার মধ্যে প্রবেশ করতে সাহায্যে করেছে। উদ্ধৃত অংশের শুরুতে দেখা যাবে লেখিকা প্রচলিত বর্ণনা পদ্ধতির সাহায্যে উপন্যাসের শুরু করেছেন। এরপর ক্লারিশা ডালওয়ের চেতনায় কী প্রবাহিত হচ্ছে তা (what a morning fresh as if issued children on a beach. What a lark! What a plunge) নির্দেশ করেছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'নয়নচারা' ছোটগল্পে এ ধরনের বর্ণনা দেখা যায়। গল্পটিতে আমু নামক এক কিশোরের চেতনাস্রোত রূপায়ণে লেখক এ রীতি প্রয়োগ করেছেন। গল্পটির সূত্রপাত হয়েছে ছিন্নমূল কিশোর আমুর হেলুসিনেশন চেতনার রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে লেখক প্রথমে প্রয়োগ করেছেন প্রত্যক্ষ অন্তঃসংলাপ। এরপর ব্যবহার করেছেন সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনা। দুটি রীতির যৌথ প্রয়োগে আমুর চেতনাস্রোত বাস্তবানুগ হয়েছে। নিচে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো :

> ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে। কিন্তু মনের চরে যখন ঘুমের বন্যা আসে, তখন মনে হয় ওটা সত্যিই ময়ূরাক্ষী: রাতের নিস্তব্ধতায় তার কালো স্রোত কল-কল করে, দূরে আঁধারে ঢাকা তীররেখা নজরে পড়ে একটু-একটু, মধ্যজলে ভাসন্ত জেলেডিঙিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো ঘন আঁধারেও সর্বংসহা আশার আলোর মতো মৃদু-মৃদু জ্বলে।
>
> তবে ঘুমের স্রোত সরে গেলে মনের চর শুষ্কতায় হাসে: ময়ূরাক্ষী! কোথায় ময়ূরাক্ষী! এখানে–তো কেমন ঝাপসা গরম হাওয়া। যে–হাওয়া নদীর বুক বেয়ে ভেসে আসে সে-হাওয়া কি কখনো অত গরম হতে পারে?
>
> ফুটপাথে ওরা সব এলিয়ে পড়ে আছে। ছড়ানো খড় যেন। কিন্তু দুপুরের দিকে লঙ্গরখানায় দুটি খেতে পেয়েছিল বলে তবু তাদের ঘুম এসেছে– মৃত্যুর মতো নিঃসাড় নিশ্চল ঘুম। তবে আমুর চোখে ঘুম নেই, শুধু কখনো-কখনো কুয়াশা নাবে তন্দ্রার, এবং যদি-বা ঘুম এসে থাকে, সে-ঘুম মনে নয়– দেহে: মন তার জেগে রয়েছে চেনা নদীর ধারে, কখনো কল্পনায় কখনো নিশ্চিত বিশ্বাসে, এবং শুনছে তার অবিশ্রান্ত মৃদু কলস্বন, আর দূরে জেলেডিঙ্গিগুলোর পানে চেয়ে ভাবছে। ভাবছে যে এরই মধ্যে হয়তো-বা ডিঙির খোদল ভরে উঠেছে বড়-বড় চকচকে মাছে– যে চকচকে মাছ আগামীকাল চকচকে পয়সা হয়ে ফিরে ভারি করে তুলবে জেলেদের ট্যাঁক। আর হয়তো-বা– কী হয়তো বা?
>
> কিন্তু ভুতনিটা বড় কাশে। খক্কক খক্কক খ খ খ । একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না, কেবল কাশে আর কাশে, শুনে মনে হয় দম বন্ধ না হলে ও কাশি আর থামছে না; তবু থামে আশ্চর্যভাবে, তারপর হাঁপায়। কাশে, কখনো-বা ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে, অথচ ঘুম লেগে থাকে জোঁকের মতো। ভুতনির ভাই ভুতো কাশে না বটে তবে তার গলায় কেমন ঘড়-ঘড় আওয়াজ হয় একটানা, যেন ঘুমের গাড়িতে চেপে স্বপ্ন-চাকায় শব্দ তুলে সে কোথায় চলেছে যে চলেছে-ই। তাছাড়া সব শান্ত, নীরবতা পাখা গুটিয়ে নিশ্চল হয়ে রয়েছে, আর জমাট বাঁধা ঘনায়মান কালো রাত্রি পর্বতের মতো দীর্ঘ, বৃহৎ ও দুর্লঙ্ঘ্য।[২৮]

লেখক প্রকৃতপক্ষে কার চেতনাস্রোত রূপায়িত করছেন তা প্রথম অনুচ্ছেদে জানা যায় না। লেখক এখানে সরাসরি বা কোনো উদ্ধৃতি চিহ্নের মাধ্যমে সে বিষয়ে কোনো-কিছু নির্দেশ করেননি। পরে বর্ণনা অগ্রসর হলে জানা যায় এটি আমু নামক এক কিশোরের চেতনাস্রোতের রূপায়ণ। আমরা এটি জানতে পারি লেখকের একটি মন্তব্য (তবে আমুর চোখে ঘুম নেই) থেকে। উদ্ধৃত অংশে

তন্দ্রাচ্ছন্ন আমুর চেতনাস্রোতের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠক ধারণা লাভ করে বস্তুত লেখকের বিভিন্ন বিশ্লেষণ (যদি-বা ঘুম এসে থাকে, সে ঘুম মনে নয়– দেহে; যে চকচকে মাছ আগামীকাল চকচকে পয়সা হয়ে ফিরে ভারি করে তুলবে জেলেদের ট্যাঁক) তথা মন্তব্য থেকে। এখানে শুধু আমুর চেতনার খোঁজই নয়, লেখক আমুর প্রতিবেশ সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনার মাধ্যমে মূর্ত করেছেন। ভুতনির দম বন্ধ হওয়া কাশির খবর (কিন্তু ভুতনিটা বড় কাশে। খক্কক খক্কক খ খ খ); ভুতো ঘুমের মধ্যে যে-শব্দ করে তার খবর (তার গলায় কেমন ঘড় ঘড় আওয়াজ হয় একটানা); রাতের শান্ত-নিস্তব্ধ শহরের রূপ প্রভৃতি আমাদের কাছে লেখক তুলে ধরেছেন প্রচলিত বর্ণনা পদ্ধতির সাহায্যে। এখানে লক্ষণীয়, আলোচ্য অংশটি বর্ণিত হয়েছে নাম পুরুষে। লেখকের প্রবল উপস্থিতির কারণে গল্পের প্রথম অংশটিকে অন্তঃসংলাপ মনে নাও হতে পারে। কিন্তু একটু নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, আমু আসলে নিজের সাথে নিজে কথা বলে চলেছে। ময়ূরাক্ষী নদী নিয়ে তার স্মৃতি; নির্জন কালো পিচের রাস্তাকে ময়ূরাক্ষী নদী মনে করা; তন্দ্রাভাব কমে আসলে ময়ূরাক্ষীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিজেকে প্রশ্ন (ময়ূরাক্ষী! কোথায় ময়ূরাক্ষী! এখানে-তো কেমন ঝাপসা গরম হাওয়া যে-হাওয়া নদীর বুক বেয়ে ভেসে আসে সে-হাওয়া কি কখনো অত গরম হতে পারে?) করা; ভুতনির কাশির আওয়াজে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করা প্রভৃতি বর্ণনা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় আমু তার চেতনায় ফিরে আসা বিষয়গুলো নিয়ে নিজের সাথে কথা বলছে।

গ. স্বগতোক্তি (soliloquy)

চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের লেখক তাঁদের রচনায় অন্তঃসংলাপ ও সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনার পর সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন স্বগতোক্তি নামক কৌশলটি। স্বগতোক্তি সাধারণত নাটকে ব্যবহার করা হয়। নাটকের কোনো একটি চরিত্রের চেতনায় কী চলছে তা এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এতে কোনো একটি চরিত্র মঞ্চে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে দর্শকদের সামনে তার চেতনায় চলা বিষয়গুলো প্রকাশ করে। তার এ কথাগুলো নাটকের অন্য কোনো চরিত্র শুনতে পায় না। মূলত বিশেষ একটি চরিত্রের চেতনালোক দর্শকের সামনে উন্মোচিত করার উদ্দেশ্যে নাট্যকার এ কৌশলটি ব্যবহার করে থাকেন। চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের লেখকরা এর চেতনাকে মূর্ত করার ক্ষমতা দেখে এটিকে তাঁদের উপন্যাসে প্রয়োগ শুরু করেন। স্বগতোক্তির স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> A dramatic convention in which a character in a play, alone on stage, speaks his or her thoughts aloud. Play-wrights employ the Soliloquy as a device to provide the audience with information about the character's motives, Plans and state of mind to explain earlier events and action that have occurred offstage, or to fill other necessary background.[২৯]

ওপরের উদ্ধৃতি থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট– প্রথমত, স্বগতোক্তির মাধ্যমে চরিত্রের অন্তর্লোক সরাসরি দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা হয়। দ্বিতীয়ত, এতে শ্রোতা বা দর্শকের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়। চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের লেখক এই কৌশল থেকে এর প্রথম সুবিধাটি গ্রহণ করেছেন। স্বগতোক্তি ব্যবহারের অপরিহার্য শর্ত দর্শকের উপস্থিতি, যা উপন্যাসের পাতায় সম্ভব নয়। তাই চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহধর্মী কথাসাহিত্যের শিল্পী চরিত্র যখন স্বগতোক্তি করে তখন

কৌশলগত শ্রোতা সৃষ্টি করে থাকেন। কথাসাহিত্যের কোনো একটি চরিত্র অন্য চরিত্রের উপস্থিতিতে তার চেতনায় প্রবাহিত অর্ধচেতন, প্রাক্‌চেতন, অবচেতন স্তরের চিন্তা, স্মৃতি, ভাবনা, অনুভূতিকে স্বগতোক্তির মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়। স্বগতোক্তির মাধ্যমে চেতনাস্রোতের সার্থক বাণীমূর্তি দানের অনেক উদাহরণ বিশ্বসাহিত্যে লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যার নাম আসে তিনি হলেন উইলিয়াম ফকনার। তাঁর *As I Lay Dying* (১৯৩০) উপন্যাসে তিনি স্বগতোক্তির সার্থক প্রয়োগ করেছেন। এই উপন্যাসটি মূলত পনেরোটি চরিত্রের স্বগতোক্তির সমন্বয়ে গঠিত। *As I Lay Dying* উপন্যাসে দেখা যায় এক মৃত্যু পথযাত্রী মহিলার শব যাত্রার আয়োজন চলছে। সেই মহিলার পুত্র জুয়েল মায়ের ঘরের জানালার নিচে তার ভাইকে কফিন তৈরি করতে দেখে উদভ্রান্তের মতো স্বগতোক্তি করছে:

> It's because he stays out there, right under the window, hammering and sawing on that goddamn box. Where she's got to see him. Where every breath she draws is full of his knocking and sawing where she can see him saying see. See what a good one I am making for you. I told him to go somewhere else. I said Good God do you want to see her in it. It's like when he was a little boy and she says if she had some fertilizer she would try to raise some flowers and he taken the bread-pan brought it back form the barn full of dung.[৩০]

উপর্যুক্ত অংশ চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী উপন্যাসে স্বগতোক্তি কীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে তার একটা ধারণা প্রদান করে। লক্ষণীয়, লেখক এখানে কৌশলগত শ্রোতা হিসাবে জুয়েলের ভাইকে উপস্থিত রেখেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে স্বগতোক্তির এমন উদাহরণ দেখা যায় গোপাল হালদারের *একদা* উপন্যাসে। *একদায়* অমিত যখন বাসে ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ির উদ্দেশে যাচ্ছিল তখন রাস্তায় ইন্দ্রাণীদের মিছিলে লাঠি চার্জ হতে দেখে। এতে তার চেতনমন সংসার ও বিপ্লবের দোদুল্যমানতা থেকে বের হয়ে আসে: "আরও আছে, নবম শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস, না? তুমি সাহিত্যিক না? তোমার জীবনের পরিচয় রাখিয়া যাইতে হইবে না? গণবিপ্লবের নুতন সূর্যের উদয় বন্দনা গাহিতে হইবে না? কাওর্য়াড! কাওর্য়াড এন্ড চীট।"[৩১] এখানে গোপাল হালদার স্বগতোক্তির কৌশলগত শ্রোতা হিসাবে উপস্থাপন করেছেন বাস যাত্রীদের। তারপর অমিতের অবচেতন মনে বয়ে যাওয়া কথামালাকে স্বগতোক্তির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। উদ্ধৃত অংশের প্রথম দিকের কথাগুলো চলেছে তার মনে। অর্থাৎ সে নিজের সাথে নিজে কথা বলেছে। আর শেষ চারটি শব্দ (কাওয়ার্ড! কাওয়ার্ড এন্ড চীট) সে চিৎকার করে বলেছে। আলোচ্য অংশটুকু উইলিয়াম ফকনার রচিত *As I Lay Dying* উপন্যাসের জুয়েলের স্বগতোক্তির তুলনায় দৈর্ঘ্যে অনেক ছোট হলেও একটি চরিত্রের চেতনার দোলাচল এবং সে দোলাচলের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সময় চেতনার যে বিক্ষুব্ধ উত্তাল অবস্থা তা রূপদানে যথেষ্ট সফল।

স্রোত (stream)

চেতনার প্রকৃতি ব্যাখ্যায় উইলিয়াম জেমস সচেতনভাবে স্ট্রিম (stream) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই শব্দটির দ্বারা তিনি মূলত চেতনার প্রবহমান ধর্মকে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু চেতনার একটি গঠন-কাঠামো রয়েছে (এ সম্পর্কে উইলিয়াম জেমস সচেতন ছিলেন)। যা ঠিক স্ট্রিম বা

স্রোতের মতো নয়। চেতনার এই কাঠামো সম্পর্কে বলা যেতে পারে, প্রথমত এটি স্থির নয়। এ কাঠামো একটি নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আমাদের মনোযোগ যে বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়, চেতনা সে বিষয়কে কেন্দ্র করে সংগঠিত হতে থাকে। আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু যদি নতুন কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে, তবে চেতনা সে নতুন বিষয়কে কেন্দ্র করে নতুনভাবে সংগঠিত হতে শুরু করে। এভাবে চেতনার কাঠামো প্রতিনিয়ত ভাঙছে এবং গড়ে উঠছে। এই ভাঙা-গড়ার ফলে চেতনায় যুগপৎ বিভিন্ন ভাবনা-অনুভূতির সমাবেশ লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়ত, মানুষের মনোযোগ শুধু তার অন্তর্জগতের বিষয়গুলোর ওপর কেন্দ্রীভূত হয় না। এক্ষেত্রে বহির্জগৎও সমান গুরুত্ব পেয়ে থাকে। ফলে মানব চেতনায় যুগপৎ অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তৃতীয়ত, চেতনার কাঠামো নির্মাণে এমন কিছু ভাবনা, অনুভূতি, স্মৃতি, প্রভৃতি ভূমিকা রাখে যার সম্পর্কে ব্যক্তি নিজে সচেতন নয়। চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহকে সাহিত্যিক রূপ দিতে গিয়ে লেখকদের সবচেয়ে বড় দায়বদ্ধতা থাকে চেতনার এই গঠন বৈশিষ্ট্যকে মূর্ত করে তোলা। এক্ষেত্রে তাঁরা যে কৌশলটি প্রয়োগ করেন তাকে রবার্ট হামফ্রে নাম দিয়েছেন "Free Association"।[৩২] তিনি মনোবিজ্ঞান থেকে এই ফ্রি-অ্যাসোশিয়েশন (free association)-এর ধারণা নিয়েছেন। ফ্রি-অ্যাসোসিয়েশন মনোবিজ্ঞানে একটি বিশেষ কৌশল হিসেবে পরিচিত। এটির প্রথম প্রয়োগ মনোবিজ্ঞানে করেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড। মনোচিকিৎসায় একজন রোগীকে তার চেতনায় যা কিছু আসে তা মুক্তভাবে বলে যেতে বলা হয়। এতে তার চেতন, অবচেতন, অচেতন মনের অবদমিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা এবং সেই বিশেষ মুহূর্তে বহিরুদ্দীপকের দ্বারা সৃষ্ট চেতনা যুগপৎ প্রকাশিত হয়। কথাসাহিত্যে চেতনার এই সামগ্রিক রূপটিকে বা গঠন-কাঠামো তুলে ধরার জন্য ফ্রি-অ্যাসোসিয়েশন ব্যবহার হয়। সাহিত্যিক ফ্রি-অ্যাসোশিয়েশন প্রকৃতপক্ষে কথাসাহিত্যে প্রবহমান চেতনার অসংগঠিত-প্রায়সংগঠিত-অসংলগ্ন অংশ এবং চরিত্রের বহিঃক্রিয়া যুগপৎ উপস্থাপনের একটি কৌশল। ফ্রি-অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা নির্মিত চেতনাস্রোতকে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের শিল্পী সাহিত্যে রূপদান করেন অন্তঃসংলাপ, সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনা, স্বগতোক্তি প্রভৃতি কৌশলের মাধ্যমে।

বিশ্বসাহিত্যে জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ, ডরোথি রিচার্ডসন, উইলিয়াম ফকনার, জ্যাক কেরোয়াক (১৯২২–১৯৬৯) প্রমুখ এবং বাংলা কথাসাহিত্য গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনায় চেতনার গঠন-কাঠামোকে মূর্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। তবে ফ্রি-অ্যাসোসিয়েশনের সার্থক উদাহরণের জন্য আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে জেমস জয়েসের কাছে। এক্ষেত্রে তাঁর *Ulysses* উপন্যাসের মলি ব্লুম চরিত্রের অন্তঃসংলাপটির অংশবিশেষ উদাহরণ হিসেবে নেয়া যেতে পারে (উদাহরণের বাংলা অংশগুলো আমাদের বিশ্লেষণ) :

> quarter after (বিনিদ্র মলি ব্লুমের শয্যা পাশে একটি ঘড়ি শব্দ করে চলেছে। সে ঘড়ির শব্দ তার চেতনায় ভেসে চলছে এবং তাকে সময় সম্পর্কে সজাগ রেখেছে) what an unearthly hour I suppose theyre just getting up in China now combing out their pigtails for the day (তার কল্পনা ঘড়ি থেকে চীন দেশে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু ঘড়ি চেতনা থেকে পুরোপুরি মুছে যায়নি) well soon have the nuns ringing the angelus (চেতনমনে নানদের প্রসঙ্গ, এবং অবচেতন

মনে– তার স্বামী লিওপোল্ড ব্লুম গভীর রাতে বাড়ি ফিরেছে, তাই তার ঘুমাতে দেরি হয়েছে– সে প্রসঙ্গ) theyve nobody coming in to spoil their sleep (যেমনভাবে লিওপোল্ড ব্লুম ঘুম নষ্ট করে) except an odd priest or two for his night office (চেতনায় আবার তার স্বামীর বেশি রাতে বাড়ি ফেরার কথা ফিরে আসে) or the alarmclock next door at cockshout clattering the brains out of itself (সকালে ঘড়ির এলার্ম তার আবার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে তা ভেবে উদ্বিগ্ন। বস্তুত ঘুম নিয়ে উদ্বিগ্ন) let me see if I can doze off 1 2 3 4 5 (খুব সকালে প্রতিবেশীর ঘড়ির এলার্মের শব্দের কথা মনে করে সে বিরক্ত হয়। সংখ্যা গণনা করতে করতে ঘুমানোর চেষ্টা করে) what kind of flowers are those they invented like the stars (ঘুমানোর চেষ্টা থেকে তার চেতনা নিবদ্ধ হয় দেয়ালে টাঙানো ছবির দিকে। সে ছবির ফুলগুলোর নাম মনে করার চেষ্টা করে) the wallpaper in Lombard street was much nicer (ছবির ফুলটির নাম মনে করার চেষ্টা করতে করতে তার চেতনা এবার চলে যায় তাদের পূর্ববর্তী বাসস্থানে দেয়ালে টাঙানো ছবির প্রতি) the apron he gave me was like that (চেতনা আবার তার স্বামীর প্রতি নিবদ্ধ হয়। সে ছবির ফুলগুলোর সঙ্গে এপরোনের তুলনা করে) something only (কিছু একটা! এই কিছু একটা মলি চরিত্রের অসংগঠিত-অসংলগ্ন চেতনা। কিন্তু অস্পষ্ট হলেও বোঝা যায় এটি লিওপোল্ড ব্লুম সংক্রান্ত চেতনা। সম্ভবত তারা যখন লম্বার্ড স্ট্রিটে ছিল তখন তার স্বামী এপরোনটি তাকে দিয়ে থাকবে) I only wore it twice (এখনও চিন্তায় এপরোন) better lower this lamp and try again so as I can get up early (ঘুমাতে দেরি হওয়ার জন্য চিন্তিত। স্বামী সংক্রান্ত স্মৃতি– এপরোনটি তার স্বামী তাকে দিয়েছিল এবং বলেছিল সেটি পরে যেন মলি সকালে বিছানায় তাকে নাস্তা দেয়। অর্থাৎ এপরোন সম্পর্কিত চেতনা এখনও ক্রিয়াশীল। আবার তাকে সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে এ সম্পর্কে সে সচেতন হয়। পাশে রাখা বাতির দ্বারা চেতনার গতি পরিবর্তন) I'll go to Lambes there beside findlaters and get them to send us some flowers to put about the place in case he brings him home tomorrow (ফুলের চিন্তা তার চেতনায় আবার ফিরে এসেছে) today I mean (আবার ঘুমাতে দেরি হওয়ায় বিচলিত) no no Fridays an unlucky day (তার মনে কোথায় যেন একটা সংস্কার দানা বেঁধে আছে। শুক্রবারকে সে অপয়া হিসেবে গণ্য করে) first I want to do the place up someway (স্টিফেন ডিডালাসকে আপ্যায়ন করার চিন্তা) the dust grows in it I think while I'm asleep (স্টিফেন ডিডালাসের আগমন উপলক্ষে বাড়িকে পরিপাটি করার চিন্তা এবং পরোক্ষভাবে ঘুমের চিন্তা) then we can have music and cigarettes I can accompany him (এবার সে স্টিফেন ডিডালাসের সঙ্গে কাটানো একটি দিনের স্মৃতি স্মরণ করছে) first I must clean the keys of the piano with milk what will I wear shall I wear a white rose (স্টিফেন ডিডালাসের সঙ্গে যখন সে প্রথম বারের মতো বেড়াতে যায় সে সময়ের স্মৃতি এবং আবারো একটি ফুল সম্পর্কিত চিন্তা) or those fairy cakes in Liptons (এবার তার চেতনায় সক্রিয় সকালে বাজারে যাবার পরিকল্পনা) I love the smell of a rich big shop at 7 1/2d a lb or the other ones with the cherries in them and the pinky sugar 1'1d a couple of lbs (বাজারে অবস্থানের অনুভূতির সমাপ্তি) of those a nice plant for the middle of the table (ফুলের চিন্তায় ফিরে আসা এবং স্টিফেন ডিডালাসকে আপ্যায়নের ভাবনা) Id get that cheaper in wait wheres this I saw them not long ago (এবার চেতনায় অন্য একটি দোকান যার নাম সে স্মরণ করতে পারছে না। পরোক্ষভাবে আবার সকালে বাজার করার চিন্তা) I love flowers Id love to have the whole place swimming in roses (ফুলের দোকানের চিন্তা। পরোক্ষভাবে আবার ফুলের অনুভূতি) God of heaven theres nothing like nature (ফুল থেকে ভাবনা প্রকৃতিতে স্থানান্তরিত) the wild mountains then the sea and the waves rushing then the beautiful country with the fields

> of oats and wheat and all kinds of things and all the fine cattle going about that would do your heart good to see rivers and lakes and flowers all sorts of shapes and smells and colors springing up even out of the ditches primroses and violets nature it is as for them saying theres no God I wouldnt give a snap of my two fingers for all their learning why dont they go and create something (প্রকৃতির প্রতি তার ভালবাসা ধীরে ধীরে উগ্র আধ্যাত্মিকতায় পর্যবসিত। অন্যভাবে দেখলে তার এই আধ্যাত্মিক স্টিফেন ডিডালাসের মননশীলতার প্রতি আক্রমণ)।[৩৩]

মলি ব্লুমের অন্তঃসংলাপ এখানেই থেমে যায়নি, আরো কিছুক্ষণ চলেছে। এরপর তার ভাবনায় এসেছে কোনো এক নাস্তিকের সঙ্গে কথোপকথন। যাকে সে বলেছিল, নাস্তিকরা কি সূর্য উদয় রুখতে পারবে? এই সূর্য সম্পর্কিত ভাবনার সূত্র ধরে তার চেতনায় চলে আসে লিওপোল্ড ব্লুমের করা একটি মন্তব্য: "the sun shines for you."[৩৪] এ কথাটি লিওপোল্ড ব্লুম বলেছিল তাদের বিয়ের সময়। বিয়ের স্মৃতি থেকে মলি ব্লুমের চেতনায় চলে আসে যেখানে তাদের বিয়ে হয়েছিল সেই স্থান জিব্রাল্টার দিনগুলোর কথা: "Gibraltar as a girl where I was a Flower of the mountain yes when I put the rose in my hair like the Andalusian girls."[৩৫] সেখান থেকে তার চেতনা আবার কেন্দ্রীভূত হয় স্বামী লিওপোল্ড ব্লুমের ওপর। এবার তার চেতনায় চলে আসে জিব্রাল্টায় তাদের প্রথম চুম্বনের স্মৃতি। তারপর সে নিজেকে ফুলের মধ্যে নিমজ্জিত কল্পনা করতে করতে সেই পুরানো অনুভূতি ও শিহরন নতুন রূপে উপভোগ করে:

> I was a Flower of the mountain yes when I put the rose in my hair like the Andalusian girls used or shall I wear a red yes and how he kissed me under the Moorish wall and I thought well as well him as another and then I asked him with my eyes to ask again yes and then he asked me would I yes to say yes my mountain flower and first I put my arms around him yes and drew him down to me so he could feel my breasts all perfume yes and his heart was going like mad and yes I said yes I will Yes.[৩৬]

উপন্যাসের শেষ লাইনগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে মলি ব্লুমের চেতনা ক্রমে ধূসর থেকে ধূসরতর হয়ে এক পর্যায়ে নিভে যায়। চেতনার এই নিভে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে সে নিদ্রামগ্ন হয়েছে। এখন মলি ব্লুমের চেতনার একটি কাঠামো তৈরি করে নেয়া যেতে পারে :

ঘড়ির শব্দ শ্রবণ (ঘড়ির শব্দ দ্বারা সৃষ্ট চেতনা)

১. চীনের সকাল নিয়ে কল্পনা।
২. স্মৃতিতে দেবদূত।
৩. নানদের শান্তিময় নিদ্রা সম্বন্ধে কল্পনা।
৪. প্রতিবেশীর ঘড়ির বিরক্তিকর ঘণ্টা শোনার ভাবনা।

দেয়ালের ছবি (দেয়ালের ছবি দেখে সৃষ্ট চেতনা)

৫. তারকা আকৃতির ফুল স্মরণ করা।
৬. তাদের পূর্ববর্তী বাসস্থান লম্বার্ড স্ট্রিটের স্মৃতি।
৭. স্বামী লিওপোল্ড ব্লুমের দেয়া এপরোনের কথা স্মরণ করা।

আলো কমানো (পাশে থাকা বাতির আলো তার চেতনাকে প্রভাবিত করে)

৮. খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার কথা স্মরণ করা।
৯. পরের দিন কেমন হবে তার কল্পনা।
১০. কেনা-কাটা নিয়ে ভাবনা।
১১. পূর্বের একটি দোকানের স্মৃতি।
১২. স্টিফেন ডিডালাসকে আপ্যায়নের পরিকল্পনা।
১৩. ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করার ভাবনা।
১৪. স্টিফেন ডিডালাসকে আপ্যায়নের পরিকল্পনা।
১৫. পিয়ানো পরিষ্কার করার ভাবনা।
১৬. শোভাবর্ধনের জন্য টেবিলের ওপর ফুল রাখার পরিকল্পনা।
১৭. সাদা-গোলাপে পূর্ণ ঘরে নিমজ্জিত হবার বাসনা।
১৮. স্মৃতি ও কল্পনার মেলবন্ধনে তৈরি অপার্থিব প্রকৃতি।
১৯. প্রকৃতির বহুমাত্রিক চিত্র দেখা।
২০. কোনো এক নাস্তিককে দেয়া সূর্য-সম্পর্কিত তার যুক্তির স্মরণ।
২১. সূর্য নিয়ে লিওপোল্ড ব্লুমের করা মন্তব্য স্মৃতিতে পুনর্জাগরণ।
২২. তাদের বিয়ের দৃশ্য স্মৃতিতে পুনর্নির্মাণ।
২৩. তাদের বিয়ে যেখানে হয়েছিল সেই জিব্রাল্টার প্রকৃতির স্মৃতিকে পুনর্নির্মাণ।
২৪. বিয়ের দৃশ্যের পুনর্নির্মাণ।
২৫. সর্বশেষে চেতনা থেকে সব কিছু অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

চেতনাস্রোতের কাঠামোটি থেকে মলি ব্লুম চরিত্রের চেতনার প্রবহমানতা ও গঠন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এখানে চরিত্রের চেতনা কখনো স্থির অবস্থায় থাকেনি। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে তার অন্তঃসংলাপের বিষয়বস্তু পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটির দিকে লক্ষ করলে। কাঠামোটিতে আরো দেখা যাবে, চরিত্রের চেতনার প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বহিরুদ্দীপক এবং অবচেতন মনে থাকা স্মৃতি দিয়ে। তাছাড়া মলি ব্লুম চরিত্রের চেতনার যে সমন্বিত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ একই সঙ্গে বিচিত্র ভাবনা-অনুভূতির সম্মিলন তা লেখক খুব সার্থকভাবে মূর্ত করেছেন। ফ্রি-অ্যাসোশিয়েশন এখানে মলি ব্লুম চরিত্রের চেতনার প্রতিটি স্তরে অর্থাৎ চেতন, অবচেতন, অচেতন মনের ভাবনা বের করে নিয়ে এসেছে বা বলা যেতে পারে চেতনার কাঠামো নির্মাণ করেছে। আর চেতনার এ কাঠামোটি লেখক সাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন প্রত্যক্ষ অন্তঃসংলাপের সাহায্যে।

বাংলা কথাসাহিত্যে চেতনার গঠন-কাঠামো পরিস্ফুটনের এমন উদাহরণ দুর্লক্ষ নয়। গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রমুখ কথাসাহিত্যিকের রচনাতে চেতনার গঠন-কাঠামো রূপায়ণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। বর্তমান আলোচনায় এক্ষেত্রে

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত 'নয়নচারা' ছোটগল্পের অংশ-বিশেষ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা যেতে পারে (উদ্ধৃতির বন্ধনীবদ্ধ বাঁকা হরফের অংশগুলো আমাদের বিশ্লেষণ)

ভুতনিটা এবার জোর আওয়াজে কেশে উঠল বলে আমুর মনের কুয়াশা কাটল। *(গল্পের একেবারে শুরু থেকে তন্দ্রামগ্ন আমুর চেতনায় ভুতনির কাশি বারবার প্রতিফলিত হয়েছে)* সে ভরা চোখে তাকাল ওপরের পানে– তারার পানে, এবং অকস্মাৎ অবাক হয়ে ভাবল, ওই তারাগুলিই কি সে বাড়ি থেকে চেয়ে-চেয়ে দেখত? *(ফেলে আসা নয়নচারা গ্রাম ও তাদের বাড়ির স্মৃতি)* কিন্তু সে তারাগুলোর নিচে ছিল ঢালা মাঠ, ভাঙা মাটি, ঘাস, শস্য আর ময়ূরাক্ষী। *(গল্পের শুরু থেকেই আমুর ভাবনায় ময়ূরাক্ষী নদী, ফেলে আসা গ্রামকে কল্পনায় পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা)* আর এ-তারাগুলোর *(এখানে চেতনা অস্পষ্ট, অসংগঠিত, চেতনাস্রোতের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়েছে)* নিচে খাদ্য নেই, দয়ামায়া নেই, রয়েছে শুধু হিংসাবিদ্বেষ নিষ্ঠুরতা, অসহ্য বৈরিতা। *(দয়ামায়া নেই-কার? তারাগুলোর? না মানুষের। তার অবচেতনে রয়েছে শহরের মানুষের নিষ্ঠুরতার কথা। কিন্তু চেতন মনে তারার নিষ্ঠুরতা। আবার পরোক্ষভাবে চেতনায় নয়নচারা গ্রাম)*

কিন্তু ওরা তারা। তাদের ভালো লাগে। আর তাদের পানে চাইলে কী যেন হঠাৎ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বিপুল বাহু মেলে আসে, আসে–। *(চেতনা ক্রমে ম্রিয়মাণ হয়ে আসছে, আমু আসলে তারার কথা ভাবতে ভাবতে মায়ের স্নেহপূর্ণ কোল প্রত্যাশী হয়ে ওঠে।)* কিন্তু যা এসেছিল, মূহূর্তে তা সব শূন্য রিক্ত করে দিয়ে গেল। *(কল্পনা নির্মিত জগৎ ফিকে হয়ে গেল)* কিছু নেই...। শুধু ঘুম নেই। *(অসংগঠিত চেতনা, কিন্তু এটুকু বোঝা যায় ঘুম নয় আসল অভাব খাবারের)* কিন্তু তাই যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে। *(অস্পষ্ট ভাবনা)* নদীতে জোয়ার না ভাটা? মনে হচ্ছে ভাটা এবং এ-ভাটাতে ভেসে যাবার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে তার। *(অস্পষ্ট ভাবনা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমুর আসলে ময়ূরাক্ষী নদীর পাড়ে যেতে ইচ্ছে করছে)* সে ভেসে যাবে, প্রশস্ত নদী তাকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, দূরে বহুদূরে– কোথায় গো? যেখানে শান্তি– সেইখানে? *(আবার স্মৃতিতে ফেলে আসা নয়নচারা গ্রাম)* কিন্তু সেই শান্তি কি বিস্তৃত বালুচরের শান্তি? *(দুর্ভিক্ষে মরুভূমি হয়ে পড়া নয়নচারা গ্রামের শান্তির দৃশ্য এবং সে দৃশ্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে চেতনা)*

তবে এখানে মানুষের পায়ের আওয়াজ হয়। *(শহরের মানুষ সম্পর্কে তার ভাবনা বাধাগ্রস্ত হয়— মানুষের পায়ের আওয়াজ দ্বারা। ফলে চেতনায় দুটি বিষয় মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে।)* আর এখানে শহর। *(নিজ অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা)* মন্থরগতিতে চলা এ জোড়া পায়ের আওয়াজ ঘুরে আসছে গলি দিয়ে, এবং নদীর মত প্রশস্ত এ-রাস্তায় সে যখন এল *(চেতনায় আবার ময়ূরাক্ষী নদীর ভাবনা ফিরে আসা)* তখন আমু বিস্মিত হয়ে দেখল যে লোকটির মধ্যে শয়তানের চোখ জ্বলছে *(শৈশবে প্রাপ্ত শয়তানের ধারণা অবচেতন থেকে উঠে আসে)* আর সে-চোখ হীনতায় ক্ষুদ্রতম ও ক্রোধে রক্তবর্ণ। *(দুর্ভিক্ষ ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান। পক্ষান্তরে শহরের নিষ্ঠুরতার স্মৃতিতে পুনর্জাগরণ)* হয়তো-বা সেটা শয়তানের চোখ নয়, হয়তো শুধু একটি বিড়ি। তাহলে অদৃশ্য কালো শয়তানের হাতে বিড়ি, যেটা দুলছে কেবল তার হাতের দোলার সাথে। *(ভ্রমমুক্ত দৃষ্টি)* শয়তানকে দেখে বিস্ময় লাগে, বিস্ময়ে চোখ ঠিকরে যায়, ঘন অন্ধকারে তাতে আগুন ওঠে জ্বলে। তবে শুধু এই বিস্ময়-ই: ভয় করে না একটু-ও: বরঞ্চ সে যেন শয়তানের সাথে মুখোমুখি দেখা করার জন্য অপেক্ষমাণ। *(যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মতো মানসিক অবস্থা তৈরি)* তাছাড়া, রাস্তার অপর পাশের বাড়িটার একটি বন্ধ জানালা থেকে যে উজ্জ্বল ও সরু একটা আলোরেখা দীর্ঘ হয়ে রয়েছে– সে-আলোরেখায় যখন গতিরুদ্ধ স্তব্ধতা, তখন শয়তানের হাতে আগুন জ্বলতে দেখলে আরো ক্রোধ হয় মানুষের। *(আলোকরেখা ও বিড়ির আগুন সমন্বয়ে গঠিত দৃশ্যকল্প, এবং আবারও মানুষের নিষ্ঠুরতার প্রতি তীব্র ক্রোধ)* আগুনটা দুলছে না হাসছে *(কল্পনায় আগুনের হাসি)* আমুরা যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কঁকায় *(এবার তার অনুভূতিতে ফিরে এসছে ক্ষিধে)*– তখন পথচলতি লোকেরা যেমন আলাদা অপরিচিত দুনিয়ার কোন অজানা কথা নিয়ে হাসে, এ-ও যেন তেমনি হাসছে। কিন্তু কেন হাসবে? দীর্ঘ– উজ্জ্বল সে-রেখাকে তার ভয় নেই? জানেনা সে যে ওটা খোদার দৃষ্টি–অকম্পিত দ্বিধা শূন্য ঋজু দৃষ্টি? *(আলোক রেখা তার মনে সৃষ্টি করেছে অধ্যাত্মচেতনা)* তবু আলো-কণা হাসে, হাসে কেবল, পেছনে কালো শয়তান কালো রঙে হাসে। *(শয়তানের ফিরে আসা)* তা হাসুক আলাদা দুনিয়ায় হাসুক, কারো কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এ-দুনিয়ায়– যে দুনিয়ায় ঘর ছেড়ে লোকেরা কালো নদীর ধারে *(কালো পিচের পথ তার কাছে নদী বলে মনে হচ্ছে। আসলে অবচেতনে আছে ফেলে আসা ময়ূরাক্ষী নদী, নয়নচারা গ্রাম।)*– ধারে পড়ে রয়েছে ভাটার টানে ভেসে যাবে

বলে, সে-দুনিয়ায় তাকে সে হাসতে দেবে না– হাসতে দেবে না। *(না খেতে পেয়ে মরার আশঙ্কায় ভীত। তবে এখানেও শহরের নিষ্ঠুরতার প্রতি ঘৃণা বর্তমান)*

তবু কালো শয়তান রহস্যময়ভাবে এগিয়ে আসছে– *(পুনরায় শয়তান চেতনায় ফিরে এসেছে)* শূন্য ভাসতে-ভাসতে যেন এগিয়ে আসছে ক্রমশ, এসে, কী আশ্চর্য, আলোরেখাটাও পেরিয়ে গেল নির্ভয়ে, *(আমুর চেতনায় আলোক রেখা সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়েছে সেটি খোদার দৃষ্টি। তাই সেটি শয়তান পেরিয়ে গেলো দেখে সে বিস্মিত। তার অচেতন কিংবা অবচেতন মনের গহীনে লুকায়িত–খোদা শয়তানের চেয়ে শক্তিমান– এ ধারণা আঘাত প্রাপ্ত হলো।)* এবং গতিরুদ্ধ দীর্ঘ সে-রেখা বাধা দিল না তাকে। মৃতগতির পানে চেয়ে নদীর বুকে *(চেতনায় আবার ময়ূরাক্ষী নদী আর অবচেতন মনে নয়নচারা গ্রাম)* তারপর নাবল কুয়াশা: আমুর চোখে পরাজয় ঘুম হয়ে নাবল। পরাজয় মেনে নেয়াতে-ও যেন শান্তি। *(চেতনা ক্রমে অচেতন স্তরে উপনীত এবং আমু নিদ্রামগ্ন)* [৩৭]

আমুর নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে লেখক দৃশ্যটি সমাপ্ত করেছেন। এরপর শুরু হয়েছে নতুন একটি দিন। এ দৃশ্যটিতে আমুর চেতনার প্রবাহ বারবার পরিবর্তন হয়েছে। এ পরিবর্তন চেতনার প্রকৃতি অর্থাৎ প্রবহমানতা এবং গঠন-কাঠামো নিশ্চিত করেছে। আমরা মলি ব্লুমের অনুরূপ আমুর চেতনার একটি কাঠামো তৈরি করে পর্যবেক্ষণ করতে পারি:

ভুতনির কাশি ও আকাশের তারা

১। নয়নচারা গ্রামের স্মৃতি।

২। ময়ূরাক্ষী নদীর স্মৃতি ও কল্পনায় ময়ূরাক্ষীর পুনর্নির্মাণ।

৩। নয়নচারা গ্রাম থেকে দেখা তারা ও শহরে দেখা তারার মধ্যে তুলনা। পক্ষান্তরে মানুষে-মানুষে তুলনা এবং স্মৃতিতে নয়নচারা গ্রাম।

৪। ময়ূরাক্ষী নদীর জোয়ার-ভাটার অনুভব।

৫। নয়নচারা গ্রামের দিনগুলোকে ফিরে দেখার চেষ্টা।

আবার তারা

৬। তারাদের সম্পর্কে ভালো লাগা।

৭। মায়ের মমতা ফিরে পাবার বাসনা।

৮। অসংগঠিত চেতনা ও অবচেতন মনে খাবারের জন্য হাহাকার।

৯। নিদ্রাহীনতায় উদ্বেগ ও অবচেতন মনে আবার খাবারের জন্য হাহাকার।

১০। ময়ূরাক্ষী নদীর কাছে যাবার বাসনা।

১১। নয়নচারা গ্রামের ভয়াবহ অভাবের চিন্তা।

পায়ের আওয়াজ

১২। নিজ অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা।

১৩। শহরের গলির সাথে ময়ূরাক্ষী নদীর তুলনা (দৃশ্যকল্প নির্মাণ)

১৪। শয়তানের কল্পনা।

১৫। এগিয়ে আসা মানুষের সঙ্গে শয়তানের তুলনা (একটি দৃশ্যকল্প রচনা)

১৬। ভয় ও ভয় থেকে মুক্তি।

জানালা দিয়ে আসা আলো

১৭। আলোকরেখা ও এগিয়ে আসা শয়তানের হাতের বিড়ির আগুনের সমন্বয়ে তৈরি দৃশ্যকল্প।

১৮। আধ্যাত্মিক চেতনা।

১৯। শয়তানের হাসি।

২০। কালো পিচের রাস্তা ও ময়ূরাক্ষী নদীর মিলিত দৃশ্যকল্প।

২১। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনা।

২২। শয়তানের হাসি

২৩। শয়তানটি আমু কল্পিত খোদার দৃষ্টি পেরিয়ে যাওয়ায় বিস্ময়।

২৪। ময়ূরাক্ষী নদী ও নয়নচারা গ্রাম।

২৫। ম্রিয়মাণ চেতনা।

আমুর চেতনাস্রোতের কাঠামোটি নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে তা বহিরুদ্দীপকের দ্বারা মোট চারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। প্রথমবার, ভুতনির কাশি ও আকাশের তারা দ্বারা। দ্বিতীয়বার, পুনরায় তারার দ্বারা। তৃতীয়বার, একজন মানুষের (যে মানুষটির হাতে প্রজ্বলিত বিড়ি আমুর কাছে মনে হয়েছে শয়তানের চোখ) পায়ের আওয়াজ দ্বারা। চতুর্থবার, রাস্তার পাশের একটি বাড়ির বন্ধ জানালার ফাঁক গলিয়ে আসা আলোকরেখার দ্বারা। এই চারটি বহিরুদ্দীপকের দ্বারা আমুর চেতনা অর্থপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। উপর্যুক্ত চেতনা-কাঠামোটির দিকে লক্ষ করলে তা সহজে অনুধাবন করা যাবে। উইলিয়াম জেমসের মতে চেতনা একবার সক্রিয় হয়ে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে যদি না কোনো বহিঃ বা অন্তরুদ্দীপকের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়। চেতনা বহিরুদ্দীপকের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হলে দুটি চেতনা মিলে নুতন একটি চেতনা সৃষ্টি হয়। 'নয়নচারা' গল্পে আলোচ্য দৃশ্যে দেখা যায় লেখক এমন একটি চেতনার রূপায়ণ করেছেন। আমুর শহর-সংক্রান্ত ভাবনা আগন্তুকের পায়ের আওয়াজে বাধা প্রাপ্ত হয়। এতে দুটি চেতনা মিলে একটি নতুন চেতনা সৃষ্টি হয়েছে (তবে এখানে মানুষের পায়ের আওয়াজ হয়।) চরিত্রের অন্তঃক্রিয়ার পাশাপাশি বহিঃক্রিয়ার রূপায়ণ চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। *Ulysses* উপন্যাসের ইতঃপূর্বে আলোচিত দৃশ্যটির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, চেতনার প্রবহমানতা ও গঠন-কাঠামো রূপায়ণে জেমস জয়েস ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সমান মনোযোগী। এক্ষেত্রে তাঁরা ব্যবহার করেছেন ফ্রি-অ্যাসোশিয়েশন কৌশলটি। তাছাড়া দুই জনেরই বর্ণনার বিষয় চেতনার অসংগঠিত-প্রায় সংগঠিত-অসংলগ্ন-বিচ্ছিন্ন-আপাত বিচ্ছিন্ন অংশ; যা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আলোচ্য অংশ দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্যও বর্তমান। কিন্তু তা উপাদানগত নয়, গঠনগত। *Ulysses* উপন্যাসের ইতঃপূর্বে আলোচিত অংশটি প্রত্যক্ষ অন্তঃসংলাপ পদ্ধতিতে রচিত। আর 'নয়নচারা' গল্পের বর্তমান অংশটি সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনা ও পরোক্ষ অন্তঃসংলাপের সমন্বয়ে রচিত।

স্থান ও কালের মেল বন্ধন (space & time montage)

চেতনার সামগ্রিক রূপ মূর্ত করার জন্য ফ্রি-অ্যাশোসিয়েশনের পাশাপাশি খুব সীমিত আকারে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণভাবে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যে একগুচ্ছ কৌশলের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। ডেভিড ডাইচেস একে নাম দিয়েছেন "Cinamatic Devices"।[৩৮] বাংলায় একে বলা যেতে

পারে চলচ্চিত্র-ধর্মী কৌশল। চলচ্চিত্রে প্রযুক্ত কৌশলগুলোর মধ্যে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের লেখকরা মন্তাজকে (montage) সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মন্তাজের পাশাপাশি তারা চলচ্চিত্রের অপরাপর কৌশল যেমন: মাল্টিপল-ভিউ (multiple-view), স্লো-আপ (slow-up), ফেড-আউটস (fade-outs), কাটিং (cutting), ক্লোজ-আপস (close-ups), প্যানোরামা (panorama), ফ্ল্যাশ-ব্যাকস (flash-backs) প্রভৃতিকে তাদের কথাসাহিত্যে প্রয়োগ করে থাকেন। মন্তাজের স্বরূপ সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন:

> 'Montage' in the film sense refers to a class of devices which are used to show interrelation or association of ideas, such as a rapid succession of images or the superimposition of image on image or the surrounding of a focal image by related ones. It is essentially a method to show composite or diverse views of one subject-in short, to show multiplicity.[৩৯]

সমালোচকের মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, একাধিক চিন্তা-চেতনার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃশ্যমান করতে সাধারণত চলচ্চিত্রে মন্তাজের প্রয়োগ করা হয়। আর এটি নির্মাণ করা হয় চিত্রের ধারাবাহিক পরিবর্তন, চিত্রের সঙ্গে চিত্র সংযোগ, মূল চিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত পার্শ্বিক চিত্র প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। চলচ্চিত্রে এ কৌশলটির দ্বারা সাধারণত একটি বিষয়ের বহুমাত্রিক দিক ও ব্যাপকতা তুলে ধরা হয়। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত চলচ্চিত্রের অপরাপর কৌশলগুলো প্রয়োগ করা হয় মন্তাজকে কার্যকর করার জন্য। মন্তাজের সাফল্য নির্ধারণের পাশাপাশি এ কৌশলগুলোর দ্বারা দ্বিমাত্রিক চলচ্চিত্র পর্দার যে সীমাবদ্ধতা তা অতিক্রমের চেষ্টা করা হয়। যেমন, চলচ্চিত্রে মাল্টিপল-ভিউ-এর দ্বারা ঘটনার চলমানতা নির্দেশ করা হয়। স্লো-আপ, ক্লোজ-আপস ও ফেড-আউটসের দ্বারা চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ (details) রূপ মূর্ত করা হয়। পাশাপাশি কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তকে অসীম সময় পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করতে এ কৌশলগুলোর প্রয়োগ দেখা যায়। চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যে চলচ্চিত্র-ধর্মী কৌশলের প্রয়োগ দেখা যায় জেমস জয়েস ও ভার্জিনিয়া উলফের রচনায়। তাঁদের পাশাপাশি খ্যাত-অখ্যাত অনেক লেখকের চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী রচনায় এ কৌশলটির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। চেতনার প্রকৃতি এ শ্রেণির লেখক সম্প্রদায়কে চলচ্চিত্র-ধর্মী কৌশল ব্যবহারে উৎসাহিত করেছে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে চেতনাস্রোত কালের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রবাহিত হয় না। এই স্রোতে কখনো উঁকি মারে অতীত আবার কখনো বা উঁকি মারে ভবিষ্যৎ কল্পনা। ফলে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কোনো সময়গত সীমা রেখায় বন্দি থাকে না। চরিত্রের চেতনায় তিন কাল মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। আমরা জানি প্রকৃতিগত ভাবে মানুষের চেতনায় শুধু ঘটমান বর্তমান কালের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এই ঘটমান বর্তমানের মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ বিলীন হয়ে যায়। ফরাসি দার্শনিক হেনরি বার্গসঁ (১৮৫৯-১৯৪১) এই কাল-চেতনার নাম দিয়েছেন লা-ডুরি (la durée) বা "Psychological Duration"[৪০]। যাকে বাংলায় বলা যায়, মনস্তাত্ত্বিক সময়। আর ভার্জিনিয়া উলফের কাছে এ কাল-চেতনা হলো: "Time in the mind"।[৪১] হেনরি বার্গসঁর সাইকোলোজিক্যাল ডিওরেশন (psychological duration) বা ভার্জিনিয়া উলফের টাইম ইন দ্যা মাইন্ড (time in the mind) দুটোই যান্ত্রিক সময় থেকে ভিন্ন। এই সময় ঘড়ির কাঁটার ক্রমানুসারে চলে না। এ সময় কোনো ব্যক্তি বা চরিত্রের একান্ত অন্তর্গত

প্রবাহ, যার গতিরেখা কখনো বর্তমান থেকে অতীত আবার অতীত থেকে বর্তমানের দিকে ধাবিত। চেতনা শুধু বিভিন্ন কালেই পরিভ্রমণ করে না। বিভিন্ন স্থানেও পরিভ্রমণ করে। চেতনা যখন অতীত-বর্তমান বা কল্পিত ভবিষ্যতে পরিভ্রমণ করে তখন স্থান স্থির থাকে। অর্থাৎ কোনো একটি স্থানে থেকে ব্যক্তি বিভিন্ন কাল পরিভ্রমণ করলে তার স্থানের অনুষঙ্গে কোনো পরিবর্তন হয় না। অপরপক্ষে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে চেতনা যখন বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তখন চেতনায় ভিন্ন ভিন্ন স্থান প্রতিফলিত হয়। সেক্ষেত্রে সময় স্থির থাকে। চেতনার এ বৈশিষ্ট্যকে রূপ দান করার জন্য লেখক সম্প্রদায় মন্তাজ কৌশলটির প্রয়োগ করে থাকেন। চলচ্চিত্রের এই কৌশলটি কথাসাহিত্যে দুইভাবে প্রয়োগ করা হয়। এ প্রয়োগ সম্পর্কে ডেভিড ডাইচেস বলেছেন:

> There are two methods: one is that in which subject can remain fixed in space and his consciousness can move in time– the result is time-montage or the superimposition of images or ideas from one time on those of another; the other possibility, of course, is for time to remain fixed and for the spatial elements to change, which results in space-montage.[৪২]

অর্থাৎ বিষয়কে একটি স্থানে আবদ্ধ রেখে চেতনা যদি বিভিন্ন কালে পরিভ্রমণ করে তবে টাইম-মন্তাজ (time-montage) গঠিত হয়। আর যদি বিষয়কে একটি কাল বা সময়ে স্থির রেখে চেতনা বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তবে গঠিত হয় স্পেস-মন্তাজ (space-montage)।

চলচ্চিত্র-ধর্মী কৌশল বিশেষত মন্তাজের দ্বারা চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-র লেখক চেতনার মৌলিক ধর্ম প্রবহমানতা ও বিভিন্ন ভাবনা-অনুভূতির সহাবস্থান মূর্ত করে তোলেন। ভার্জিনিয়া উলফের কথাসাহিত্যে চলচ্চিত্র-ধর্মী কৌশলের সুন্দর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তাঁর *Mrs Dalloway* উপন্যাসের প্রথম অংশে এই কৌশলের প্রয়োগ দেখা যাবে। সেখানে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ক্লারিশা ডালওয়ের চেতনাস্রোত রূপায়ণে লেখিকা চলচ্চিত্র-ধর্মী কৌশলের প্রয়োগ করেছেন। *Mrs Dalloway* উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায়, ক্লারিশা ডালওয়ে আসন্ন একটি অনুষ্ঠানের কথা ভাবছে। তার এ ভবিষ্যৎ চিন্তা হঠাৎ ফিরে আসে বর্তমানে। তার মনে হয় কী সুন্দর সকাল। এরপর চিন্তা চলে যায় কুড়ি বছর পেছনে বার্টন (Bourton)-এর সুন্দর দিনগুলোতে। এক্ষেত্রে ভার্জিনিয়া উলফ প্রয়োগ করলেন ফ্ল্যাশ-ব্যাক। এরপর ক্লারিশা ডালওয়ের চেতনায় ভেসে ওঠে পিটার ওয়ালশ। তাকে দেখা গেল ক্লোজ-আপসের প্রয়োগের মাধ্যমে। এবার দেখা গেল ক্লারিশা ডালওয়ের চেতনায় পিটার ওয়ালশের আসন্ন লন্ডন ভ্রমণ প্রসঙ্গ। ভ্রমণ প্রসঙ্গ চলমান অবস্থায় দেখা গেল লেখিকা মনোযোগী হলেন রাস্তা দিয়ে যাওয়া অপরিচিত এক ব্যক্তির বর্ণনায়। পিটার ওয়ালশের আসন্ন ভ্রমণ এবং অপরিচিত এক ব্যক্তির রাস্তা দিয়ে যাওয়া দুটি বিষয় ক্লারিশা ডালওয়ের চেতনায় যুগপৎ এসেছে। এ অবস্থা রূপায়ণে লেখিকা মাল্টিপল- ভিউয়ের ব্যবহার করেছেন। পথিকের বর্ণনার পর লেখিকা আবার ক্লারিশা ডালওয়ের চেতনায় ফিরে এলেন। এবার ক্লারিশার চেতনায় লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার নামক স্থানের প্রতি অনুরাগ। ওয়েস্ট মিনিস্টার চেতনা থেকে মুছে গিয়ে আবার চেতনায় পিটার ওয়ালশ। এখানে প্রয়োগ করা হলো ফেড-আউটস কৌশলটি। অর্থাৎ পিটার ওয়ালশের ভাবনা ধীরে ধীরে মুছে ফেলা হলো। এ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ক্লারিশা ডালওয়েকে লেখিকা একটি স্থানে স্থির রেখেছেন। কিন্তু তার

চেতনা বর্তমান-অতীত-ভবিষ্যৎ তিন কালে পরিভ্রমণ করেছে। বর্ণনার এ বৈশিষ্ট্য আলোচ্য অংশটিকে একটি সার্থক মন্তাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এখানে লক্ষণীয় মন্তাজটি গঠিত হয়েছে অপরাপর চলচ্চিত্র-ধর্মী কৌশলের সাহায্যে।

স্পেস মন্তাজের বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষ করা যায় জেমস জয়েসের রচনায়। তাঁর *Ulysses* উপন্যাসের দ্যা ওয়ান্ডারিং রক (The wandering Rock) পর্বটি তিনি মূলত স্পেস-মন্তাজের সাহায্যে নির্মাণ করেছেন। দেখা যায়, অধ্যায়টি সর্বমোট আঠারোটি দৃশ্যের সমন্বয়ে গঠিত। আঠারো দৃশ্য ডাবলিন শহরের একই সময়ে কিন্তু ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে সংঘটিত হচ্ছে। এ অবস্থাটি নিশ্চিত করার জন্য লেখক প্রতিটি স্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন এবং একটি দৃশ্যের মধ্যে অন্য দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। এখানে দ্যা ওয়ান্ডারিং রক অধ্যায়ের একটি দৃশ্য পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। লিওপোল্ড ব্লুম একটি বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে পর্ন-পত্রিকা দেখছে। সে প্রকৃতপক্ষে বইয়ের দোকানে গিয়েছিল স্ত্রী মলি ব্লুমকে উপহার দেবার জন্য একটি উপন্যাস কিনতে। লিওপোল্ড ব্লুম যে পর্ন-পত্রিকা দেখছে তা লেখকের সরাসরি বর্ণনা থেকে জানা যায় না। জানা যায় লিওপোল্ড ব্লুমের অনুচ্চারিত চিন্তা থেকে :

> Mr Bloom, alone, looked at the titles. FAIR TYRANTS by James Lovebirch.
> Know the kind that is. Had it? Yes.
> He opened it. Thought so.
>
> A woman's voice behind the dingy curtain. Listen: the man.
> No: she wouldn't like that much. Got her it once.
>
> He read the other title: SWEETS OF SIN. More in her line. Let us see.
> He read where his finger opened.
>
> —ALL THE DOLLARBILLS HER HUSBAND GAVE HER WERE SPENT IN THE STORES ON WONDROUS GOWNS AND COSTLIEST FRILLIES. FOR HIM! FOR RAOUL!
>
> Yes. This. Here. Try.
>
> —HER MOUTH GLUED ON HIS IN A LUSCIOUS VOLUPTUOUS KISS WHILE HIS HANDS FELT FOR THE OPULENT CURVES INSIDE HER DESHABILLE.
>
> Yes. Take this. The end.[৪৩]

দৃশ্যটি আরো কিছু দূর গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। লেখক এ দৃশ্যের পর একই সময়ে ডাবলিন শহরে চলা একটি নিলামের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য দৃশ্যটি হঠাৎ শেষ করে লেখক নিলামের দৃশ্যে গেছেন। এখানে লক্ষণীয় লেখক দৃশ্যটি সমাপ্ত করেছেন চলচ্চিত্র-ধর্মী কৌশলের একটি কাটিং-এর কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে। দ্যা ওয়ান্ডারিং রক অধ্যায়ের সঙ্গে লিওপোল্ড ব্লুমের এই অন্তঃসংলাপটির দৃশ্যত কোন সম্পর্ক নেই। এ সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য: "The actual substance of Bloom's monologue here has no relationship to the rest of 'the Wandering Rocks' episode, except possibly to the scene where Stephen Daedalus is also depicted as buying books."[৪৪] দ্যা ওয়ান্ডারিং রক পর্বের আলোচ্য অংশটির মাধ্যমে

লেখক তাঁর পাঠককে লিওপোল্ড ব্লুমের মানসিক অবস্থার একটি বিশেষ দিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন। নির্দিষ্ট করে বললে লিওপোল্ড ব্লুমের অবদমিত কামচেতনাকে লেখক এ অংশে পাঠককের সামনে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য অংশটিতে দেখা যাবে লেখক এখানে শুধু চরিত্রটির চেতনা তুলে ধরেননি। তার চেতনাস্রোত রূপায়ণের পাশাপাশি চরিত্রের চারপাশে ঘটে চলা বিষয়গুলোকেও রূপ দিয়েছেন। আলোচ্য অংশে দেখা যায় লিওপোল্ড যখন পর্ন-পত্রিকা দেখছে তখন এক মহিলার কথোপকথন (A woman's voice behind the dingy curtain. Listen: the man. No: she wouldn't like that much. Got her it once) তার চেতনা বর্ণনার মধ্যে প্রায় নিঃশব্দে প্রবেশ করেছে। এখানে দেখা যাবে লেখক দুটো বিষয়কে একত্রে প্রদর্শন করেছেন মূলত মাল্টিপল-ভিউ নামক কৌশলের মাধ্যমে।

বাংলা কথাসাহিত্যে গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রমুখ কথাসাহিত্যিকের রচনায় টাইম-মন্তাজের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *অন্তঃশীলা* (১৯৩৫) উপন্যাসে টাইম-মন্তাজের প্রয়োগ বিশিষ্টতা দাবি করে। *অন্তঃশীলা*র প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা যায় খগেনবাবুর সামনে মৃত স্ত্রী সাবিত্রীর প্রজ্বলিত চিতা। এসময় বাহ্যিকভাবে খগেনবাবুর চেতনা শান্ত-স্থির। কিন্তু তার ভিতরে একটা ঝড় বয়ে চলেছে। তার বিক্ষুব্ধ চেতনায় বার বার ফিরে আসছে তাদের দাম্পত্য জীবনের শুরুর দিনগুলো :

> কাঠ ক্রমেই ধরে উঠল, প্রথমে ধীরে ধীরে, খানিক পরে জোরে অতি শীঘ্র দাউ দাউ করে। মাথার একরাশ চুল গেল পুড়ে, কী দুর্গন্ধ! যেন উনুনে ফ্যান পড়েছে। সাবিত্রী একবার রাঁধতে গিয়ে উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়ে ফেলে। তবে তার চুল আধখানা বাঁধা ছিল, তাই দেখে খগেন বাবু বলেছিলেন– 'যে রাঁধে সে বুঝি চুল বাঁধে না।' সাবিত্রী ভীষণ রেগে উত্তর দেন, 'এখান থেকে চলে যাও' চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে।...প্রত্যেক অঙ্গ গেল ঝলসে, পুট পুট করে শব্দ হ'তে লাগলো। গা ফেটে জল বেরোচ্ছে।[৪৫]

*অন্তঃশীলা*র এ অংশে স্থান স্থির, কিন্তু সময় পরিবর্তনশীল। যা টাইম-মন্তাজের বিশিষ্ট লক্ষণ। লেখক এখানে ফ্ল্যাশ-ব্যাকের মাধ্যমে খগেনবাবুর অতীতে ফিরে গিয়েছেন। আর অতীতে গিয়ে সাবিত্রী চরিত্রের একটি ক্লোজ-আপ চিত্র ধারণ করেছেন। এ চিত্রটি থেকে আমরা সাবিত্রী চরিত্রের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করি। সাবিত্রীর ক্লোজ-আপের পর লেখক আবার ফিরে এসেছেন বর্তমানে। সাবিত্রীর অতীতে দেয়া নির্দেশ (এখান থেকে চলে যাও) খগেনবাবু কার্যত বর্তমানে পালন করেছে। নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে খগেনবাবুর নাকে কাপড় দিয়ে চলে আসা অতীতে ঘটেনি; ঘটেছে বর্তমানে। প্রকৃতপক্ষে খগেনবাবু সাবিত্রীর চিতার নিকট থেকে চলে এসেছে। বর্তমানের এই রূপায়ণের মাধ্যমে স্থানের স্থিরতা নিশ্চিত হয়েছে। বাংলা কথাসাহিত্যে টাইম-মন্তাজের পাশাপাশি খুব সীমিত আকারে স্পেস-মন্তাজের প্রয়োগ লক্ষ করা যায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) উপন্যাসে। এটির একেবারে শুরুর অংশে স্পেস-মন্তাজের প্রয়োগ দেখা যায়। এই উপন্যাসে লেখক চাঁদপাড়া গ্রামের অধিবাসী যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর চেতনালোক উন্মোচিত করেছেন মূলত অনুচ্চারিত মনোকথনের মধ্যে দিয়ে। ভীতু-অভাবী মুখচোরা আরেফ আলী হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করে এক রক্তাক্ত পরিবেশে। এই আত্ম-আবিষ্কার তার চেতনার বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করে ঘূর্ণাবর্তের, যা লেখক খুব দক্ষতার সঙ্গে রূপায়ণ করেছেন। উপন্যাসের শুরু হয়েছে এভাবে :

> শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাত, তখনো কুয়াশা নাবে নাই। বাঁশঝাড়ে তাই অন্ধকারটা তেমন জমজমাট নয়। সেখানে আলো-অন্ধকারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি যুবতী নারীর অর্ধ-উলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়। অবশ্য কথাটা বুঝতে তার একটু দেরি লেগেছে, কারণ তা ঝট্ করে বোঝা সহজ নয়। পায়ের ওপর এক ঝলক চাঁদের আলো। শুয়েও শুয়ে নাই। তারপর কোথায় তীব্রভাবে বাঁশি বাজতে শুরু করে। যুবতী নারীর হাত-পা নড়ে না। চোখটা খোলা মনে হয়, কিন্তু সত্যিই হাত-পা নড়ে না। তারপর বাঁশির আওয়াজ সুতীব্র হয়ে ওঠে।[৪৬]

যুবতীর মৃতদেহ দেখে আরেফ আলী হতবাক হয়ে যায় এবং জ্ঞানশূন্য হয়ে মাঠের দিকে ছুটতে থাকে। লেখক আরেফ আলীর চেতনাস্রোতের সেই অবস্থাটি তুলে ধরেছেন এভাবে:

> তখন থেকে সে উদভ্রান্তের মতো ছুটাছুটি করছে। হয়তো এক প্রহর হলো ছুটাছুটি করছে। চরকির মত, লেজে কেরোসিনের টিন বেঁধে দিলে কুকুর যেমন ঘোরে তেমনি। কেন তা সে বলতে পারবে না। কেবল একটা দুর্বোধ্য নির্দয় তাড়না বোধ করে বলে দিশেহারা হয়ে অবিশ্রান্তভাবে মাঠে-ঘাটে ছুটাছুটি করে, অফুরন্ত জ্যোৎস্নালোকে কোথায়ও গা-ঢাকা দেবার স্থান পায় না, আবার ছায়াচ্ছন্ন স্থানে নিরাপদও বোধ করে না। গভীর রাতে এমন দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পশ্চাদ্ধাবিত অসহায় পশুর মত সে জীবনে কখনো ছুটাছুটি করে নাই। অবশ্য গ্রামবাসী অনভিজ্ঞ যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহও কখনো দেখে নাই।[৪৭]

এই বর্ণনার পর লেখক ফিরে এসেছেন পূর্বকথায়। যুবক শিক্ষক শারীরিক প্রয়োজনে রাতে বাইরে গিয়েছিল। সেখানে সে বাঁশঝাড়ে প্রথমে আবিষ্কার করে কাদেরকে তারপর অর্ধউলঙ্গ যুবতীর মৃত দেহ। এরপর যুবক শিক্ষক দৌড়াতে শুরু করে। পূর্ব কথার পর লেখক আবার ফিরে এসেছেন এই দৌড়ানোর প্রসঙ্গে:

> তারপর হঠাৎ যুবক শিক্ষকের মাথায় বিপুলবেগে একটা অন্ধ ঝড় ওঠে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে বুঝতে পারে না কী করবে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে শুরু করে। তার সমস্ত চিন্তাধারা যেন হঠাৎ বিচিত্র গোলক-ধাঁধায় ঢুকেছে এবং সে গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে দৌড়াতে শুরু করে কিন্তু কোথাও মুক্তিপথের নির্দেশ দেখতে পায় না। সে দৌড়াতেই থাকে। যুবক শিক্ষক জ্যান্ত মুরগি-মুখে হাল্কা তামাটে রঙের শেয়াল দেখেছে, বুনো বেড়ালের রক্তাক্ত মুখ দেখেছে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট মহামারী-হাহাকার দেখেছে, কিন্তু কখনো বিজন রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখে নাই। হত্যাকারী দেখে নাই। সে ছুটতেই থাকে।[৪৮]

চাঁদের অমাবস্যা উপন্যাসের আলোচ্য অংশটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যুবক শিক্ষকের চেতনার অবস্থান একটি স্থির সময়ে। সেটি শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাত কিন্তু তার চেতনা এই স্থির সময়ে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেছে। প্রথমে তার অবস্থান বাঁশঝাড়ে, সেখানে আমরা দেখলাম যুবক শিক্ষক আরেফ আলী যুবতীর মৃতদেহ দেখে বিচলিত। এরপর উদ্‌ভ্রান্ত আরেফ আলী নিজেকে আবিষ্কার করেছে লাঙল দেয়া জমির আইলের ওপর। তারপর সে নিজেকে খুঁজে পায় মাটির দলার ওপর; বিশাল বট গাছের ছায়ায় এবং সর্বশেষ তার নিজ ঘরে। নিজ ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে তার চেতনায় আবার ফিরে আসে বাঁশঝাড়ের আলো-আঁধারি, যুবতীর মৃতদেহ ও কাদেরের পথ চলার স্থানিক চিত্র। সময়কে স্থির রেখে লেখক *চাঁদের অমাবস্যায়* আরেফ আলীর চেতনাকে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়েছেন আর এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে স্পেস-মন্তাজ।

বিরামচিহ্ন সন্নিবেশ (punctuation)

চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের শিল্পী উপর্যুক্ত কৌশলগুলোর পাশাপাশি আরো একটি গৌণ-কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন। এ কৌশলটি মূলত চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-র

বহিরঙ্গ সম্পর্কিত। চেতনার অসংলগ্ন-অংসগঠিত-প্রায়সংগঠিত-বিচ্ছিন্ন রূপ বা টেক্সচার পাঠকের কাছে দৃশ্যমান করতে তাঁরা অনিয়মিতভাবে বিরামচিহ্নের প্রয়োগ করেন। বিরামচিহ্নের অনিয়মিত প্রয়োগের পাশাপাশি অনুচ্ছেদ সজ্জা, লাইন সজ্জা এবং লাইনের মধ্যে শব্দের অভ্যন্তরীণ দূরত্ব নির্ণয়ে বৈচিত্র্য নিয়ে আসেন। তাঁদের এ প্রচেষ্টার ফলে চেতনার খাপছাড়া-অমসৃণ-অসংগঠিত রূপটি ছাপার হরফে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

বিরামচিহ্নের অনিয়মিত প্রয়োগ বা শব্দ-লাইন-অনুচ্ছেদ সজ্জার বৈচিত্র্য বিষয়ে জেমস জয়েস একজন সচেতন শিল্পী। তিনি *Ulysses* উপন্যাসে এক্ষেত্রে সাফল্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছেন। এ উপন্যাসের পেনলোপি অধ্যায়ে দেখা যায় তিনি মলি ব্লুমের চেতনার দ্রুত ও ধারাবাহিক পরিবর্তন নির্দেশ করতে গিয়ে কোন বিরামচিহ্নের প্রয়োগ করেননি। আলোচ্য অংশে নিদ্রা প্রত্যাশী-বিনিদ্র মলি ব্লুমের চেতনাস্রোত খুব দ্রুত প্রবাহিত হয়েছে। ফলে চেতনার বিষয় দ্রুত পরিবর্তন হয়ে গেছে। চেতনা দ্রুত বিষয় পরিবর্তন করায় দুটি চেতনার মধ্যে যে সময় পার্থক্যের কথা উইলিয়াম জেমস বলেছেন তা মলি ব্লুমের চেতনায় কার্যত বিলীন হয়ে গিয়েছে। ফলে একটি চেতনার সঙ্গে অন্য চেতনা সংলগ্ন হয়ে পড়েছে। সংগত কারণে এতে বিরামচিহ্নের প্রয়োগ করলে মলি ব্লুমের চেতনার প্রবহমানতা ও স্বতঃস্ফূর্ত রূপটি ব্যাহত হতো। বস্তুত জেমস জয়েসের এ ধরনের অনিয়মিত বিরামচিহ্নের প্রয়োগ মলি ব্লুম চরিত্রের সেই বিশেষ সময়ে চেতনার অন্তর্ধর্মের বাহ্যিক প্রকাশ। পেনলোপি অধ্যায়ের বিরামচিহ্ন হীনতা কোনো আরোপিত বিষয় নয়। তা স্বতঃস্ফূর্ত এবং চেতনার অন্তর্প্রকৃতিজাত বিষয়। জেমস জয়েস কর্তৃক বিরামচিহ্নের অনিয়মিত প্রয়োগ সমকালীন ও পরবর্তীকালের লেখক-সমালোচকদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বিরামচিহ্ন হীনতা চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের মুখ্য লক্ষণ; এমন ভ্রান্তধারণার বশীভূত হয়ে অনেকেই এ জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে মার্কিন কথাসাহিত্যিক ওয়াল্ডো ডেভিড ফ্র্যাঙ্ক (১৮৮৯-১৯৬৭)-এর নাম স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর *Rebah* (১৯২২) উপন্যাসে দেখা যায় তিনি চেতনার অন্তর্ধর্মকে পাশ কাটিয়ে চেতনার বহিরঙ্গ সজ্জায় অর্থাৎ বিরামচিহ্নের বিচিত্র প্রয়োগের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অধিক মনোযোগী। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফল বিরামচিহ্ন বিহীন *Rebah* নামক একটি উপন্যাস। বস্তুত অনিয়মিত বিরামচিহ্নের প্রয়োগ চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের একটি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য। শুধু এ বৈশিষ্ট্যের আলোকে একটি কথাসাহিত্যকে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করা যৌক্তিক নয়।

অনিয়মিত বিরামচিহ্নের পাশাপাশি অনিয়মিত লাইন ও শব্দ সজ্জার মাধ্যমে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের লেখক চেতনার বিষয় পরিবর্তন, অসমাপ্ত ভাবনা, একটি ভাবনার মধ্যে অন্য ভাবনার অনুপ্রবেশ প্রভৃতি নির্দেশ করার চেষ্টা করেন। ডরোথি রিচার্ডসনের *Pilgrimage* উপন্যাসে এ ধরনের অনিয়মিত লাইন ও শব্দ সজ্জা দেখা যায়। বর্তমান আলোচনায় উপন্যাসটির প্রথম খণ্ড (Pointed Roofs)-এর যে অংশটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তাতে শব্দ ও লাইন সজ্জার এ বৈচিত্র্য দেখা যায়। চেতনায় কখনো কখনো কোনো কোনো বিষয় খুব ধীর গতিতে আসে। আবার কখনো চেতনার কোনো একটি অংশের বিষয়বস্তু এত অস্পষ্ট হয় যে তা অনুধাবন করা যায় না।

সেই অস্পষ্ট ভাবনাটি যখন ভাষায় প্রকাশ করা হয় তখন একটি বাক্যের মধ্য থেকে কোনো কোনো শব্দ বাদ পড়ে যায়। চেতনার এ রূপটি দৃশ্যমান করতে ডরোথি রিচার্ডসন অনিয়মিত লাইন ও শব্দ সজ্জার আশ্রয় নিয়েছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে এ জাতীয় লাইন ও শব্দ সজ্জার নিদর্শন পাওয়া যায় গোপাল হালদার ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রচনায়। তাঁদের *একদা* ও *অন্তঃশীলা* উপন্যাসে এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে আমরা বর্তমান আলোচনায় উদ্ধৃত অমিতের স্বপ্ন চেতনাটির কথা স্মরণ করতে পারি। গোপাল হালদার উল্লিখিত অংশে অমিতের চেতনার খণ্ড খণ্ড রূপ দৃশ্যমান করার জন্য ডট, ড্যাস, তারকা চিহ্নের ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া পূর্ণাঙ্গ-অপূর্ণাঙ্গ প্রতিটি ভাবনার জন্য একটি লাইন নির্দিষ্ট রেখেছেন। তাঁর এ জাতীয় লাইন সজ্জার ফলে আলোচ্য অংশটি বাহ্যিকভাবে কবিতা সদৃশ হয়ে উঠেছে এবং চেতনার টেক্সচারকে সাহিত্যের পাতায় মূর্ত করে তুলেছে।

চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-র বহিরঙ্গ নির্মাণে ভার্জিনিয়া উলফের উপন্যাসে প্যারেনথিসিসের (parentheses) প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তাঁর কথাসাহিত্যে প্যারেনথিসিসের এই প্রয়োগ ছিল যথেষ্ট কার্যকর ও স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর প্যারেনথিসিসের প্রয়োগ কার্যকর; কারণ, এর দ্বারা চেতনার যে প্রবহমানতা তা পাঠকের কাছে খুব স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয়েছে। আর সেই প্রয়োগ স্বতঃস্ফূর্ত; কারণ, ভার্জিনিয়া উলফের উপন্যাসে প্যারেনথিসিসের প্রয়োগ বিষয়ের দাবি, তা কোনো আরোপিত বিষয় নয়। *To the Light house* উপন্যাসে তিনি সীমিত আকারে প্যারেনথিসিসের প্রয়োগ করেছেন। এখানে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মিসেস রামসের একটি অন্তর্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। মিসেস রামসে অতিথিদের ডিনারে আপ্যায়ন করার জন্য খাবারের টেবিলে বসেছে। এসময় একটি ব্যক্তিগত সমস্যা তাকে আত্মমগ্ন করে ফেলেছে। হঠাৎ সে সংবিৎ ফিরে পেয়ে শোনে উইলিয়াম ব্যাংকস নামে একজন অতিথি স্যার ওয়াল্টার স্কট (১৭৭১-১৮৩২)-এর উপন্যাসের প্রশংসা করছে :

> He read one of them every six months, he said. And why should that make Charles Tansley angry? He rushed in (all, thought Mrs Ramsay, because Prue will not be nice to him) and denounced the Waverly novels when he knew nothing about it, nothing about it whatsoever.[৪৯]

আলোচ্য অংশে প্যারেনথিসিসের প্রয়োগ (all, thought Mrs Ramsay, because Prue will not be nice to him) স্পষ্টভাবেই চেতনার স্তর পরিবর্তন নির্দেশ করেছে। যদিও চেতনার দুটি স্তরের পার্থক্য এখানে উল্লেখযোগ্য নয়। তবে এটি যে চেতনার স্তর পরিবর্তন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চেতনার এ স্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে চেতনাস্রোতের সামগ্রিক রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফলে প্যারেনথিসিসের এ প্রয়োগ আলোচ্য অংশটিতে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে।

বর্তমান আলোচনায় চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের প্রযুক্ত কৌশলগুলো বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই কৌশলগুলো এককভাবে কোনো একটি কথাসাহিত্যে প্রয়োগ হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত খুব একটা পাওয়া যায় না (ব্যতিক্রম: উইলিয়াম ফকনারের *As I Lay Dying*)। বরং একাধিক কৌশলের মিলিত প্রয়োগের ফলে সৃষ্টি করা গেছে কালজয়ী চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্য। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য, জেমস জয়েসের

*Ulysses,*ভার্জিনিয়া উলফের *Mrs Dalloway* ও *To the Light House,* ডরোথি রিচার্ডসনের *Pilgrimage,* সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *কাঁদো নদী কাঁদো*, গোপাল হালদারের *একদা*, সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *অন্তঃশীলা* প্রভৃতি উপন্যাসের নাম। যেগুলোতে একাধিক কৌশলের মিলিত প্রয়োগ করা হয়েছে।

শেষকথা

আমাদের বর্তমান আলোচনায় সাহিত্য-কৌশল হিসেবে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-র মুখ্য প্রবণতাগুলো বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয়েছে এ ধারার প্রধান লেখকদের রচিত কথাসাহিত্য। এতে দেখা গেছে, চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্য বা সাহিত্যিক চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-র দুটি দিক রয়েছে। একটি বিষয়গত, অন্যটি গঠনগত। সাহিত্যিক চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের বিষয় চেতনার অসংগঠিত-প্রায় সংগঠিত-অসংলগ্ন-আপাত বিচ্ছিন্ন রূপ। যা কোমা ও এক্সাইটমেন্ট এই দুই বিন্দুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এ জাতীয় কথাসাহিত্যে লেখকের বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ লেখক যদি সাহিত্যিক চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ সৃষ্টি করতে চান তবে তাকে অবশ্যই চেতনার প্রবাহকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অপরদিকে গঠনগত দিক দিয়ে লেখক অনেক বেশি স্বাধীন। লেখক চেতনার প্রবাহকে প্রচলিত-অপ্রচলিত, পরিমার্জিত বা স্ব-উদ্ভাবিত যে কোনো কৌশলে সাহিত্যে উপস্থাপন করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান কর্তব্য সচেতনভাবে নিজেকে সাহিত্যের মধ্যে অনুপস্থিত বা প্রায় অনুপস্থিত রাখা। পাশাপাশি চরিত্রের চেতনাস্রোত যেন অবিকৃতভাবে মূর্ত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা। বর্তমান আলোচনায় এক্ষেত্রে প্রযুক্ত কিছু কৌশলের উল্লেখ করা হয়েছে। যা সাহিত্যিক চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-র দিকপাল স্রষ্টারা ব্যবহার করেছেন। অনাগত দিনে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-ধর্মী কথাসাহিত্যের লেখকরা যে উল্লিখিত কৌশলগুলোই ব্যবহার বা গ্রহণ করবেন এমন নয়। তাঁরা প্রচলিত, পরিমার্জিত বা স্ব-উদ্ভাবিত যে কোনো কৌশলে প্রবহমান চেতনাস্রোতকে মূর্ত করে তুলতে পারেন।

সাহিত্যিক চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ লেখার মাধ্যমে সৃষ্ট একটি কৃত্রিম চেতনাস্রোত তথা একটি বিশিষ্ট সাহিত্যকৌশল। প্রায় সব লেখকের সৃষ্ট সাহিত্যিক চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ দুটি ভিন্ন ধারার চেতনার সম্মিলিত রূপ। এর একটি ধারা হলো সাহিত্যের প্রধান বা অপ্রধান চরিত্রের চেতনা। অন্যটি সাহিত্যিক চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-র স্রষ্টা লেখকের চেতনা। যদিও আমরা জানি, এই দুটি ধারার উৎসভূমি এক ও অভিন্ন অর্থাৎ লেখকের চেতনা। কারণ, লেখকের সচেতন মনই সৃষ্টি করে সাহিত্যিক চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ। লেখকের সচেতন মন সযত্নে এই কৃত্রিম চেতনাস্রোত সৃষ্টি করলেও তাকে নিজ চেতনার নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ তাকে খেয়াল রাখতে হয়, তাঁর ব্যক্তিচেতনা যেন চরিত্রের চেতনাস্রোতে মিশে না যায়। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সাহিত্যিক চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ লেখকের চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ না হয়ে একটি সম্ভাব্য পরিবেশ-পরিস্থিতিতে, একটি সম্ভাব্য চরিত্রের চেতনাস্রোত রূপে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হয়।

চেতনা ব্যক্তি-সংলগ্ন। কিন্তু ব্যক্তি সংলগ্ন হলেও ব্যক্তির পক্ষে সব সময় নিজ চেতনাস্রোত অনুভব ও অনুসরণ করা সম্ভব নয়। এমনকি কখনো কখনো তা অসম্ভব। সাহিত্যিক চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ পাঠক তথা ব্যক্তিকে গ্রন্থের পাতায় একজন মানুষের চেতনাস্রোত অনুভব, অনুসরণ এমনকি প্রতীকী অর্থে প্রবাহিত হতে দেখার অভিজ্ঞতা দান করে। এতে পাঠক চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে নিজ চেতনাস্রোতের প্রবাহ অনুভব করার সুযোগ লাভ করে। মূলত পাঠককে এ অভিজ্ঞতা দান এবং সেই মনোবৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব, যাতে বলা হয়েছে মানুষের প্রকৃত চরিত্র লুকায়িত আছে তার অন্তর্জীবনে বা চেতনাস্রোতের মধ্যে, তাকে সাহিত্যে মূর্ত করার মানসে সাহিত্যিক চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ-র উদ্ভব ও বিকাশ।

তথ্যনির্দেশ

১. Bernard S. Cayen (Editorial Director) *Encyclopedia Americana*, Vol. 25 (Danbury, Connecticut-06816, Grolier incorporated, 1984), p. 787

২. Robert Humphrey, *Stream of consciousness in the modern novel* (Berkeley and Los Angeles, University of California press, 1962), p. 1

৩. Bertrand Russell*, The analysis of mind*, (London: Georgea Allen and Unwin Ltd., 1968), p. 10

৪. Ibid, p. 12

৫. নীহাররঞ্জন সরকার, মঞ্জুরুল হক ও আবদুল খালেক, *মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস ও মতবাদ* (ঢাকা: ঢাকা বুক কর্পোরেশন, ১৯৯২), পৃ.২৯১

৬. Ned Block, "Concepts of Consciousness", *Philosophy of mind: classical and contemporary reading*, Edited: David Chalmers (Oxford: Oxford University press, 2002), p. 206

৭. William James*, The Principles of psychology*, Vol. 1, (London: Macmillan and Co. Ltd, 1891), p. 245

৮. Ibid, p. 224

৯. Ibid, p. 225

১০. Ibid, p. 237

১১. Pery London, *Beginning Psychology* (Illinois: The Dorsey Press, Home wood, 1978), p. 298

১২. John Mepham, "Stream of consciousness". *The Literary Encyclopedia*. First published 17 October 2003 [https://www.litencyc.com/php/stopics.php?rec=true&UID=1062, accessed 2 April 2021.]

১৩. Robert Humphrey, op. cit., pp. 3-4

১৪. Ibid, p.23

১৫. James Joyce, *Ulysses*, Penelope, The Project Gutenberg eBook, First Published December 27, 2001
[https://www.gutenberg.org/files/4300/4300-h/4300-h.htm, accessed 10 April 2021.]

১৬. Robert Humphrey, op. cit., p. 29

১৭. সতীনাথ ভাদুড়ী, *জাগরী* (প্রকাশ ভবন, ১৩৯০), পৃ. ১৫১

১৮. James Joyce*, Ulysses*, Nausicaa, op. cit.

১৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *কাঁদো নদী কাঁদো*, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-১, সম্পা: সৈয়দ আকরম হোসেন (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ২৩৬

২০. গোপাল হালদার, *একদা*, গোপাল হালদার রচনা সমগ্র-১, সম্পা: অমিয় ধর (কলিকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি:, ২০০০), পৃ. ৮৩
২১. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *মনঃসমীক্ষা*, অনুবাদ: আব্দুল গনি হাজারী (অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০০২), পৃ. ৫৪
২২. গোপাল হালদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০
২৩. Dorothy Richardson, *Pilgrimage,* The pointed Roofs (New York: Alfred A. knopf, 1938), pp. 194-195
২৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১-২০২
২৫. John Mepham, op. cit.
২৬. Virginia Woolf, *The common reader* (New York, Harcourt, Brace, 1925), p. 213.
২৭. Virginia Woolf, *Mrs. Dalloway* (London, Penguine Books limited, 1996), p. 5
২৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, "নয়নচারা", *গল্প সমগ্র*, সম্পা: হায়াৎ মামুদ (প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৬), পৃ. ৩
২৯. Kathlen Mirner-Ralph Rausch (Edited), *NTC'S dictionary of literary terms* (Lincolnwood, Illinois, USA, NTC. Publising group), p.206.
৩০. Willam Faulkner, *As I Lay Dying,* (London: Random House, Vintage, 1996), p. 11
৩১. গোপাল হালদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬
৩২. Robert Humphrey, op. cit, p.43
৩৩. James Joyce, *Ulysses,* Penelope, op. cit.
৩৪. Ibid
৩৫. Ibid
৩৬. Ibid
৩৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, "নয়নচারা", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩-৪
৩৮. David Daiches, *Virginia Woolf* , (Norfolk, Conn, New Directions, 1942), p.66
৩৯. Robert Humphrey, op.cit, p. 49
৪০. Henri Bergson, *Time and free Will*, Translation: F. L. Pogson (London: George Allen & Company Ltd, 1913), p. 195
৪১. Shiv k Kumar, *Bergson and the stream of consciousness novel* (London and Glasgow: Blackie and son limited, 1962), p. 9
৪২. David Daiches, op. cit, p. 66
৪৩. James Joyce, *Ulysses*, The wandering Rock, op. cit.
৪৪. Robert Humphrey, op. cit, p. 54
৪৫. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, "অন্তঃশীলা", *ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী*-১ম খণ্ড, সম্পা: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০২) পৃ. ৭৫-৭৬
৪৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *চাঁদের অমাবস্যা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫
৪৭. তদেব
৪৮. তদেব, পৃ. ১০২
৪৯. Virginia Woolf, *To the Lighthouse,* (Delhi: Surjeet Publications, 1991), p. 98

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/জুন ২০২১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রাশিয়ার চিঠি* : বিপ্লবোত্তর রাশিয়া-দর্শন

মো. সোহানুজ্জামান*

সারসংক্ষেপ

১৯১৭ সালের শেষদিকে রাশিয়ায় সংঘটিত হয় রুশ বিপ্লব। তার বেশ ক'বছর পর, ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই ভ্রমণে রাশিয়াকে যেভাবে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাই লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর *রাশিয়ার চিঠি*তে; তবে তা অবশ্যই গভীর বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্য নিয়েই। এই প্রবন্ধে মূলত রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবোত্তর রাশিয়া ভ্রমণের সারাৎসার তুলে ধরা হবে। দেখানো হবে কীভাবে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা বদলে গেছে; এবং সেই বদলে যাওয়া রাশিয়া কীভাবে আগাগোড়া পর্যবেক্ষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এককভাবে যে রাশিয়াকেই দেখেছেন এমন নয়, রাশিয়া দেখার সাথে সাথে তিনি তুলনা করেছেন ভারতবর্ষের সমস্যা ও সঙ্কটকে–সে বিষয়েও আলোচনা করা হবে এই প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) সব্যসাচী লেখক। লেখেননি এমন বিষয় নেই; আর তার পরিমাণও নিতান্ত কম নয়, বিপুল। শুধু লেখেননি মহাকাব্য, আসলে তা লেখার যুগ সে সময় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তাঁর ভ্রমণসাহিত্য। ভ্রমণসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনোপলব্ধি প্রতিফলিত হয়েছে ভিন্নমাত্রায়। ভ্রমণসাহিত্য রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ সময় ও বয়সের হিসেবেও প্রাজ্ঞতায় ভরপুর। সে কারণেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-মানসের পরিপূর্ণ অবস্থা খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর ভ্রমণসাহিত্যে। বলে রাখা জরুরি যে, রবীন্দ্রনাথ যেসব ভ্রমণসাহিত্য রচনা করেছেন তার মধ্যে নানামাত্রিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ *রাশিয়ার চিঠি* (১৩৩৮)।

রবীন্দ্রনাথ নানা কারণে নানা সময়ে ইউরোপ ভ্রমণ করেছেন। এরই মাঝে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লব সমগ্র বিশ্বকে আলোড়িত করেছে; সেই আলোড়ন থেকে রবীন্দ্রনাথও মাফ পাননি। যতোটা হতাশ রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, তাঁর উদারনৈতিক আর মানবতাবাদী বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থল ইউরোপের সংঘাত দেখে, ঠিক ততোটাই আশায় বুক বেঁধেছেন রুশ বিপ্লব আর রাশিয়ার জাগরণে। তাই দীর্ঘদিন যাবৎ রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণের ব্যাপারে বেশ আগ্রহী ছিলেন। এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণ করেন। কিন্তু এই আমন্ত্রণ এবং রাশিয়া ভ্রমণের ব্যাপারে কেউ কেউ অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন।

> ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে কবি যখন জেনেভায় বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন তখন তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্যে অনেকেই তাঁকে রাশিয়া ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছিলেন। অবশ্য এই নিষেধের পিছনে ছিল কবির ইংরাজ বন্ধুবান্ধবের স্বার্থপরতা। কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের মত একজন মহামানব সে দেশ স্বচক্ষে

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী।

দেখার পর তার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করলে সমগ্র বিশ্বের বুদ্ধিজীবী সমাজে তার প্রভাব কতখানি পড়বে।[১]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেসব কথা অগ্রাহ্য করে নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি রাশিয়া ভ্রমণ করবেন; এবং তিনি তা করলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়া ভ্রমণ করলেন তখন জারের শাসনের পতন হয়েছে, এবং শাসন-ক্ষমতায় রয়েছে বলশেভিকরা। এটা স্মরণ রাখা জরুরি, *রাশিয়ার চিঠি* পাঠের বেলায়। কারণ শাসক এবং শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে আগের রাশিয়ার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। রাশিয়ার জারতন্ত্রের বদলে সেখানে নতুন যে সরকার গঠিত হয়েছে, তারা মূলত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। আর উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায়ও দেখা গেছে নানা পরিবর্তন। পূর্বের শ্রম-বিভাজিত এবং শ্রেণি-বিভাজিত রাশিয়া আর তখন নেই। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দিক থেকে সমতা বিধানের তোড়জোড় যেমন চোখে পড়ে, তেমনি করে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিক্ষেত্রেও সমতা বিধানের তোড়জোড়ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বিশেষভাবে। পুরো রাশিয়াই যেন নতুন এক কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যার নেতৃত্বে কেউ কেউ আছেন; তবে পুরো রাশিয়ার আপামর জনগণ এই কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছে একসাথে। ঠিক সেই সময়েই রাশিয়া গেলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; যা দেখলেন তাই উপস্থাপন করলেন *রাশিয়ার চিঠিতে*, আর বিশ্লেষণ তো করলেনই; সাথে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ যে কোনো বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো *রাশিয়ার চিঠিতে*ও ভবিষ্যদ্বাণী করলেন রাশিয়া ও রাশিয়ার জনগণসহ নানা বিষয়ে। যার ফলাফল সম্পর্কে তো আর আমাদের এখন জানতে বাকি নেই। সেই দেখা বিশ্লেষণ আর ভবিষ্যদ্বাণীর সংবৃত্ত রূপ *রাশিয়ার চিঠি*।

রুশ বিপ্লব সমগ্র বিশ্বকে আলোড়িত করেছিল। এই আলোড়ন রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, রাশিয়ায় ভ্রমণের আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। 'কিন্তু ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদি দেশের ধনগরিমা এবং ভোগবাদী জীবনাচরণেও তিনি মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না।'[২] এবং এই যান্ত্রিকতা ও পুঁজিবাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখে ফেলেন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দুটি নাটক–*মুক্তধারা* (১৯২২) ও *রক্তকরবী* (১৯২৪)। এই দুটি নাটক তাঁর ইউরোপ দেখার দুঃসহ স্মৃতি আর অনুভবের প্রকাশই বটে। আর ইউরোপ ভ্রমণের পর-পরই রবীন্দ্রনাথ গেলেন রাশিয়ায়। মেলালেন, তুলনা করলেন ইউরোপের সাথে; একইসাথে তুলনা করলেন ভারতের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার সাথে রাশিয়ার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার। সেই তুলনায় ইউরোপের ভাবাদর্শগত মতবাদ, যে মতবাদ দ্বারা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন, অনেকাংশেই গ্রহণযোগ্যতার বিবেচনায় বাতিল হয়ে যায় রাশিয়ার নবোদ্ভিন্ন ভাবাদর্শের কাছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়ায় গিয়েছিলেন ১৯৩০ সালে। বিপ্লব-পূর্ববর্তী রাশিয়ার সাথে তার তফাৎ অনেক। কারণ ১৯১৭ সালে সংঘটিত 'অক্টোবর বিপ্লব' রাশিয়াকে পুরোপুরি নতুন করে

নির্মাণ করেছে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দিক থেকে খোলনলচে বদলে গেছে রাশিয়ার। এর জন্য যে রাশিয়ার কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এমন না; হয়েছে, বিপুল ক্ষতি হয়েছে। আর রাশিয়া সেই সময় ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য, যার সীমানা ছিল বৃহৎ।

> The Russian Empire at the time of the Revolution was a land of glaring contrasts. It was the largest land–empire in the world. From the heart of eastern Europe to the Pacific coast, and from the Arctic Ocean to the deserts of Central Asia and the Chinese borders, it sprawled—like the Soviet Union after it—over an area which covers roughly one-sixth of the earth's total land surface. A mismatch of territories and population, however, meant that where as more than two-thirds of the country lay east of the Ural mountains in the vast, frozen expanses of Siberia, the bulk of the population resided and worked in the European provinces of Russia, Ukraine, Byelorussia, Poland (which was then an integral part of the Empire) and the Caucasus. The first Russian ruler to style himself Emperor (as distinct from tsar) was Peter I (Peter the Great, r. 1696–1725). The realm which he inherited from his seventeenth-century Muscovite forebears was already of considerable dimensions across the Eurasian landmass, but it was his most enduring achievement to establish Russia's presence as the dominant power in northern and eastern Europe as a result of his victory over Sweden in the Great Northern War (1700–21).[৩]

রাশিয়ার এই বৃহৎ সাম্রাজ্যে সাধারণ মানুষের যে অবস্থা এবং পরিস্থিতি তা কারো কাছে অজানা নয়। কারণ নানাদিক থেকে রাশিয়ার জারতন্ত্রের শাসন-কাঠামো ছিল নির্দয় আর ভীষণমাত্রায় শোষণ ও নিপীড়নমূলক। ফিউদর দস্তয়ভস্কি (১৮২১-১৮৮১), লিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০), মাক্সিম গোর্কির (১৮৬৮-১৯৩৬) উপন্যাস পাঠে যে বাস্তব চিত্র উঠে আসে তা কোনো 'ইউটোপিয়ান' সমাজের চিত্র নয়, তা বাস্তবতারই প্রতিফলন; আর সাহিত্য তো সমাজের প্রতিফলনই বটে। যদিও মাঝে-মধ্যে তলস্তয়ের এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। কারণ তলস্তয় নিজেই ঐ শোষকদের বর্গভুক্ত ছিলেন। তলস্তয়ের *পুনরুজ্জীবন* (১৮৯৯) উপন্যাসে এ বিষয় স্পষ্ট হয়; যদিও এই উপন্যাস অনেকটা তলস্তয়ের কনফেশন। তবুও *যুদ্ধ ও শান্তি* (১৮৬৫-৬৯) উপন্যাস প্রসঙ্গে তলস্তয়ের নিবেদনের কিছু অংশ তুলে দেওয়া যাক।

> দ্বিতীয়ত, সমকালীন বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থের প্রথমাংশ প্রকাশিত হওয়ার পর কোনও কোনও পাঠক অভিযোগ করে বলেন যে, আমার বইয়ে এই বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি। এ অভিযোগের উত্তরে আমার বক্তব্য : এই সময়কালের কোনো বৈশিষ্ট্য লোকে আমার উপন্যাসে খুঁজে পায় না তা আমি জানি–ভূমিদাসত্বের ভয়াবহতা, পত্নীদের গৃহবন্দিত্ব, প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে বেত্রাঘাত, সাল্‌তিকোভো (ধনী জমিদার দারিয়া নিকলায়েভ্‌না সাল্‌তিকোভো; তার ছিল ছ'শ ভূমিদাস; তার উৎপীড়নে সাত বছরে একশ' ত্রিশজন ভূমিদাসের মৃত্যু হয়) ইত্যাদি। কিন্তু তৎকালীন এসব বৈশিষ্ট্য কল্পনাতেই সত্য, বাস্তবে সেগুলি আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি না, এবং সেগুলিকে নতুন করে উল্লেখও করতে চাই না।[৪]

তলস্তয় এমন সাফাই গাইবেন এ আর এমন কী; তলস্তয় তো শ্রেণি-অবস্থানের দিক থেকে এই দলেরই লোক। কিন্তু ফিউদর দস্তয়ভস্কি, কিংবা মাক্সিম গোর্কি এ ব্যাপারে তলস্তয়ের ঠিক বিপরীতে অবস্থান করছেন। এমনকি তলস্তয় নিজেও শেষ জীবনে লেখা *পুনরুজ্জীবনে* তাঁর *যুদ্ধ ও শান্তি*-এর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দর্শনকে খানিকটা হলেও বাতিল করে দিয়েছেন, নেখলিউদভ চরিত্রের গভীরপাঠ সেই কথারই জানান দেয়। এত কথা বলার কারণ হলো, রাশিয়ার বিপ্লব-পূর্ববর্তী সমাজকে চেনা। কারণ বিপ্লব-পরবর্তী সমাজ-কাঠামোর বিশ্লেষণে পূর্বের অবস্থা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি কবিতা-পাঠও সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে টি. এস. এলিয়ট বলছেন :

> No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You cannot value him alone; you must set him, for contrast and comparison, among the dead. I mean this is a principle of aesthetic, not merely historical criticsm.[৫]

এলিয়ট শুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক এবং আধুনিকতাবাদী, *ক্রাইটেরিয়ন* পত্রিকার সম্পাদক; এই পত্রিকা আধুনিকতাবাদী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। তিনি উদ্ধৃত অংশে বলছেনও যে তিনি পূর্ববর্তী ইতিহাসের বিষয়কে নন্দনতত্ত্বের হিসেবে আলোচনা করতে আগ্রহী, ঐতিহাসিক বিবেচনায় নয়। কিন্তু এই আলোচনায় ব্যাপৃত থাকা হবে ইতিহাসের সাথে যোগসূত্র রেখেই। রবীন্দ্রনাথের *রাশিয়ার চিঠি* আলোচনার আগে একবার রাশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসের পর্ববিভাগ সম্পর্কে জেনে নেওয়া দরকার। কারণ কোন ইতিহাস-পর্বে এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিত, তা স্পষ্ট হওয়া জরুরি। এর জন্য সাহায্য নিতে হবে একটা কোষগ্রন্থের। আর এই সাহায্য নেওয়া হয়েছে সাহিত্যের ইতিহাসের হিসেবের সূত্র ধরেই।

> সমাজবিকাশের ইতিহাসের যোগসূত্রে রুশ সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রাথমিকভাবে চার–এমনকি পাঁচটি বড়ো পর্বে ভাগ করা যেতে পারে:
> প্রাচীন যুগ–দশম শতাব্দীতে রুশদেশে লিপির উদ্ভবকাল থেকে ষোড়শ শতাব্দীর সমাপ্তিকাল।
> মধ্যযুগ– সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহামতি পিয়োতর (বহির্বিশ্বে 'পিটার দি গ্রেট' নামে যাঁর পরিচয়) প্রবর্তিত সংস্কারপর্ব পর্যন্ত।
> আধুনিক যুগের সূচনাপর্ব–সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল।
> আধুনিক যুগ: বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে
> ক) সোভিয়েত পর্ব–১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব থেকে বিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক।
> খ) উত্তর সোভিয়েত পর্ব।[৬]

এই পর্ব-বিভাজনের নানাবিধ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, রাশিয়ার ইতিহাসের একটা খসড়া তৈরি করা। কারণ কোনো দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না জানলেও সেই দেশের ইতিহাসের একটা খসড়া জানা আবশ্যক; যে কোনো আলোচনায় গিয়ে। আর এই প্রবন্ধে যেহেতু আলোচিত হচ্ছে বিপ্লব-পরবর্তী রাশিয়া নিয়ে, সেই কারণেই এই যুগ-বিভাগের অবতারণা।

রবীন্দ্রনাথের এই ভ্রমণসাহিত্যের ফর্ম অন্যান্য ভ্রমণসাহিত্যের ফর্মের চেয়ে ভিন্ন। এই ভ্রমণসাহিত্যে সমগ্র রাশিয়া দেখার অভিজ্ঞতাকে আলাদা আলাদা চিঠিতে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণের সময় তাঁর নিকটজনের কাছে রাশিয়া দেখার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখেছেন; তবে সেটা আলাদা আলাদা করে বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে। তাই *রাশিয়ার চিঠি* পাঠের সময় রাশিয়ার সামগ্রিক অবস্থার 'ক্রনোলজিক্যাল' কোনো বয়ান খুঁজে পাওয়া যায় না। এর জন্য পাঠককেই সবগুলো চিঠি পড়ে একটা 'সম্পূর্ণ রাশিয়া দেখার অভিজ্ঞতা' নির্মাণ করে নিতে হয়। তবে এই চিঠিসমূহে সবই আছে, বিপ্লব-পরবর্তী রাশিয়ার ব্যাপারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়া পৌঁছেই লেখা শুরু করেন। এবং যা যা দেখছেন তার বর্ণনা করে যাচ্ছেন; সাথে আছে বিশ্লেষণ আর ভবিষ্যদ্বাণী। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ প্রথম চিঠিটা লেখেন তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষভাবে রাশিয়ার সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাচ্ছেন। কারণ আগেই বলা হয়েছে। কারণটা এই যে, বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে রাশিয়া তো আর আগের রাশিয়া নেই, তার বদলে গেছে খোলনলচে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই যে ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করেছেন তা হলো, রাশিয়ার সমাজে বিদ্যমান সাম্যবাদী অবস্থা। কার্ল মার্ক্সের সাম্যবাদী চিন্তার সর্বপ্রথম সার্থক প্রায়োগ ঘটেছিল রাশিয়ায়। রাশিয়াই প্রথম মার্ক্স-এঙ্গেলসের দর্শন-চিন্তার বাস্তবিক সমাজতাত্ত্বিক প্রতিফলন-স্থান। মার্ক্স-এঙ্গেলস বহুদিন ধরে নানা ইতিহাস ও দার্শনিক বিষয়কে একটা নতুন চিন্তা-দর্শন হিসেবে নির্মাণ করেন। কিন্তু বহুদিন যাবৎ এই চিন্তা-দর্শনের কোনো বাস্তবিক ফল আসেনি। খোদ ইউরোপের ভূমি থেকে যে তত্ত্বের জন্ম হয়েছে সেই ইউরোপেই মার্ক্সবাদের প্রয়োগ মার্ক্স-এঙ্গেলস দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু সেই ব্যাপারটা হয়ে গেল রাশিয়ায়।

রাশিয়া ভ্রমণের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত দুটি নাটক– *মুক্তধারা* ও *রক্তকরবী*। এ দুটি নাটক রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পরে লেখা; এবং এ দুটি নাটকের প্রেক্ষাপট রুশ বিপ্লবের সাথে সম্পৃক্ত। *রক্তকরবী* নাটকে যে দাসত্ববন্ধনের চিত্র দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, সেই চিত্রের উৎস কোথায় পেলেন তিনি? বড়ো বড়ো সাহিত্যিকরা তাত্ত্বিক হন না, তাত্ত্বিকতাকে মনোজগতের ভিতরে নিয়ে যান, এবং সেই মনোজাগতিক তাত্ত্বিক-প্রক্রিয়াই তত্ত্বের চেয়ে বেশি কিছু হয়ে ওঠে। আর *মুক্তধারা*তে সেই তাত্ত্বিক সমস্যার, তাত্ত্বিক সমস্যাটা মূলত মার্ক্সের শ্রেণি সমস্যাই বটে, সমাধান দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর এর সবই তিনি গ্রহণ করেছিলেন রুশ বিপ্লবের নির্যাস থেকে। এবং এই বিপ্লব দ্বারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুগুণে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এ কথা না মেনে উপায় কি! কারণ রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-জগৎ একক আবর্তে ঘুরপাক খায়নি, তা ছড়িয়ে পড়েছে নানা স্তরে; নানা স্তরে বিভাজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা-জগৎ। তাই বলে রবীন্দ্রনাথ সাম্যবাদী ছিলেন, এ কথাও জোর দিয়ে বলা যাবে না।

রুশ বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় সকল মানুষের চৈতন্যকে সমানভাবে জাগিয়ে তোলার প্রবণতা একেবারেই চোখে পড়ে না। কিন্তু বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় সমগ্র জনগোষ্ঠীকে সমানভাবে জাগিয়ে

তোলার জোর প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ব্যাপারটাকে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। সাম্যবাদী চিন্তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই প্রক্রিয়াটি অনেকাংশে মানবতাবাদী প্রক্রিয়া-সম্পৃক্ত– রবীন্দ্রনাথ নিজেও মানবতাবাদী চিন্তার ধারক। সকল মানুষের সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারটা একেবারেই আদিম আদিকল্প-সম্পৃক্ত। কেউ যদি বলে যে, এই ব্যাপারটা নির্দিষ্ট তত্ত্বের মাধ্যমে চলে তবে ভুল হবে। মনে রাখা জরুরি যে, তত্ত্ব না থাকলেও কোনো বিষয় হবে না এমন নয়। কারণ প্রত্যেক তত্ত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি তত্ত্ব-পূর্ববর্তী সমাজে লুক্কায়িত থাকে। রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথের মতো উদারবাদী সাহিত্যিকরা বিশ্বাসও করেন যে, '... এর কোনো প্রতিকার নেই। এক দল তলায় না থাকলে আরেক দল উপরে থাকতে পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে।'[৭] রবীন্দ্রনাথ নতুন সৃষ্টি ও চিন্তার জন্য অবসর চান। আর তার জন্য দরকারি হয়ে পড়ে 'নিচের মানুষ'। কারণ সকল কাজ সম্পাদন করে সৃষ্টি ও চিন্তা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে।'[৮]

কিন্তু এই নিচুতলার মানুষের জন্য তিনি ভাবেন, তাদের মৌলিক অধিকারের কথা চিন্তা করেন। এদের স্বাভাবিক আর সাধারণভাবে বেঁচে থাকার জন্য 'শিক্ষা স্বাস্থ্য-সুখ-সুবিধার' ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার। কিন্তু সেই মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে আগ্রহী নয় রাষ্ট্র; ঔপনিবেশিক ভারতের ইংরেজ প্রভু। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'ভেবে দেখো না, নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংলন্ড পরিপুষ্ট হয়েছে। ইংলন্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে ইংলন্ডকে চিরদিন পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা।'[৯] তাই তুলনা করেছেন ভারতের সাধারণ মানুষ আর তাদের মৌলিক অধিকারের অবস্থার বিষয়ে। কিন্তু এই বিষয়ের আশ্চর্য প্রাধান্য রবীন্দ্রনাথ একেবারেই বয়সে কাঁচা সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখেছেন। কিন্তু সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাগ্রিক উন্নয়ন-প্রকল্প বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

মস্কোর হোটেলে অবস্থানের সময় রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা দিচ্ছেন, 'মস্কৌয়েতে কয়দিন যে-হোটেলে ছিলুম, তার নাম গ্রান্ড হোটেল। বাড়িটা মস্ত, কিন্তু অবস্থা অতি দরিদ্র।'[১০] সামষ্টিক উন্নয়নের জন্য সম্পদ বেঁটে দেওয়ায় 'পরশ্রমজীবী'দের এমন সাধারণ অবস্থায় বসবাসে বাধ্য করেছে। এমনকি একক ব্যক্তিমালিকানার পুঞ্জীভূত সম্পদের বেলায় অধিকাংশ সম্পদই বাতিল করে জনগণের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। পুরো রাশিয়া জুড়েই এই ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাশিয়ার জনগণের সাধারণ জীবন-যাপনের ব্যাপারে বার্ট্রান্ড রাসেলও একই কথা বলেছেন, তাঁর রাশিয়া ভ্রমণ সংক্রান্ত পুস্তকে। রাসেল সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন লেনিনের সাথে। রাসেল দেখিয়েছেন রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্তা হিসেবে লেনিনের সাধারণ জীবন-যাপনের চিত্র কেমন।

> Lenin's room is very bare; it contains a big desk, some maps on the walls, two book-cases, and one comfortable chair for visitors in addition to two or three

> hard chairs. It is obvious that he has no love of luxury nor even comfort. He is very friendly, and apparently simple, entirely without a trace of *hauteur*. If one met him without knowing who he was, one would not guess that he is possessed of great power or even that he is in any way eminent.[১১]

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় পুঞ্জীভূত সম্পদের দেখা মেলা ভার। ফলে কেউ কারো ঘাড়ে চেপে বসার উপায় নেই। রাসেলের উদ্ধৃতি বিবেচনা করলে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্তাও খেটে খেতে বাধ্য। এমনই প্রক্রিয়া চালু হয়েছে নতুন রাশিয়ায়। আসলে পুঞ্জীভূত ধনই সমাজে 'পরশ্রমজীবী' ব্যক্তি তৈরি করে। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় তার বালাই নেই; যদিও আগে তা ছিল। সকলকে নিজ নিজ কাজ করেই খোরপোশ জোগাড় করতে হয়। তাই শ্রমজীবীদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক আধিপত্যের তলে পড়ে 'গুমরে গুমরে মরার' দিন শেষ হয়ে গেছে। এই ব্যাপারটা যে রবীন্দ্রনাথকে সাম্যবাদী কিংবা মার্ক্সীয় প্রকল্পের জন্য কাছে টেনেছে তা নয়। রবীন্দ্রনাথ উদারবাদী মানবতাবাদী। বিশ্বাস করেন ভিক্টোরিয়ান নীতিবোধের মৌলিক স্তম্ভগুলোতে, প্রভাবিত হয়েছেন এই সমস্ত নীতি দ্বারা। ফলে তাঁর কাছে গুরুত্ব পেয়েছে এই ব্যাপার। আরেকটা কারণ তো অবশ্যই আছে, তা হলো ভারতে পশ্চিমা পুঁজির নগ্ন কারবার। যা রবীন্দ্রনাথের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে। কারণ খোদ ভারতের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে; ব্যথিত করেছে তো বটেই। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন–

> ধনগত বৈষম্যের বড়াই আমাদের দেশে এসেছে পশ্চিম মহাদেশ থেকে। এক সময়ে আমাদের দেশে যখন হাল আমলে আপিসবিহারী ও ব্যবসাদারদের ঘরে নতুন টাকার আমদানি হল, তখন তারা বিলিতি বাবুগিরির চলন শুরু করে দিলে। তখন থেকে আসবাবের মাপেই ভদ্রতার পরিমাপ আরম্ভ হয়েছে। তাই আমাদের দেশেও আজকাল কুলশীল রীতিনীতি বুদ্ধিবিদ্য সমস্ত ছাপিয়ে চোখে পড়ে ধনের বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতার গৌরবই মানুষের পক্ষে সব-চেয়ে অগৌরব।[১২]

তবে এই বৈষম্য একদিনেই অন্তর্হিত হওয়ার মতো ছিল না। দীর্ঘদিনের এই সমস্যার সমাধানকল্পে সোভিয়েত ইউনিয়ন কী কী বিষয়ে কাজ করেছে, তা একটু ভেবে দেখা দরকার। কারণ রাশিয়ায় সাধারণ জনগণের অবস্থাও ভারতের সাধারণ জনগণের মতো ছিল। কিন্তু বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বদলে গেছে খুব দ্রুতই। সেটা কীভাবে সম্ভব হয়েছে তা বোঝা যাবে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার সামগ্রিক বিবেচনায়।

রাশিয়ায় বিপ্লবের অন্যতম কারণ ছিল শ্রেণিবৈষম্য। জারতন্ত্র, মোনার্কি, ধর্মতন্ত্র আর পুঁজিতন্ত্রের চাপে রাশিয়ার সাধারণ জনগণের অবস্থা ছিল চিড়েচ্যাপ্টা।[১৩] যে অবস্থা একসময় সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। রাশিয়ায় উৎপাদন ও বণ্টনের মূল নিয়ামক ছিল ভূমি। কিন্তু সেই ভূমির মালিকানা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান ছিল কৃষকের। কৃষকের ন্যূনতম জমির প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত করা হতো। ফলে সাধারণ কৃষকের অবস্থা ছিল অনেকটাই ভূমিদাসের মতো। এবং কৃষির সাথে অধিকাংশ লোক জড়িত থাকার পরও কৃষি ও কৃষকের

উন্নতি না হওয়ার কারণে মোট জনসংখ্যার অধিকাংশের অবস্থান ছিল উন্নয়ন ও প্রগতির বাইরে।

> অসম্ভব কঠোর অবস্থায় থাকত কৃষকেরা। সামন্ততন্ত্রের অবশেষ বজায় থাকার ফলে তারা ছিল ভূমি-ক্ষুধায় জর্জরিত: এক-কোটি পাঁচ লক্ষ কৃষক পরিবারের ভূমির পরিমাণ ছিল ৩০,০০০ ভূস্বামীর ভূমির পরিমাণের সমান। এর দরুন গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন-শক্তিগুলোর বিকাশে বাধা পড়ত। কৃষি ছিল অনগ্রসর; চাষাবাদের উপকরণ ছিল আদিম ধরনের।[১৪]

স্বাভাবিকভাবে 'সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রেণিবৈষম্য যতদিন না দূর হচ্ছে, সামাজিক ক্ষমতাও ততদিন ব্যবহৃত হবে শ্রেণিস্বার্থে, আর তার জন্য থাকবে বিশেষ এক রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের কাঠামো।'[১৫] কিন্তু রাশিয়ায় জারের পতনের পরপরই উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়; সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রেণিবৈষম্য দূর হয়। জারের শাসনামলে উৎপাদনে প্রায় সব কর্মকাণ্ডই কুক্ষিগত ছিল একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির মধ্যে– জার ও তার অনুসারী গোষ্ঠীর মধ্যে। কিন্তু বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় এই বিষয় বদলে যায়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতে উৎপাদনের প্রায় সকল কর্মকাণ্ডই নিয়ে আসা হয় জাতীয়করণ প্রক্রিয়ায়; এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানার হিসেবের মধ্যে। ভূমিব্যবস্থার মালিকানার হিসেব বদলে ফেলা হয় বিপ্লবের পরপরই। যে বৃহৎ বৃহৎ জমিদারি ছিল, যার অধিকারে ছিল কাউন্ট-নামধারী ভূস্বামীরা, তা বাতিল করে দিয়ে সেই ভূমি বেঁটে দেওয়া হয় সাধারণ কৃষকদের মধ্যে। ভূমি মালিকানায় নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় অধিকাংশ কৃষক যুক্ত হয় একত্রীকরণ ভূমিব্যবস্থার সাথে। যেখানে সমবায়ভিত্তিতে চাষাবাদ করা হতো; ফলে উদ্ভব হয় বড় বড় সমবায় ফার্মের। এই সকল ফার্মে একত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় চাষাবাদের ফলে উৎপাদন যেমন বেড়েছে, তেমনি করে বণ্টন-ব্যবস্থারও বিশেষ অবস্থান হয়েছে; যাতে করে দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে কেউ কেউ এই ব্যবস্থার মধ্যে না থাকলেও তা নিয়ে অন্য কারো মাথা ব্যথা নেই। কারণ একটাই যে, এই একত্রীকরণ প্রক্রিয়ার বাইরে গেলে নানা সুযোগ-সুবিধা থেকে যেমন কৃষক বঞ্চিত হবে, তেমনি করে উৎপাদনের যে অবস্থা তারও অবনতি হবে। কারণ, সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা বা কৃষির একত্রীকরণে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা একজন কৃষক পায়, সেই সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় একত্রীকরণ কৃষির বাইরের কৃষক। এমনকি কৃষি-সহায়তার দিক দিয়েও ব্যক্তিগত কৃষিজমির মালিকের চেয়ে যৌথ খামারের মালিকেরা বেশি সুবিধা পায়।[১৬] এই কারণে প্রায় সবাই এই কৃষি-ব্যবস্থার তলে এসেছে; নিজেদের অবস্থা বদলে ফেলার সাথে সাথে বদলে গেছে সমগ্র রাশিয়ার অবস্থাও। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে কৃষির একত্রীকরণ ব্যবস্থা নিয়ে বলছেন নিম্নরূপ:

> সুখোজ প্রদেশে জাইগান্ট নামক একটি সুবিখ্যাত সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে। সেখানকার একজন চাষী রাশিয়ায় ঐকত্রিকতার কীরকম বিস্তার হচ্ছে সেই সম্বন্ধে আমাকে বললে, "আমাদের এই খেতে জমির পরিমাণ এক লক্ষ হেক্টার (hectares)। গত বছরে সেখানে তিন হাজার চাষী কাজ করত। এ বছরে সংখ্যা কিছু কমে গেছে, কিন্তু ফসলের ফলন আগেকার চেয়ে বাড়বার কথা। কেননা, জমিতে বিজ্ঞানসম্মত

> সার দেবার এবং কলের লাঙল ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এইরকম লাঙল এখন আমাদের তিন-শো'র বেশি আছে। প্রতিদিন আমাদের আট ঘণ্টা কাজ করবার মেয়াদ। যারা তার বেশি কাজ করে তারা উপরি পারিশ্রমিক পায়। শীতের সময় খেতের কাজের পরিমাণ কমে; তখন চাষীরা বাড়ি-তৈরি রাস্তা-মেরামত প্রভৃতি নানা কাজে শহরে চলে যায়। এই অনুপস্থিতির সময়েও তারা বেতনের এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে আর তাদের পরিবারের লোক তাদের নির্দিষ্ট ঘরে বাস করতে পায়।[১৭]

অনেক সময় রাশিয়ার যৌথ খামারে কৃষকদের যোগ দেয়ার বিষয়ে জোর-জবরদস্তির অভিযোগ তোলা হয়। এই প্রচলিত মতকে অনেকেই মেনে নেয়। কিন্তু প্রচলিত এই মত সত্য নয়। রাশিয়ায় বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে যৌথ কৃষি খামারে কৃষকদের যোগদানের ব্যাপারে সরকারের যে কঠোর ও জবরদস্তিমূলক নিয়মাবলি ছিল বলে একটা গুজব চালু ছিল। কিন্তু এই গুজবের বাস্তব ভিত্তি নেই; আদতে এমন কিছুই ঘটেনি। যে সকল মতামত প্রচলিত ছিল সেই মতামত মূলত একটা প্রোপাগান্ডার নিয়ন্ত্রণাধীন। এই ব্যাপারটা মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে রাশিয়ায় ভ্রমণের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণে বাধা দেওয়ার ব্যাপারটার সাথে। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিজেও যাচাই-বাছাই করে সত্যতা নির্ণয় করেছেন।[১৮] আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যৌথ খামারের সুফলে রাশিয়ায় নারী এবং তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া জাতিসমূহও বিশেষভাবে উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, জারের আমলে যাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল তাদেরই সোভিয়েত রাশিয়ায় সমান গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নযাত্রায় অংশীদার করা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে সমান সুযোগ-সুবিধা।

যারা যৌথ কৃষির সাথে থেকেছে তাদের আদতেই সরকার নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। এর মানে এই নয় যে, ব্যক্তিগত মালিকনাভিত্তিক কৃষির মালিকদের জোর করে যৌথ খামারে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে। বিপ্লব-পরবর্তী রাশিয়ায় কৃষি ও উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থায় নানা অসংগতির ফলেই সরকার এই যৌথ খামারব্যবস্থা চালু করে। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতার বিষয় বিশেষভাবে মাথায় রাখা হয়। কৃষকদের শ্রান্তি-বিনোদনের ব্যাপারেও বিশেষ সুনজর ছিল সোভিয়েত সরকারের। এমনকি গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে কৃষকদের থাকার জন্য আবাসিক ব্যবস্থাও ছিল।[১৯] এছাড়া কৃষি প্রযুক্তি ও কৃষির মৌলিক উন্নয়নের জন্যও সর্বাত্মক কার্যক্রম চালিয়েছে।[২০] সরকার এক্ষেত্রে আরো কী কী ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল সে বিষয়ে একটু নজর দেওয়া যাক।

> রাষ্ট্রের সাহায্যে যৌথখামারগুলি কম দামে যন্ত্রপাতি, সার এবং অন্যান্য মালমশলা পেত, তাই অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সাধারণ পৃথক জোতজমাগুলোর চেয়ে অনেক ভালভাবে সজ্জিত হয়ে উঠেছিল। যৌথখামারগুলিকে সমর্থনের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে গণ্য করে রাষ্ট্র সুপরিকল্পিতভাবে সেগুলির গড়ে-বেড়ে ওঠার বিশেষ অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। যৌথখামারীদের বেশিরভাগই গোড়ায় ছিল গরিব কৃষক, তাদের আর্টেলে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল সামান্যই, তা সত্ত্বেও তাদের গড়পড়তা ফসল হতে থাকল যারা ব্যক্তিগত ভিত্তিতে খেতখামার করত তাদের চেয়ে বেশি।[২১]

এই উদ্ধৃত অংশে যে বিষয়সমূহ বলা হয় সে তার হিসেবই রবীন্দ্রনাথ তাঁর *রাশিয়ার চিঠি*তে তুলে ধরেছেন, রাশিয়ার কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি নিয়ে। এর সাথে সাথে তিনি ভারতের কৃষি ও কৃষকের অবস্থারও তুলনা করেছেন। এবং ভারতে ইংরেজ শাসকদের, যাদের তিনি প্রথমদিকে

মহানুভব হিসেবে বিবেচনা করতেন, কীর্তিকলাপেও শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বেশ তিতি-বিরক্ত ছিলেন। সেই তিক্ততার কথা তিনি বলেছেন *কালান্তর* প্রবন্ধগ্রন্থে।[২২]

এছাড়া পাঁচসালা পরিকল্পনায়ও কৃষি ও কৃষক ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদন-ব্যবস্থায় কৃষি ও কৃষক ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে শিল্পের জন্য যেভাবে রাশিয়া বিশেষ বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করেছে, তেমনি প্রণোদনা ঘোষণা করেছে কৃষি ক্ষেত্রেও। কৃষি যেহেতু উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক, সেই কারণে বারেবারেই সেই কৃষির প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল সোভিয়েত সরকারের। এমনকি অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার আয়ত্তে অভিযানে নামে সোভিয়েত ইউনিয়ন। যে অভিযান 'স্তাখানভ' আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনে কৃষি ও কৃষকদেরও বিশেষভাবে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এসব দেখে রবীন্দ্রনাথ ফিরে এসেছেন ভারতে; তাঁর পিতৃভূমির কৃষকদের অবস্থা খুঁজতে, অবস্থা মেলাতে। এখানে যে কৃষকদের জন্য এত কিছু হচ্ছে তার দু' আনাও হচ্ছে না ভারতে। এখানকার কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে সোভিয়েত রাশিয়ার সরকার। কিন্তু ভারতে তার ছিটেফোঁটাও নেই। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নের জন্য তো বিশেষভাবে দরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন। ভারত কিংবা যে কোনো কৃষিপ্রধান দেশে কৃষকের অবস্থান পরিবর্তন করা জরুরি। ইংরেজরা সেই ব্যাপারে কোনো চেষ্টা করেনি ভারতে।

সভ্যতার সূচনা হয়েছিল কৃষির মাধ্যমে; তা প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য যেখানকার কথাই বলা হোক না কেন। কিন্তু সেই সভ্যতার আদিম লোকজনকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে না পারলেও সামগ্রিকভাবে তাদের একঘরে রাখার একটা প্রবণতা ধনিক সমাজের মধ্যে সবসময় ক্রিয়াশীল থাকে; ব্যাপারটা দৃশ্যমান হয় সাত মহাদেশ মেখেই। এই একই ব্যাপার যেমন ছিল রুশ সমাজে, তেমনি ছিল ভারতীয় সমাজেও। কিন্তু রুশরা ধনতন্ত্রের এই সমস্যাকে বিশেষভাবে ধরতে পেরেছিল এবং তার সমাধানও দাঁড় করেছিল। 'সভ্যতার আদিপিতাদের' সোভিয়েত ইউনিয়ন ফেলে দেয়নি; টেনে নিয়েছে বুকে, পরম মমতায়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ছিল যে, '...যাদের আমরা অন্ধকারে দেখতে পাই নে, তাদের জন্য যে কিছু করা যেতে পারে এ-কথা স্পষ্ট করে মনে আসে না।'[২৩] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়ে কৃষক ও শ্রমিকদের উন্নতি দেখে তাঁর মত বদলে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন। এবং কৃষক শ্রমিকদের জন্য যে কিছু করা যেতে পারে তা তিনি উপলব্ধি করেছেন; এবং শেষতক বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'এরা মানুষ হয়ে উঠেছে এই কটা বছরেই।'[২৪]

সামগ্রিকভাবে কৃষক-চৈতন্যে যে শঙ্কা, ভয়, হতাশা, সর্বোপরি যে হীনমন্যতাবোধ ছিল তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন কৃষি-প্রকল্প। বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যান্য খাতের উন্নতিকল্পে যতটুকু গুরুত্বারোপ করেছে, ঠিক ততটুকুই গুরুত্বারোপ করেছে কৃষিখাতেও। 'বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়'– এই প্রবাদ বিশেষভাবে কার্যকর ছিল বিপ্লব-পূর্ববর্তী রাশিয়ার কৃষকদের জন্য। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে

কৃষকরা অন্যান্য পেশার মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবন-যাপন করেছে; বুক ফুলিয়েই বসবাস করেছে। এই বিষয়সমূহ বিশেষভাবে নজর কেড়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। কারণ, রাষ্ট্রের সবার চেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করত কৃষকরা। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে খোলনলচে বদলে যায় কৃষকদের জীবনের। যা দেখে রবীন্দ্রনাথ বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'বেশ সহজ ওদের ভাবগতিক; কোনরকম সংকোচ নেই।'[২৫]

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঐ দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং বণ্টন-ব্যবস্থা। কারণ অর্থনীতি কোন প্রক্রিয়ায় আগাচ্ছে, কিংবা অবস্থাই-বা কী–তা বোঝা যাবে কেবল কোনো রাষ্ট্রের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলেই। রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ভ্রমণ করছেন তখনকার রাশিয়ার অন্যান্য অবস্থার মতো উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থারও বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, তাঁর *রাশিয়ার চিঠি*তে। জারতন্ত্র জারি থাকার সময় শিল্প, উৎপাদন আর উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর সামগ্রিকভাবে কর্তৃত্ব বজায় ছিল একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির। কিন্তু সেই ব্যাপারটা বদলে গেছে নাটকীয়ভাবে রুশ বিপ্লবের পর। বিপ্লব-পরবর্তী রাশিয়ায় অন্যন্য ব্যবস্থার মতো উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থাও সাধারণ জনগণের স্বার্থে কাজ করেছে, একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির হাতের মুঠোয় তা আর আটকে থাকেনি। এই শ্রেণি অন্যান্য নানা জায়গায় আধিপত্যবাদী কর্তৃত্ব যেভাবে হারিয়েছে ঠিক সেভাবেই হারিয়েছে উৎপাদন আর বণ্টনব্যবস্থার ব্যাপারটাও।

রুশ বিপ্লবের পর অর্থনৈতিক অবস্থা যে খুব ভালো ছিল রাশিয়ার তা বলা যাবে না। তাছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ঘাড়ে নিয়েই বিপ্লব সফল হয়, নতুন এক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম হয় পুরোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার খোলস ছেড়ে। আর এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, উৎপাদন-ব্যবস্থা সমর্থন করে এই ব্যবস্থা গড়ে উঠছিল যা ছিল সমগ্র বিশ্বের উৎপাদন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপন্থী। ফলে বিশ্বের আর কাউকে সাথে পায়নি রাশিয়া। তাই স্বাভাবিকভাবেই সংকটে পড়তে হয়েছে রাশিয়াকে, দারুণভাবে। কিন্তু পিছিয়ে পড়েনি রাশিয়া। উৎপাদন কৌশল বদলে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে, নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে উন্নতি করেছে রাশিয়া। এর জন্য বুক লাগিয়েছে সমগ্র রাশিয়ার জনগণ। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই বিষয় উপলব্ধি করে বলেছেন :

> সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণের উন্নতিবিধানের চাপ খুবই বেশি, সেজন্যে আহারে বিহারে লোকে খুব কষ্ট পাচ্ছে কম নয়, কিন্তু এই কষ্টের ভাগ উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সকলেই নিয়েছে। তেমন কষ্টকে তো কষ্ট বলব না, সে যে তপস্যা।[২৬]

'শিল্পযোজনের অগ্রগতি এবং কৃষির যৌথ খামারব্যবস্থা মজবুত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা আর কলাবিদ্যা ক্ষেত্রে জনগণের অর্জিত সাফল্যও গুরুত্বে খাটো ছিল না।'[২৭] 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'– এই অনিবার্য সত্যকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিল বিপ্লবোত্তর রুশ সরকার। বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে শিক্ষা এবং এই সম্পর্কীয় বিষয়-আশয়কে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নিয়েছিল রুশ সরকার। এক্ষেত্রে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চিঠিতে প্রথমেই উল্লেখ করে বলেছেন, 'অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারেই মূলে

প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলেছে।'[২৮] এই ব্যাপারটা শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমানভাবে কার্যকর ছিল।

আরেকটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো জোর-জবরদস্তির স্থান ছিল না। যে যেভাবে, যে ক্ষেত্রে ভালো করবে ভেবেছে সেভাবেই সে বিষয় নির্ধারণ করে পড়ালেখা করেছে। আর পছন্দানুসারে পড়ার বিষয় নির্ধারণ করে পড়ালেখার ফলে শিক্ষা ফলপ্রসূ হতে বাধ্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতেন; এই চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে কর্তার ইচ্ছাধীন শিক্ষাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হতো। ফলে যে 'যে বিষয়' নিয়ে পাঠ সম্পূর্ণ করত সে 'সে বিষয়ে' পারদর্শী হয়ে উঠত। কারণ, জোরপূর্বক এবং অনিচ্ছায় সার্টিফিকেট মিললেও সেই শিক্ষার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজে কমিউনিজমের ব্যাপারে ততটা আগ্রহী না হলেও রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় সাম্যবাদের ফলাফলে রীতিমতো আশ্চর্য হয়েছেন, এবং এই ব্যবস্থাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, রাশিয়ায় সামগ্রিকভাবে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়ন হবার পর অরুশ দেশ ও জাতির শিক্ষার ব্যাপারেও বিশেষভাবে যত্নশীল ও আগ্রহী ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

> এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত–ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত-রাশিয়ার জন্যে নয়–মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে–সায়েন্সের শেষ-ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই।[২৯]

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই শিক্ষা যে কেবল একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়। এই শিক্ষা বিস্তৃত হয়েছিল ইউনিয়নের প্রত্যেকটা অঞ্চলে। এবং উন্নয়নের অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বরাদ্দের বেলায় কেন্দ্রের সাথে প্রান্তের তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না–এখানে রাশিয়ার 'মেইনল্যান্ড' এবং 'ইউনিয়নের' অন্যান্য সদস্য সমান। এমনকি এই বরাদ্দ ব্যবহারের বেলায় স্বাধীনতা পেয়েছে ইউনিয়নের সদস্যরা। তাই এখানকার সুষম উন্নয়নের ব্যাপারটা যে কারো চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতোই শক্তিমান ছিল। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে রাশিয়ার সাথে তুলনা করে বলছেন:

> সোভিয়েট শাসনের অন্তর্গত বর্বরপ্রায় প্রজার মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য এরা যে প্রকৃষ্ট প্রণালীর ব্যবস্থা করেছে ভারতবর্ষের জনগণের পক্ষে তা দুর্লভ। অথচ এই অশিক্ষার অনিবার্য ফলে আমাদের বুদ্ধিতে চরিত্রে যে দুর্বলতা, ব্যবহারে যে মূঢ়তা, দেশবিদেশের কাছে তার রটনা চলছে।[৩০]

'... আপাতত রাশিয়ায় এসেছি– না এলে এজন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।'[৩১] রবীন্দ্রনাথের এ কথা বলার নানা কারণ আছে। রাশিয়াতে এত অল্প সময়ে সামগ্রিকভাবে যে উন্নয়ন হয়েছে তা কল্পনা করা যায় না। তাহলে কী এমন অলৌকিক শক্তিবলে এই কাজ করতে সমর্থ হয়েছে রাশিয়া? আসলে এর পিছনে অলৌকিক শক্তির কিছু নেই, বিশেষভাবে

রয়েছে শিক্ষারই শক্তি। রবীন্দ্রনাথ এই কার্যকলাপকে তীর্থদর্শনের সাথে তুলনা করেছেন। এমনকি সমগ্র রাশিয়া থেকে 'সনাতন' ব্যাপারটা যে একেবারেই অন্তর্হিত হয়ে গেছে, এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ হলো: সুষম-শিক্ষা-শক্তি এই 'সনাতন' ব্যাপারটাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিয়েছে। সামষ্টিক শিক্ষার ফল সমাজে ইতিবাচক হিসেবে কাজ করেছে। তবে এমন শিক্ষার ব্যাপার সম্পাদিত হওয়ার কথা ছিল ইউরোপে। কত বড় বড় আর প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপে। কত তেজ তাতে! কিন্তু তারা তো পারেনি সব ঠিকঠাক করতে। এত সহজে। তাহলে রাশিয়া কীভাবে পারল। পারল সামষ্টিক শিক্ষার ফলে। রবীন্দ্রনাথের মতে এইভাবে: 'যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল, আজ তারা সমাজের অন্ধকুটুরী থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী।'[৩২]

এই ব্যাপার তো আর এমনি এমনি হতে পারে না। এর জন্যও তো বিশেষ কার্যক্রম এবং সরকার ও রাষ্ট্রের বিশেষ আগ্রহ থাকা চাই। সে আগ্রহ না থাকলে, চেষ্টা না থাকলে শিক্ষার তো এমন উন্নয়ন সম্ভব নয়। রাশিয়ায় এই চেষ্টা আর আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি বলেছেন, 'এরা তিনটে জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র।'[৩৩] তবে শিক্ষা বাদে বাকি দুটো বিষয়ও শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই রূপ পেয়েছে।

রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা ছিল একেবারেই প্রায়োগিক-বৈশিষ্ট্য-সম্পৃক্ত। এমন কোনো ক্ষেত্রে নেই যে সেইখানে প্রায়োগিক শিক্ষা পাওয়া যাবে না। আসলে এই ধরনের শিক্ষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *শিক্ষা* প্রবন্ধ-গ্রন্থের 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে বলছেন 'ব্যাপক-ভূমিকা-ভ্রষ্ট শিক্ষা কতই অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, কেবল অভ্যাসবশতই তার দৈনের বেদনা আমাদের মন থেকে মরে গিয়েছে।'[৩৪] রবীন্দ্রনাথ সবসময় প্রাণবান শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন; সেই প্রাণবান শিক্ষার জন্য শান্তিনিকেতন গড়েছেন। কিন্তু তাতেও কি ফললাভ হয়েছে? কিন্তু ফললাভ হয়েছে, একইসাথে সার্থক হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। রাশিয়ার এই যে বৃহৎ জাগরণ, তার পিছনে এই প্রায়োগিক আর প্রাণবান শিক্ষাব্যবস্থা দুর্দান্ত এক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। রবীন্দ্রনাথ এদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েও ইতিবাচক কথা বলেছেন। প্রায়োগিক আর প্রাণবান শিক্ষাব্যবস্থা মনে ধরেছে রবীন্দ্রনাথের।[৩৫]

মৌলিক অধিকারের মৌল প্রপঞ্চগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা। ভারতে ইংরেজ শাসন আর তার দীর্ঘদিনের পরিবেশগত প্রভাবসহ আরো নানা প্রভাব ভারতের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এই বিপর্যয় কিন্তু ধনতান্ত্রিক সভ্যতা আর ইংরেজ উপনিবেশের আগে ভারতে তেমনভাবে উপস্থিত ছিল না। দেশীয় বিষয়-আশয় আর নানাকিছু নিয়ে ভারতে নিজেদের মতো করে বসবাস করলেও ঔপনিবেশিক আমলের

মতো স্বাস্থ্য-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি ভারতের জনগণ । এ ব্যাপারে দীপেশ চক্রবর্তীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

> বুর্জোয়া সভ্যতা মানুষের শরীরকে যেভাবে ব্যবহার করে ও যে তাৎপর্য দেয়, তা প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শরীরের যে অবস্থানে থাকে তার থেকে আলাদা। 'কৃষক-শরীর', 'আদিবাসী-শরীর'কে ভেঙে-চুরে, দুমড়ে-মুচড়ে, নতুন অভ্যাসের ফাঁদে ফেলে, নতুন রুটিনের ছাঁচে ঢেলে তবেই তো তৈরি হয় শ্রমিকের শরীর, বিপণন সমাজের অসংখ্য ভোগ্যবস্তুর ক্রেতার শরীর, ফ্যাশন-ম্যাগাজিনের স্বাস্থ্য-পত্রিকার শরীর।[৩৬]

ভারতের এই সমস্যা রাশিয়ায়ও ছিল, স্বাস্থ্যখাতে। নানাভাবে চিকিৎসার মতো দরকারি আর গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো রাশিয়ার সাধারণ জনগণ। এছাড়া রাশিয়ায় সাধারণ মানুষ, মূলত কৃষক ও শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্য-পরিবেশ ছিল খুবই নাজুক। তাই সামান্য যে কোনো রোগেই তারা মারা গেছে; কিংবা অক্ষম হয়ে গেছে চিরতরে। কিন্তু শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য সবচেয়ে অগ্রগতিপূর্ণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে বিপ্লব-পরবর্তী রাশিয়ায়। শিক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার-প্রদানে সোভিয়েত ইউনিয়ন যতটা আগ্রহী ছিল ঠিক তেমনি আগ্রহী ছিল স্বাস্থ্যের বেলায়ও। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রদেশ ঘুরে এই সত্য উপস্থাপন করেছেন তাঁর *রাশিয়ার চিঠি*তে।

> যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা তেমনি স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার যে-রকম বৈজ্ঞানিক অনুশীলন চলছে তা দেখে য়ুরোপ আমেরিকার পণ্ডিতেরা প্রচুর প্রশংসা করছেন। শুধু মোটা বেতনের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পুঁথি সৃষ্টি করা নয়, সর্বজনের মধ্যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রয়োগ যাতে পরিব্যাপ্ত হয়, এমন কি এদেশের চৌরঙ্গি থেকে যারা বহুদূরে থাকে তারাও যাতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে অযত্নে বা বিনাচিকিৎসায় মারা না যায় সেদিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে।[৩৭]

এই স্বাস্থ্যব্যবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থার, রাশিয়ার স্বাস্থ্যব্যবস্থার সাথে। সেক্ষেত্রে অবশ্য হতাশই হয়েছেন তিনি। এবং গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ইংরেজের ওপর। কারণ ভারতে সাধারণের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি সাধনে সামান্যতম আগ্রহ নেই ইংরেজ সরকারের। এমনকি ইংরেজ সরকার আলোকায়ন ও সভ্যতার কথা বলে দীর্ঘদিন ভারত শাসন করলেও তার কোনো বাস্তবিক প্রতিফলন চোখে পড়েনি রবীন্দ্রনাথের। একই অবস্থা ছিল স্বাস্থ্যখাতেও।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যে উদার মানবিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন সেখানে এই মত মেনে চলার রেওয়াজ চালু আছে। এমনকি 'শিল্পের জন্য শিল্প'– যে সাহিত্যতত্ত্ব কেবলই নন্দনতত্ত্বকে রাশিয়া কেন, তামাম দুনিয়াতে এখনো এই বিষয়টা মেনে চলা হয় যে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ব্যাপারটা আসলে উঁচুতলার মানুষের জন্য। শ্রমিকশ্রেণির জন্য শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ব্যাপারটা নয়। কারণ, তারা এর মর্ম উদ্ধার করতে পারে না। কারণ, তাদের সে বোধ নেই। ফলে তাদেরকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে বিরত রাখা উচিত। বুর্জোয়া আর্টের এই ব্যাপারটা রাশিয়াতে চোখে পড়ত রুশ বিপ্লবের আগে।

রাশিয়ার জাদুঘর, নৃত্যশালা, আর্ট গ্যালারি, নাট্যশালাসহ সকল ধরনের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ব্যাপার-স্যাপার ছিল কেবল একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য। কিন্তু রাশিয়ার যে বৃহৎ একটা অংশ রয়েছে, যারা কৃষক-শ্রমিকশ্রেণি হিসেবে বিবেচিত হতো, তাদের একেবারেই এর বাইরে রাখা হতো। আলেকজান্দার রাশিয়ার সামগ্রিক আধুনিকতার যুগ বয়ে আনলেও তা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-জগতের বেলায় একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্যই বিবেচিত হতো। এর মধ্যে পশ্চিমা আলোকায়নের মনোভাব ছিল পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে রবীন্দ্রনাথের কাছেই ফিরে যেতে হয়। *গোরা* উপন্যাসের গোরা চরিত্র নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ যে প্রক্রিয়ার অংশীদার হয়েছেন সেই প্রক্রিয়াতে আমরা দেখতে পাই যে গোরা চরঘোষপুরে গিয়ে স্থিত হতে পারে না, ফিরে আসে। কিন্তু সে তো গ্রামের মানুষের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়েই গিয়েছিল, তাহলে কেন সে ফিরে এল? আসার কারণ, গোরা আসলে চরঘোষপুরে থাকতে পারেনি। লিবারেল হিউম্যানিজমের সমস্যাটা কোথায় এবার ধরা গেল বোধ হয়। এটাই তো উদারবাদী মানবতাবাদের ব্যাপার। এরই আরো পুরোনো সংস্করণ রাশিয়ার জারের আমলের প্রাইমাল মানবিকতাবাদ। সেই উদার মানবিকতাবাদে কৃষক-শ্রমিকশ্রেণিকে রাখা হয়েছে একটা বুর্জোয়া শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রা উৎপাদক হিসেবে। এই বিষয়ে একটা উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য।

> *গোরা* কাজ করেছে ইতিহাসের এমন এক পর্ব নিয়ে, যা আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভৌগোলিকভাবে ব্রিটিশ ভারত তখন সেই আকার পেয়ে গেছে, কিঞ্চিৎ ভাঙাগড়া নিয়ে যে আকারটা আজো আমরা দেখছি। ভারতবর্ষের ক্ষমতাবান নাগরিকদের যে রকম মুখ আজ আমরা দেখে থাকি, তার ভিতও তখন বেশ মজবুত হয়ে গেছে। পশ্চিমা শিক্ষা প্রসঙ্গ, পশ্চিম-পুবের সংঘাত-সমন্বয়, হিন্দু সমাজ ও তার নানা পরস্পরবিরোধী অসহিষ্ণু ধারা, ইংরেজ শাসনের ফল–*গোরার* সময়ের এসব প্রধান প্রশ্ন ভারতবর্ষের ইতিহাসে আজো প্রাসঙ্গিক। তার মাত্রাগত হেরফের হয়েছে বটে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গৌণ-মুখ্যের রদবদলও হয়েছে; কিন্তু প্রশ্নগুলো গুরুত্ব হারায়নি। বলা যায়, উনিশ শতকের শেষাংশ ও বিশ শতকের প্রথমাংশের ঐ ইতিহাস– সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক– পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলেই গোরা গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। বিদ্যমান ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঔপন্যাসিক গুরুত্বে রূপান্তরিত হয়েছে।[৩৮]

তাহলে গোরার যে মনোভঙ্গি তা রাশিয়ার সোভিয়েত শাসনের পূর্বের শাসকশ্রেণির মধ্যেও দেখা যায়। এমনকি উদারবাদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো এভাবেই গোরাকে নির্মাণ করলেন। কিন্তু সেই ব্যাপারটা বদলে গেল সোভিয়েত আমলে। কারণ সোভিয়েত আমলেই কৃষক-শ্রমিকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় সকল ধরনের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির দরজা। প্রলেতারিয়েত তকমার জন্য যারা একসময় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ থেকে দূরে ছিল, সোভিয়েত আমলে তারাই নিজেদের গুণে অধিকার ফিরে পায় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে অবাধ বিচরণের। রাশিয়া যখন জারের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে সোভিয়েত আমলে পা দিব দিব করছে ঠিক সে সময় প্রতিক্রিয়াপন্থীরাও কিন্তু থেমে নেই। প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মদদপুষ্ট পত্রিকাসমূহে ছাপা হচ্ছে, কারা নতুন দেশের আর্থ-সমাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জগৎ পরিচালনা করবে? কীভাবে পরিচালিত হবে এই সেক্টরসমূহ। এ নিয়ে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা বেশ

লেখালেখি করেছিল তাদের পত্র-পত্রিকায়। প্রতিক্রিয়াপন্থীরা কী বলছে তাও একটু দেখে নেওয়া যাক।

> একবার যদি ধরেই নিই যে, বলশেভিকরা আমাদের পরাস্ত করবে, তখন আমাদের উপর শাসন চালাবে কারা? হয়ত বাবুর্চিরা– কাটলেট আর কাবাবের ওস্তাদেরা– আস্তাবলের খানসামারা কিংবা কয়লা-যোগানেরা? কিংবা আয়ারা হয়ত বাচ্চাদের কাঁথা-তোয়ালে কাচার ফাঁকে-ফাঁকে ছুটে-ছুটে যাবে রাষ্ট্রীয় পরিষদের বৈঠকে? নতুন সব রাষ্ট্রনায়ক হবে কারা? হয়ত থিয়েটারগুলোকে চালাবে তালাওয়ালা, জলকলমিস্ত্রিরা চালাবে কূটনীতিক সার্ভিস, আর ডাকব্যবস্থা চালাবে কাঠের মিস্ত্রিরা? এই রকমটাই দাঁড়াবে নাকি অবস্থাটা? না! এমন দশা কি সম্ভবপর? এই উন্মত্ত প্রশ্নের জবাব বলশেভিকদের দেবে ইতিহাস।[৩৯]

কিন্তু প্রতিক্রিয়াপন্থীদের এই ভাবনা-চিন্তাকে একেবারেই মিথ্যে করে দিয়ে সবদিক থেকেই সফলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, প্রগতির চাকা ঘুরেছে দ্বিগুণ গতিতে। সকল ক্ষেত্রেই সফল ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ফলে যে ধরনের আশা-আশঙ্কা ছিল প্রতিক্রিয়াপন্থীদের, সোভিয়েত সরকার নিয়ে, সেই আশা-আশঙ্কা আদতে পূর্ণ হয়নি। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নয়নের চাকা ঘুরতে অনেক সময় লাগবে বলে ধারণা করা হলেও আসল চিত্র ছিল ভিন্ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন পাল্টে গিয়েছিল খুব দ্রুতই।[৪০]

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে একটি রাষ্ট্রের সকল গোষ্ঠীরই আগ্রহ থাকে। কিন্তু সেই আগ্রহবোধের ওপর একটা অবরোধ আরোপ করে রেখেছিল জারতন্ত্র। বিপ্লব-পূর্ববর্তী সময়ে জার এবং জারের অনুসারী একটা নির্দিষ্ট শ্রেণি, যারা সংখ্যায় ছিল নগণ্য, ছিল রাশিয়ার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রক। সাধারণ শ্রেণির ব্যাপারে কথা বলতে গেলে এরা তো একবারেই এই প্রক্রিয়ার বাইরের লোক। যারা সাধারণভাবে মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে কঙ্কে পায় না; তাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নাগাল পাওয়া একেবারেই অবান্তর ভাবনা, বাজার দখল তো আরো পরের ব্যাপার। সত্যি বলতে কী রাশিয়ার আর্ট এবং আর্টের মাল-মসলাসহ এর আরো নানা বিষয় অনুসৃত হতো এক ভিন্নতর পথ দিয়ে। রুশ বিপ্লব ঘটে যাওয়ার পরপরই শিল্পের নির্দিষ্ট ভোগদখলকারী ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে শিল্প ও সংস্কৃতি মুক্তি পায়। মুষ্টিমেয় শ্রেণির লোকজনের হাত থেকে মুক্ত করে দেয়া হয় শিল্প-সংস্কৃতিকে, ছড়িয়ে দেওয়া হয় সমস্ত জনগণের মাঝে। এবং এ বিষয়ে দেওয়া হয় ঢের শিক্ষা; যাতে সাধারণ জনগণের প্রতিভা সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয়। 'রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক আর সাংস্কৃতিক কাজকে লেনিন চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন বলে গণ্য করেছিলেন।'[৪১] লেনিনের পরবর্তী সময়ে যাঁরা নেতৃত্বে এসেছিলেন তাঁরাও এ ব্যাপারটা মাথায় রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়া গেছেন এবং রাশিয়ার যে সাংস্কৃতিক জগৎ দেখছেন তা প্রায় নির্মিত হয়ে গেছে একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য কৌশলগত বিষয়ের মতো সাংস্কৃতিক জগৎও নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে; পেয়েছে নির্দিষ্ট ধরন। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারটাকে বিশেষভাবে দেখেছেন। এবং তুলে ধরেছেন তাঁর এই *রাশিয়ার চিঠি*তে। বিশেষ করে শ্রমজীবী হিসেবে বিবেচিত লোকজনকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বাইরে রেখে দেওয়ার

দীর্ঘদিনের যে রেওয়াজ, তা থেকে বের হয়ে এসেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত সরকার এক্ষেত্রে রেখেছিল অগ্রণী ভূমিকা। বিশেষ করে জাদুঘর, তথ্যকেন্দ্রকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে সকর্মক ভূমিকা রেখেছিল সোভিয়েত সরকার। বলে রাখা জরুরি যে, এই ব্যাপারটা সোভিয়েত সরকার কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য করেছে তা নয়। এটা একেবারেই নিচুজাতের লোকটার জন্য যেমন করা হচ্ছে তেমনি করে করা হচ্ছে একেবারেই বড়লোকটার জন্য। এটা যে করতে পারছে তারও কারণ কিন্তু সমতা সাধন।

তবে রাশিয়ায় নতুন ব্যবস্থায় আর্টের ধরনগত কিছু সমস্যা হয়ে গেছে। বুর্জোয়া শিল্প হিসেবে 'শিল্পের জন্য শিল্প' গোষ্ঠীরা যে পাত্তা পাচ্ছে না আর, সেটাও বেশ দুঃখজনক। কারণ যতই গণশিল্পের কদরের কথা রাশিয়া বলুক না কেন, সামগ্রিক আর্টের বিচারে বুর্জোয়া মানবতাবাদী আর্টকে ছুড়ে ফেলা যাবে না। কারণ সেটা করলে 'আর্টের ঘর' সম্পূর্ণ হয় না। এ ব্যাপারে বার্ট্রান্ড রাসেলের মত প্রণিধানযোগ্য।

> It is of course discouraging and paralyzing to the old-style artist, and it is death to the old individual art which depended on subtlety and oddity of temperament and arose very largely from the complicated psychology of the idle. There it stands, this old art, the purest monument to the nullity of the art-for-art's sake doctrine, like a rich exotic plant of exquisite beauty, still apparently in its glory, till one perceives that the roots are cut, and that leaf by leaf it is gradually fading away.[৪২]

রবীন্দ্রনাথ সবসময় স্বদেশ এবং স্বদেশের জনগণের জন্য দরদ দেখিয়েছেন; তিনি কতটুক করতে পেরেছেন বা কতটুকু করতে পারেননি সেটা ভিন্ন ব্যাপার। এই দরদের ব্যাপারটা তাঁর নানা লেখায় স্পষ্ট হয়েছে; এর ব্যতিক্রম ঘটেনি *রাশিয়ার চিঠি*তেও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেভাবে ভারতের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে দেখতে চেয়েছিলেন তার অনেক কিছুই পেয়েছিলেন এই সোভিয়েত রাশিয়ায়। রাশিয়ায় এমন কিছু রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন, যে বিষয় রবীন্দ্রনাথ নিজের স্বদেশ ও স্বদেশের মানুষের জন্যও কল্যাণকর বলে মনে করেছিলেন; এবং রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ রাজত্বের আয়ত্তে মূলত চাইছিলেন এমনটাই, কিন্তু তার ছিটেফোঁটাও পাননি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও স্বদেশের গড় জনগণ। কিন্তু সেই ব্যাপারটা পেয়েছে রাশিয়ার আপামর জনগণ, রুশ বিপ্লবের পর, সোভিয়েত রাশিয়ায়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক জগতে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছিল রাশিয়া ও রাশিয়ার সাধারণ জনগণ।

কিন্তু যে ইংরেজদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অগাধ আস্থা ছিল সেই ইংরেজদের অধীনে ভারতবর্ষ এই উন্নতি তখনো পায়নি; যদিও সে সময় ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রায় দুইশ' বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এমনকি শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ বারে বারে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করলেও ভারতবর্ষে শিক্ষাকে ইংরেজরা কেরানি তৈরির কারখানা হিসেবেই বিবেচনায় এনেছে, এর ব্যতিক্রম কিছু চোখে পড়ে না, এমনকি এখনো না। এমনকি শিক্ষার ব্যাপারে বহুদিন অতিক্রান্ত হলেও তেমন কোনো উন্নতি করতে পারেনি ইংরেজ, ভারতবর্ষে। সেই উপলব্ধি

থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অকার্যকারিতার বিষয়ে বলেছিলেন, 'আজ পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সে কথা সম্পূর্ণ বলা চলবে না। তার নামকরণ, তার রূপকরণ, এ দেশের সঙ্গে সংগত নয়; এ দেশের আবহাওয়া তার স্বভাবীকরণও ঘটে নি।'[৪৩] কিন্তু কেবল বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েই নয়, সামগ্রিক শিক্ষা-ক্ষেত্রেই এই ব্যাপরটা উৎরে গিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া। রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মূলত রবীন্দ্রনাথের চিন্তানুকূলে। রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার প্রায়োগিক মতাদর্শের সাথে মিলে গিয়েছিল। এমনকি এই চিন্তাধারার হুবুহ মিল খুঁজে পেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের সাথে। জনগণের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই ব্যাপারে ভিক্টোরিয়ান নীতিবোধের সমর্থক রবীন্দ্রনাথ আস্থা রেখেছিলেন ইংরেজের ওপর। বিধিবাম, তা আর করে উঠতে পারেননি ইংরেজ সরকার; আসলে সে ইচ্ছা ইংরেজের ছিল কি কোনোকালে?

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার এই সামগ্রিক জাগরণকে বিশেষভাবে দেখেছেন; করেছেন সমর্থনও। সাথে সাথে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি সদর্থক চিন্তার সাথে সাথে একটু ভবিষ্যদ্বাণীও করে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই ব্যাপারটা আমরা দেখি বহু পরে। সোভিয়েত রাশিয়ার নানা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের পর সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ সরাসরি কোনো তাত্ত্বিক বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ হতে চাননি। সেই ব্যাপারটা তাঁর *ডাকঘর* (১৯১২), *রাজা* (১৯১০) নাটকের মধ্যেও প্রতীয়মান হয়। সেইভাবেই মার্ক্সবাদের যান্ত্রিক প্রক্রিয়া যে মানুষকে কৃত্রিম করে তুলবে সে বিষয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন। এবং বহুপরে সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার ব্যাপরটা রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য করেছে। আবার একেবারেই যে তাঁর সকল বাণী সত্য হয়েছে এমনও নয়।

পরিশেষে তাই বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রাশিয়ার চিঠি* বিপ্লবোত্তর রাশিয়াকে জানার ও বোঝার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা দেখার বিশদ বিবরণেও ভরপুর *রাশিয়ার চিঠি*। আর একইসাথে *রাশিয়ার চিঠিতে* ভারতের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতারও নোকতা কেটেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার বাস্তবতার খোঁজ নিতে গেলে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে *রাশিয়ার চিঠি*।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাশিয়ার চিঠি*, ভূমিকা: শিশির কুমার সিংহ, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

৩. Alan Wood, *The Origins of the Russian Revolution 1861-1917*, Routledge, London, 2003, p. 3

৪. লিও তলস্তয়, *যুদ্ধ ও শান্তি*, অনুবাদ: আনন্দ সরকার ও বিপ্লব চৌধুরী, ক্যাবকো, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৭

৫. T. S. Eliot, *The Sacred Wood*, Alfred A. Knope, New York, 1921, p. 44

৬. অরুণ সোম, *রুশ সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাশিয়ার চিঠি*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫২, পৃ. ১

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

১১. Bertrand Russel, *The Practice and Theory of Bolshevism*, George Allen & Unwin Ltd., London, 1921, p. 36

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, ১৩৫২, পৃ. ৭

১৩. Richard Pipes, *Russia under the Old Regime*, Charles Scribener's Sons, New York, 1974, p. 58-59

১৪. ভ. লেলচুক, পলিয়াকভ, ইউ., প্রতোপপভ, আ., *সোভিয়েত সমাজের ইতিহাস: লোকায়ত রূপরেখা*, অনুবাদ: বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৫, পৃ. ১০

১৫. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৩

১৬. লেলচুক, ভ., পলিয়াকভ, ইউ., প্রতোপপভ, আ., পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, ১৩৫২, পৃ. ২৯

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫-২৬

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

২১. ভ. লেলচুক, পলিয়াকভ, ইউ., প্রতোপপভ, আ., পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *কালান্তর* প্রবন্ধগ্রন্থের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক নানা নীতি নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স আশি বছর। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের সভ্যতা সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, তা ক্রমশই নষ্ট হয়ে গেছে ভারতে ব্রিটিশদের নানা অপকর্ম দ্বারা। এমনকি রবীন্দ্রনাথ যে তীব্র আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, ব্রিটিশদের অধীনেই ভারতীয়দের সবদিক থেকে মুক্তি ঘটবে–তাও শেষ পর্যন্ত মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছিল। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সভ্যতার সংকট', *কালান্তর*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪২৪, পৃ. ৪০৮-৪১৬

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, ১৩৫২, পৃ. ২০

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

২৭. ভ. লেলচুক, পলিয়াকভ, ইউ., প্রতোপপভ, আ., পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, ১৩৫২, পৃ. ১

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শিক্ষা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ২৭২

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, ১৩৫২, পৃ. ৩৮

৩৬. দীপেশ চক্রবর্তী, 'শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র: ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারি ও জনসংস্কৃতি', *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, সম্পাদক: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৬১

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, ১৩৫২, পৃ. ৬৭

৩৮. মোহাম্মদ আজম, '*গোরা* উপন্যাসটি যেভাবে হয়ে ওঠে অথবা *গোরা*র জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের বিচার', *প্রভাতসূর্য* (রবীন্দ্র সার্ধশত জন্মবার্ষিকী স্মরণ সংকলন), সম্পাদক: ভীষ্মদেব চৌধুরী, নবযুগ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৮০

৩৯. ভ. লেলচুক, পলিয়াকভ, ইউ., প্রতোপপভ, আ., পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২-২৯৩

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩

৪২. Bertrand Russel, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, ১৩৬৭, পৃ. ২৫৫

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/জুন ২০২১

পুরুষের ব্রতকথা : নেত্রকোণা জেলার তিনটি নমুনা ও পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব

দীপ্তি রানী দত্ত*

সারসংক্ষেপ

ব্রতকথার সাথে 'মেয়েলি' বা 'মেয়েদের' পরিভাষাটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' বা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সংকলন 'মেয়েদের ব্রতকথা' থেকে হালের শীলা বসাকের 'বাংলার ব্রত পার্বণ'– সর্বত্রই ব্রতের সাথে লৈঙ্গিক সম্পর্কটি নারীর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। এতটা দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে আছে যে, মেয়েলি ব্রতের অনুসন্ধান কালেই পুরুষের ব্রতের নানা লক্ষণ ও আচরণ উপস্থিত থাকার পরেও তাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার প্রবণতা দেখা যায় না। ব্রতকথাগুলো যখন মেয়েদের ব্রতকথা নামে সংগ্রহ করা হচ্ছে, এই প্রবন্ধে নেত্রকোণা জেলা থেকে সংগৃহীত নমুনা প্রমাণ করে যে, পুরুষদের ব্রতকথাও তখন মাঠে অহরহই প্রচলিত ছিল। ঐতিহ্যের সাথে নারীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে পাঠ করার এই প্রক্রিয়াকে তাই পুনঃপাঠ করা জরুরি, যার মধ্য দিয়ে পশ্চিমা উপনিবেশের 'ঐতিহ্য' বা 'লোক' তত্ত্বকে তৎকালীন কৃষিভিত্তিক ভারতীয় উপমহাদেশে গ্রহণ করার নীতিটি বুঝতে সাহায্য করবে। যা হবে বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের প্রকরণ পাঠেরও সহায়ক।

মূলশব্দমালা: ব্রত, মেয়েলি, পুরুষ, কথা।

ভূমিকা

ব্রতকথা বাঙালি সংস্কৃতির একটি সাধারণ উপাদান। ব্রতকথার সাথে 'মেয়েলি' বা 'মেয়েদের' পরিভাষাটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' (১৯১৯) বা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সংকলন 'মেয়েদের ব্রতকথা' (২০১৩) থেকে হালের শীলা বসাকের 'বাংলার ব্রত পার্বণ' (২০১৭) পর্যন্ত সর্বত্রই ব্রতের সাথে লৈঙ্গিক সম্পর্কটি নারীর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। এতটা দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে আছে যে, মেয়েলি ব্রতের অনুসন্ধান কালেই পুরুষের ব্রতের নানা লক্ষণ ও আচরণ উপস্থিত[১] থাকার পরেও তাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার প্রবণতা দেখা যায় না। এই প্রবণতা কেন দেখা যায়নি তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। এই প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে যে, ব্রতের লৈঙ্গিক রূপটি আদতেই একমুখী কিনা। নেত্রকোণা জেলার মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি ব্রতের নমুনার ভিত্তিতে এই প্রশ্ন আরও জোরালো হয়। মাঠে প্রাপ্ত তিনটি নমুনা উপস্থাপনের মাধ্যমে আলোচ্য প্রবন্ধে ব্রতের সাথে 'মেয়েলি' ধারণার একমুখিতাকে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং নতুনভাবে এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে।

বিশ-শতকে ব্রত শনাক্তকরণের প্রাসঙ্গিকতা

ব্রতের সূত্র ধরে মূলত আলপনার ওপর আলোকপাত করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' (প্রথমবার ১৯১৯ সালে, দ্বিতীয়বার ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত) বইটিতে। গবেষণাধর্মী এই বইটিতে তিনি ব্রতের শ্রেণিকরণও করেছেন। শাস্ত্রীয় ব্রত থেকে বিশুদ্ধ ব্রতের আদিমতম রূপটির

* সহকারী অধ্যাপক, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বরূপ সন্ধানরত অবনীন্দ্রনাথের আগে বা সমসাময়িক সময়ে ব্রত বিষয়ক আরও প্রকাশনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কমল চৌধুরী লিখেছেন– 'বহুগ্রন্থ রচিত হয়েছিল নানান সময়ে। প্রকাশিত হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সাময়িকপত্রের পাতায়। সে সময়ে হাতে আসে অবনীন্দ্রনাথের "বাংলার ব্রত"। পরবর্তী সময়ে বাংলার মনীষীরা বিষয়টিতে আলোকপাত করেন।'[২]

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলার ব্রত' বইয়ের নিবেদন অংশে লিখেছেন– 'কুড়ি কি বাইশ বৎসর পূর্বে "সাধনা" পত্রিকায় শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্ব-প্রথম বাংলার ছেলে-ভুলানো ছড়া ও মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত মেয়েলি ব্রতের সম্বন্ধে যত সন্ধান বাংলায় প্রকাশ হয়েছে, তার মধ্যে শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহাশয়ের "ঠানদিদির থলে বা বাঙ্গালার ব্রতকথা" খানিতেই আমাদের কুমারী-ব্রতগুলিকে, আচার-অনুষ্ঠান প্রকরণ সব দিক দিয়েই, যথাসম্ভব অবিকলভাবে সাধারণের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে।'[৩]

এ থেকে মনে হয়, ব্রতের সাথে নারীর সম্পর্ক বা নারীদের ব্রতের দিকে 'মেয়েলি' বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাকানোর কাজটি সুধীমহলের সামনে রবীন্দ্রনাথ বোধহয় প্রথম উপস্থিত করার কাজটি করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের কালে ব্রতকথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করার একটি সাধারণ প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। কমল চৌধুরী সম্পাদিত 'বাংলার ব্রত ও আলপনা' বইয়ের সম্পাদকের নিবেদন অংশ থেকে জানা যায়–

> বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনা করবার সময় পরমেশপ্রসন্ন রায়ের "মেয়েলি ব্রত ও কথা" এবং রামপ্রাণগুপ্তের "ব্রতমালা" ছিন্নপ্রায় দুটি বই দেখি। ঢাকা ময়মনসিংহ অঞ্চলের ব্রতকথা পাওয়া যায় এই দুটি বই-এ। পরবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গের অনেকেই বিভিন্ন জেলার ব্রতকথা সংকলিত করেন।[৪]
>
> পরমেশপ্রসন্ন রায় 'মেয়েলি ব্রত ও কথা'-র মুখবন্ধে লিখেছেন–'শিক্ষিত সমাজের অনেকেই অন্তঃপুরের বারব্রত ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের প্রতি অবজ্ঞা-মিশ্রিত কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে সম্প্রতি অন্তর্দৃষ্টির কাল উপস্থিত। সেই ভরসায় এবং পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উৎসাহ বাক্য শিরোধার্য করিয়া, বাহ্যশোভা-বিবর্জিত এই ক্ষুদ্র পুস্তক জনসমাজে প্রচার করিতে সাহসী হইলাম'।[৫]

এই বক্তব্যের মধ্যে ব্রতের ব্রাত্য চরিত্রটির দেখা পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথ বা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন ব্রতের দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন, তখন স্বদেশ বা জাত্যাভিমানের দৃষ্টি বা প্রয়োজনের প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান। এ সময়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রবল ঢেউ এবং স্বদেশী সম্পদ অন্বেষণ ছিল পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে গাঁথা। পরমেশপ্রসন্ন রায়ের বইটি হাতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন– '...দেশকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিবার জন্য আমাদের হৃদয়ে আগ্রহ জন্মিয়াছে, বর্তমান গ্রন্থ তাহারই সূচনা করিতেছে।'[৬] ফলে লোকশিল্পের সূত্র ধরে যেমন আলপনা, তেমনি লোকসাহিত্যের সূত্র ধরে ব্রতকথা সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শের বাইরে বটতলার প্রকাশনার মতো জনপ্রিয় সস্তা প্রকাশনায় ব্রতকথা পূর্বেই প্রকাশিত হতো কিনা, তা গবেষণার দাবি রাখে। এখনও চলতি বাজারে ব্রতকথার যেসব বই প্রচলিত আছে, তা সুধী মহলের বইয়ের দোকানের বা প্রকাশনীর কাজের আওতাধীন নয়।

'মেয়েলি' ব্রতের বৈশিষ্ট্য এবং পুরষের ব্রতকথা সন্ধান

রামপ্রাণ গুপ্তের 'ব্রতমালা' (কমল চৌধুরী সম্পাদিত 'বাংলার ব্রত ও আলপনা' বইয়ের সম্পাদকের নিবেদন অংশে উদ্ধৃত) বা অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' (১৯৪৩) সকল প্রকাশনাতেই

এই ব্রতের সাথে 'হিন্দুরমণীর' বা 'মেয়েদের' সম্পর্ক প্রকাশ করাই একটি মৌলিক প্রবণতা। অবনীন্দ্রনাথ ব্রতকে মূলত দুইভাগে ভাগ করেছেন– শাস্ত্রীয়ব্রত এবং মেয়েলি ব্রত। মেয়েলি ব্রতকে আবার দুইভাগে ভাগ করেছেন– নারী ব্রত এবং কুমারী ব্রত।[৭] তাতে শাস্ত্র বহির্ভূতব্রত তথা মেয়েলি ব্রতের বিষয়টি জোরালোভাবে তার কাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠারই নানামাত্রিক অনুরণন শোনা যায় পরবর্তী গবেষকদের কাজে। বলা যায়, পরবর্তীকালে বহুল প্রচারিত। মৌলিক ও একমাত্র তথ্যসূত্রে পরিণত হয়েছে অবনীন্দ্রনাথের এই বই।

স্থানিক কথ্যরীতি বা প্রমিত ভাষার ডিসকোর্স নানা সময়ে জোরালো হলেও ব্রত আচারের সাথে নারীর সম্পর্ককে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটি বাইনারি অবস্থানেই রয়ে গেছে। অবনীন্দ্রনাথের কাজে শাস্ত্রীয় ব্রতের বিপরীতে 'খাঁটি' 'মেয়েলি' ব্রতের সন্ধান জারি থাকলেও এর সূত্র ধরে ব্রতকে লিঙ্গভিত্তিক দেখার এই প্রবণতাটিকে আর কোথাও প্রশ্ন করা হয়না। তার মতে, কুমারী ব্রতের অনেকখানি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়।[৮]এই খাঁটি ব্রতের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী–

'এদের গঠন এইরূপ– আহরণ, যেমন ব্রত করতে যা যা লাগবে তা সংগ্রহ করা; আচরণ, যেমন কামনার প্রতিচ্ছবি, আলপনা দেওয়া, পুকুরকাটা ইত্যাদি এবং কামনা জানিয়ে কামনার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিকৃতিতে ফুল ধরা, শেষে যদি কোনো ব্রতকথা থাকে তো সেটা শোনা, নয়তো ফুল ধরেই শেষ কামনা জানিয়ে ব্রত সাঙ্গ। পূজারি এবং তন্ত্রমন্ত্রের জায়গাই এখানে নেই।'[৯] শাস্ত্রীয় ব্রতের সাথে তিনি তফাৎ করছেন উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে। যাতে পূজারি বা পুরোহিত এবং তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা মূলত মেয়েলি ব্রত থেকে শাস্ত্রীয় ব্রতকে পৃথক করা হয়েছে। তাহলে, ছেলেদের ব্রতকথা, যা প্রাবন্ধিক সংগ্রহ করেছেন তার বৈশিষ্ট্যগুলো আগে দেখে নিই–

আহরণ, যেমন ব্রত করতে যা যা লাগবে, তা সংগ্রহ করা; ব্রতকথা বলা ও শোনা, ব্রতকথা শেষে পাঁচ/তিন ব্রতীর তামাক সেবন এবং ব্রতসাঙ্গ করে মৌনতা ভঙ্গ (কল্কিনারায়ণ ব্রত ও তিননাথের সেবা)। গোরক্ষনাথের সেবায় কথা শেষে কামনা জানিয়ে সেবা সাঙ্গ। পূজারি এবং তন্ত্রমন্ত্রের জায়গা এখানেও নেই।

এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় সংগৃহীত ব্রতগুলোকে শাস্ত্রীয় ব্রতের নিরিখে দেখার সুযোগ নেই। ছেলেদের ব্রতের সন্ধান নতুন নয়। ছেলেদের নানা ব্রত আচারের সন্ধান পাওয়া যায় 'বাংলার ব্রত' সাহিত্যের জন্মের পটভূমিতেই। কমল চৌধুরী সম্পাদিত '*ময়মনসিংহের ইতিহাস*' (২০০৫) বইয়ে কিছু ব্রত আচরণের দেখা মেলে। যা 'বালক' বা পুরুষের আচরণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে তা উল্লেখিত হয়েছে 'উৎসব', 'সেবা'বা 'মেলা' ইত্যাদি হিসেবে। দেখা যাক, যেসব উৎসব বা সেবার কথা বলা হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো–

১। বাঘাইর বয়াত– এ নামে 'ময়মনসিংহের নানা স্থানে পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে কৃষক বালকগণের মধ্যে একটা উৎসব প্রচলিত আছে।'[১০]

কী উদ্দেশ্যে এই উৎসব হচ্ছে– 'গো-মেষাদির রক্ষার্থে ব্যাঘ্রের দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহার উদ্দেশ্যে বনের ধারে এইরূপে সিন্নি বা বলি দেওয়া হয়।'[১১]

এই উৎসব করার পদ্ধতিটি খেয়াল করলে অবনীন্দ্রনাথ চিহ্নিত 'খাঁটি' ব্রতের সাথে এর চরিত্রের পার্থক্য বা মিল বোঝা যাবে– 'রাখাল বালকগণ পৌষ সংক্রান্তির পূর্বে দল বাঁধিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া "বাঘাইর বয়াত" নামে এক প্রকার কবিতা আবৃত্তি করিয়া ভিক্ষা করে। একজন প্রথমে কবিতা বলিয়া দেয় এবং পরে সকলে একস্বরে তাহা আবৃত্তি করে। কয়েকদিন এইরূপ ভিক্ষা করিয়া যাহা লাভ হয়, তদ্বারা পিস্টক, মিষ্টান্ন প্রভৃতির জন্য আবশ্যক দ্রব্যসমূহ ক্রয় করা হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিন কোনও বনের ধারে রাখাল বালকগণ সকলে সমবেত হয় এবং সেখানে পিস্টক মিষ্টান্ন ইত্যাদি পাক হয়। খড় দ্বারা ত্রিভুজাকৃতি করিয়া একখানা কুলা তৈয়ার করা হয়। তাহাতে পিঠা ও মিষ্টান্নাদি সাজাইয়া বনের ধারে বাঘাইর উদ্দেশ্যে রাখিয়া আসা হয়।'[১২]

বর্তমানে নেত্রকোণার দুয়েকজন প্রবীণের কাছে 'বাঘাইর বয়াত' বা 'বাঘের বরতো'-এর কথা নামমাত্র শোনা যায়। পুরোপুরি মনে নেই দীর্ঘদিন চর্চার অভাবে। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের কাছেই এ ব্রতের বিষয়ে বেশি তথ্য পাওয়া যায়। যারা ব্রতশিল্পী অর্থাৎ ব্রতকথা বলায় পারদর্শী তারা নিজেরা মেয়ে হিসেবে 'বাঘাইর বয়াত'-এর কথা বা ছড়াগান নিজেরা অভিনয় না করলেও শুনে শুনে শিখেছিলেন। এখনও কিছু কিছু বলতে পারলেও পুরোপুরি উদ্ধার করতে পারেন না নিজেদের স্মৃতি থেকে। যেমন রেনু সরকার, বয়স ৮০, মল্লিকপুর, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা, ০৮/০৬/২০১৯, 'বাঘের বরতো' বলে অভিহিত করে জানান, মাঘ-ফাল্গুনে পূর্ণিমায় আগে এই ব্রত হতো। এর বেশি কিছু বলতে পারেননি। মোহনগঞ্জের বড়কোট গ্রামের নিতাই চন্দ্র দে জানান, প্রায় পনের-বিশ বছর ধরে 'বাঘাইর বরতের' মাগন তারা করেন না। যদিও নিতাই এখনও কিছুটা মনে রেখেছেন। তার বলা মাগনের কথা এবং *'ময়মনসিংহের ইতিহাস'* বইয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিকের 'বাঘের বয়াত'-এর কবিতা মিলিয়ে নিলে কথা হারিয়ে যাওয়া বর্তমান ভগ্নাংশ রূপটি স্পষ্টতই ধরা পড়ে। বড় বড় হিন্দু কৃষকের বাড়িতে এখনও কিছু কিছু হয়ে থাকে। তবে নিয়মিত নয়। এভাবে খণ্ডিত স্মৃতির দেখাই বেশি পাওয়া যায়। এই ব্রতের বিষয়ে মতামত পাওয়া যায় বাংলা একাডেমি থেকে ২০১৮ সালে নেত্রকোণার ওপর প্রকাশিত 'বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা'য়। 'বাঘাই ব্রত/বাঘাই সিন্নি' নামে নেত্রকোণার হাওরাঞ্চলে এর প্রচলন থাকলেও 'এখন আর নেত্রকোনার হাওরাঞ্চলে বাঘাই সিন্নির আয়োজন হয় না।'[১৩]

তবে সার্বিকভাবে নেত্রকোণা অঞ্চলে 'বাঘাইর বয়াত'-এর একটা ক্ষীণ ধারা এখনও বর্তমান। বাঘের উপদ্রব বর্তমানে নেই। তবে গরু হারানো গেলে এখনও এই ব্রত মানসিক (মানত) করে করতে দেখা যায়। দুই গ্রামের বিবাদে এক গ্রামের লোক আরেক গ্রামের সকল কৃষকের গরু বাড়ি বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। ২০২০ সালে করোনাকালীন এ ঘটনা ঘটে রামপাশা গ্রামে। থানা পুলিশ করেও গরু ফিরে পাওয়া যায় না। তাই 'বাঘের বরতো' মানসিক করে রামপাশা গ্রামের নারী কাজল দেব। ব্রতটি করে তার কৃষক ছেলে চন্দন দেব। হারানো গরু ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তন্ত্রমন্ত্রহীন এই ব্রতের আয়োজন।

২। ত্রিনাথের মেলা– কেদারনাথ মজুমদার মুসলমানদের মধ্যে তেন্নাথপীর বা হিন্দুদের মধ্যে তেন্নাথঠাকুরের সেবার যে কথা ও পদ্ধতি জানাচ্ছেন, তা বর্তমান সময়েও হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত তিননাথ সেবার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। পার্থক্য হলো, তিনি বলছেন, মুসলমানেরা নিজেরা এই সেবা

করে না। মানত করলে হারানো গাই বাছুর ফিরে পেলে, তখন গাঁজাসেবীদের পয়সা বা উপকরণগুলো দিয়ে দেন এই মেলা করার জন্য।[১৪] এখানে ত্রিনাথের মেলা বলা হলেও বর্তমানে নেত্রকোণার হাওর এলাকায় (মোহনগঞ্জের বড়কোট বা রামপাশা গ্রামে বা কলমাকান্দায়) একে সেবা বলা হয়। দেখা যাচ্ছে, এইসব 'উৎসব', 'সেবা' বা 'মেলা'-তে আলপনা নেই। অনেক মেয়েলি ব্রতেও আলপনা নেই। আলপনাবিহীন বা আলপনাসহ এই বৈশিষ্ট্য দিয়ে ব্রতগুলোকে খাঁটি ব্রত বা আদিম ব্রত হিসেবে দেখার সুযোগটি বোধহয় প্রশ্নসাপেক্ষ। অনেক খাঁটি মেয়েলি ব্রতে যেমন আলপনার দেখা পাওয়া যাবে না, তেমনি অনেক শাস্ত্রীয় ব্রত বা নারী ব্রতেও আলপনা নেই।

তিননাথের সেবা, গোরক্ষনাথের সেবা, কল্কিনারায়ণ ব্রত ইত্যাদি পুরুষ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে। এইসব সেবার কিছু প্রচলন আছে। নেত্রকোণা ছাড়াও ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, বরগুনা অঞ্চলে এ মেলার প্রচলন এখনও আছে। ফরিদপুর অঞ্চলে প্রচলিত ত্রিনাথের কাহিনিতেও হারানো গরু ফিরে পাবার কথা আছে।[১৫] যে কাহিনির গড়ন নেত্রকোনায় প্রচলিত কাহিনির অনুরূপ। বরগুনা অঞ্চলের মেলার কথায় বৈষ্ণব সংকীর্তনের প্রভাব পড়লেও মূল কাঠামো একই। মানিকগঞ্জেও একই রূপ পাওয়া যায়।[১৬] 'পঞ্চগড় অঞ্চলে কিছুদিন আগে পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী রংপুর-জলপাইগুড়ির অনুরূপ 'গোরক্ষনাথের গান' পরিবেশিত হত। বর্তমানে এর প্রচলন অতি বিরল।'[১৭]

নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ থানার রামপাশা, মল্লিকপুর বা খালিয়াজুড়ি থানার শালদিঘা গ্রামে এখনও এইসব ব্রতের প্রচলন আছে। এসব গ্রামে ব্রতকথা দিয়েই ব্রতটি করা হয়। তবে কলমাকান্দা থানার শুনই গ্রামে পাঁচালি পড়ে গোরক্ষনাথের সেবা বা কল্কিনারায়ণ ব্রতটি করতে দেখা গেল। প্রচলিত পাঁচালির সাথে ব্রতকথার তফাৎ কথার মধ্যে খুব বেশি নেই। শালদিঘা, রামপাশা, মল্লিকপুর গ্রামে তিনজন ব্রতীর কাছ থেকে প্রায় একই কথা পাওয়া যায়। রামপাশা গ্রামের ব্রতকথায় ও আলপনায় দক্ষ একজন নারী কাজল দেব (বয়স ৬৭ বছর, বর্তমান নিবাস: খুরশিমূল, রামপাশা, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা। বাবার বাড়ি একই থানার সমাজ গ্রামে)-এর দেখা মেলে, যিনি ব্রত কথাটি জানেন। তবে তিনি অন্য তিনজনের মতো কথায় তিনটি ঘটনার পরিবর্তে একটি ঘটনার বয়ান করেন। তাঁর মতে, 'কল্কিনারায়ণের কথাডা তিনবার কয়। তবে এই কথাডাই সঠিক। অন্য কথাগুলো তিনি জানেন না। এই বরতোডা সৃষ্টি অইছে খাইল্যাজুড়ি থাইক্যা। এই বরতোডা আমরার এলাকায় নাইগা। (কাজল দেবের বাপের বাড়ি ছিল মোহনগঞ্জের সমাজ গ্রামে) অহনও তো অনেক জায়গায় নাই। খাইল্যাজুড়ির এক লোক ছেলে বিয়া করাইছিন, ছেলে বিয়া করাইলে, এই যে ছেলের বাপ বুড়া মানুষ যে এনো আইছে, কল্কিনারায়ণ ফূজাডা এনো আইয়া প্রছার কইরা থইয়া গেছে। এই অহন বেক দেশ ছিতরাইছে।'[১৮] কাজল ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর গাই-বাছুর কেনার কথা বলেন। তার বলার ধরনে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর যৌথ জীবনের গল্প অন্যান্য কথকের মতোই বর্ণিত হয়েছে। যদিও কাজলের কথায় ব্রাহ্মণীর ২৬ টাকা দিয়ে গাই কেনার আশা ও সংকট অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। ফলে পুরুষের ব্রতকথা নারী আয়ত্ত করলে গল্পের মধ্যে যে মাত্রাগত ভিন্নতা তৈরি হয়, তা বোঝার সুযোগ তৈরি করে কাজল দেবের কথনশৈলী।

পাঁচালিতেও ব্রতকথা মানেই মেয়েলি অনুষ্ঠানের ধারণাটি প্রকাশ পেয়েছে। পুরুষ রচিত পাঁচালির সাথে সাহিত্যলক্ষ্মী কাজল দেবদের কথনশৈলীর তফাৎ স্পষ্ট। যতটা স্পষ্টতা থাকে লোকায়ত জীবনবোধের সাথে পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক নীতিবোধের। লক্ষ্মীর পাঁচালিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে–

মন দিয়া শুন সতি আমার বচন।
লক্ষ্মীব্রত নরলোকে কর প্রচারণ॥
প্রতি গুরুবারে মিলি যত নারীগণে।
পূজিয়া শুনিবে কথা ভক্তিযুক্ত মনে॥[১৯]

এসব পাঁচালিতে ঘটনা যাই হোক, তাতে ব্রতীর পরিচয় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত ধারণার ছাঁচে ফেলেই যেন কল্কিনারায়ণ বা গোরক্ষনাথের সেবার পাঁচালি লেখার চেষ্টা। ফলে ব্রতীর পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। যে দ্বন্দ্ব পাঁচালি ও ব্রতকথাকে পাশাপাশি পাঠ করলে পরিষ্কার হয়। কল্কিনারায়ণের পাঁচালিতে পয়ারের শুরুর দিকেই জানানো হচ্ছে–

'বুদ্ধিহীনা অল্পমতি আমি হেন মূঢ়মতি।'[২০] ফলে ধরে নেওয়া যায় ব্রতী হচ্ছেন নারী। কিন্তু কাহিনির ভেতরের দিকে এবার তাকানো যাক। পাঁচালির ভেতরে শম্ভু কুষ্ঠ রোগী, যে নৌকা চালাতে পারে না। কল্কিনারায়ণের বরে সুস্থ হয় এবং শম্ভু ও নিশম্ভু দুই ভাই এখানে ব্রতী। পাঁচালিতে মিশ্র ব্রতের রূপ পাওয়া যায়, যেখানে ব্রত করতে গিয়ে পূজা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই পূজার বিধি অনুযায়ী পূজা শেষ হলে বলা হয়েছে 'সবে মিলে ধ্বনি দিবে পূজা শেষ করিয়া'।[২১] যেখানে লক্ষ্মী পাঁচালিতে বলা হয়েছে– 'কথা-শেষে উলূ দিয়া প্রণাম করিবে।'[২২] কল্কিনারায়ণের ব্রতকথায় অন্ধ ও আঁতুর-এর কাহিনিতেও দুই পুরুষকেই ব্রতী বলা হয়েছে। পাঁচালিতে তৃতীয় ঘটনায় ব্রাহ্মণ পুরুষও ব্রতী। এবং তিনটি ঘটনার পরম্পরায় বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কল্কিনারায়ণের সেবা বা ব্রত পুরুষ দ্বারাই করার কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ কাহিনিতে ব্রাহ্মণ তামাকের নেশায় যখন শিষ্যের বাড়ি যান, তখন সেখানে দেখতে পান–

'নেশাতে বিভোর হয়ে তামাক টানিছে সাতজনা।'[২৩] তারপর পদাঘাতে সকল প্রসাদ ফেলে দেওয়া এবং পুনরায় শিষ্যের বাড়ি গমন ইত্যাদি পরম্পরায় নিশ্চিত হওয়া যায় এখানেও পুরুষ ব্রতীর কথাই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, নারী ও পুরুষের ব্রতকথার মধ্যেই কি তার সূচকগুলো এভাবে ধরা পড়ে? কলমাকান্দার শুনই গ্রামে ব্যবহৃত হচ্ছে *বৃহৎ বারোমেসে মেয়েদের ব্রতকথা* (২০০৭) বইটি। যেখানে ১০৫টি ব্রতের উল্লেখ করা হয়েছে ব্রতবিধিসহ। তার মধ্যে ব্রতকথা আছে ৫৯টি ব্রতের। এছাড়া ছয়টি ব্রত আছে, যা শুধু 'ছড়া' (অবনীন্দ্রনাথসহ অন্য গবেষকরা একে ছড়া বলেছেন) বা 'মন্ত্র' (ব্রতকথার বইয়ে মন্ত্র বলা হয়েছে)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও নেত্রকোণা অঞ্চলের ব্রতীরা এর কোনোটাই ব্যবহার করেন না। তারা ছড়া বা গদ্য যে রীতিতেই কথাটা অনুসৃত হোক না কেন, একে 'কথা' বলেই উল্লেখ করেন। এবং ছয়টি ব্রতে প্রথমে ছড়া বা মন্ত্র এবং পরে ব্রতকথা সংযুক্ত আছে। বাকি ব্রতগুলোতে কোনও কথা নেই। উল্লেখিত বইয়ে যতগুলো ব্রতে ছড়ার ঢঙে কথা আছে, সবগুলোতেই স্পষ্ট করে ব্রতীর লৈঙ্গিক পরিচয়টি প্রকাশ করা হয়েছে। সকল ছড়াই নারীর অবস্থান থেকে উচ্চারিত হয়েছে। এসব ব্রত ও ছড়ার অধিকাংশের

দেখাই অবনীন্দ্রনাথের বইয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু ছড়া মানেই ব্রতী নারী– এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সুযোগ নেই। নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জের রানীগাও গ্রাম থেকে ৭৫ বছর বয়সী কালু চন্দ্র দের কাছ থেকে ১৪/০৮/২০১৯ তারিখে সংগ্রহ করা 'তিননাথের সেবা'র কথাটি তার অন্যতম প্রধান প্রমাণ–

কলির যুগে তিলাপীর
হইলেন অবতার
যে যাহা কামনা করে
সিদ্ধি হবে তার

সোনার ঘোড়া রূপার ডিম
তিনাথ ঠাকুর আইলেন সেবার দিন
আইলেন তিনাথ ঠাকুর
বইলেন কুষ্ঠি কাঠে
তিনাথের সেবা হাতে হাতে বাড়ে

কলির যুগে তিলাপীর
হইলেন অবতার
যে যাহা কামনা করে
সিদ্ধি হবে তার

সোনার ঘোড়া রূপার ডিম
তিনাথ ঠাকুর আইলেন সেবার দিন
আইলেন তিলাঠাকুর
বইলেন কুষ্ঠি কাঠে
তিনাথের সেবা হাতে হাতে বাড়ে

কলির যুগে তিলাপীর
হইলেন অবতার
যে যাহা কামনা করে
সিদ্ধি হবে তার

সোনার ঘোড়া রূপার ডিম
তিনাথ ঠাকুর আইলেন সেবার দিন
আইলেন তিনাথ ঠাকুর
বইলেন কুষ্ঠি কাঠে
তিনাথের সেবা হাতে হাতে বাড়ে

তিলাপীর তিলাপীর
আসমান জমিন কইরা স্থির
হিন্দুর দেবতা মুসলমানের পীর
এরে যে না মানে দুনিয়ার কাফির

তিলাপীর তিলাপীর
আসমান জমিন কইরা স্থির

হিন্দুর দেবতা মুসলমানের পীর
এরে যে না মানে দুনিয়ার কাফির

তিলাপীর তিলাপীর
আসমান জমিন কইরা স্থির
হিন্দুর দেবতা মুসলমানের পীর
এরে যে না মানে দুনিয়ার কাফির'[২৪]

এই তিননাথের সেবা পুরুষেরা দিয়ে থাকে। নেত্রকোণার বাইরে অন্যান্য জেলাতেও তিননাথের সেবা প্রচলিত ছিল। বরিশালে ঝালকাঠি অঞ্চলের কেওড়া গ্রামের মিহির সেনগুপ্ত ১৯৪৭-উত্তর কালের বিবরণে তিননাথের সেবার কথা উল্লেখ করেছেন। মিহির সেনগুপ্তের *বিষাদ বৃক্ষ* (২০১৩) বইয়ে এই তিননাথের সেবার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতেও পুরুষ প্রাধান্যই চোখে পড়ে। তাঁর বিবরণ:

> এ ছাড়া তারা আরও এক কীর্তনের আসর করত এসময়। সেই আসরের নাম তেন্নাথের মেলা। এই আসরের নাম মেলা, শুধুমাত্র কীর্তন নয়। গরিবগুরবোদের অসহায়তার কথা ভেবেই যেন কোন সুজন এই সরল মেলা-কীর্তনটির সৃজন করেছিলেন। আমাদের বাল্যকালে ওই সময় এর ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। এই উৎসবে খরচ মাত্র তিন পয়সা। প্রায় ব্রতকথার মতোই এই অনুষ্ঠান। তেন্নাথ বা ত্রিনাথ। বেম্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সম্মিলিত রূপ। তাঁর কৃপায় হারাইয়া যাওয়া গাই ফেরত পাওয়া যায়। 'বাঁজা গোরু ডাকে' এবং গর্ভিণী হয় এবং আরও সব অসম্ভব-অসম্ভব কাণ্ড ঘটে, যা কৃষি এবং পশুপালনকারী মানুষদের সমস্যা-বিষয়ক। এই তেন্নাথ গোঁসাইয়ের মহিমা একটা সময় থেকে এদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করলে দাঙ্গার পরবর্তীকালে এখানকার অবশিষ্ট মধ্যবিত্তরাও তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে। বাড়িতে মানত করা হত তেন্নাথের মেলার। বনমালী, লালু, যদুনাথ ইত্যাদিরা তাদের সংকীর্তনের দল নিয়ে এসে তখন এই তিন পয়সার পালা গেয়ে যেত। এক পয়সার পান-সুপারি, এক পয়সার বাতাসা আর এক পয়সার গাঁজা– এই হল পূজার উপকরণ। বনমালী দেবনাথ গাইত–
>
> আমার ঠাহুর তেন্নাথ গোঁসাই
> কিছুই না সে চায়
> এক পয়সার গাঁজা পাইলে
> ডুগডুগি বাজায়।[২৫]

নেত্রকোণা থেকে সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার কোথাও কোথাও আরেকটি পুরুষ ব্রত এখনও চালু আছে। যদিও কলমাকান্দায় পাঁচালি পড়ে এই ব্রতটি করতে দেখা গেছে। কিন্তু রানীগাও-এর কালু চন্দ্র দে গোরক্ষনাথের সেবার যে ছান্দিক কথা বলেন, তাতে বিষয়ের চেয়ে সাহিত্যিক আনন্দের প্রকরণটি কোনও অংশে কম নয়–

তুপরানি তুপবাজে
চালকুড়ানি ভমুট বাজে
বাজে ঝুমুট, বাজে তাল
আমার গুরু জগৎনাল
জগৎনাল রিমিঝিমি
সোনা বানাইলাম পাঁচ টিমি।

ওরে আড়াইলা বাঁশ
আগে ধরনে লেখে হাস
হাস লেখিয়া লেখলেন মোয়া

গোরকনাথ খাইলেন পান-গোয়া
গোয়া খাইয়া লাগিল চুন
গোরকনাথ যাবেন বিক্রমপুর।

বিক্রমপুরের কালো পানি
বাপ থইয়া পুত আনি
বাপ মরলো আল-জালে
পুত মরলো মরিচের ঝালে
মরিচ গাছে আল-ঝাল
ফিরে আইলেন গোরকনাথ।

গোরকনাথের সাজা আছে
তাই দেখিয়া হামন আছে
হামিন নারী বর মুনমিয়া
তাই মরেছে দেড়মন শিয়া।

ভাই মারিয়া আছ শোকে
আল জুড়িছে উত্তর রুখে
আল চও না পাল চও
বাড়ির পাশে হাতপাও ধোও।

ঘরের পাশে সেনের পাত
সতাইয়ে ঢাইলা দিছে আম্বল ভাত
আম্বল ভাত দিয়ে সতাইয়ে না দিছে নুন
সতাইর বাপের মুখে কালি আর চুন।

মাগি বলে মরমুন শিয়া
মুর কথা শুন
প্রথম বৈশাখে নালিতা বুন
নালিতা বুনিলে উঠল নাইচ্যা
দিলাম বাইচ্যা, হইলো ডাঙ্গর
আগগুঁড়ি কাটিয়া মধ্যখানে ভাসাইলাম সায়রে
হইল কুইড়া, লইলাম ছয়পায় ধুইয়্যা
দিলাম রৌদ্রে, পাট হইলো মন চৌইদ্দ।

পাটে বলে পাটনি, মুই বড়বীর
আমারে দিয়া গরু বাছুর বানলে
গরু বাছুর হয় স্থির।
পাটে বলে পাটনি মুই বড়বীর
আমারে দিয়া হাতিঘোড়া বানলে
হাতিঘোড়া হয় স্থির।
পাটে বলে পাটনি, মুই বড়বীর
আমারে দিয়া সব জন্তু বানলে
সব জন্তু হয় স্থির।

গোরকনাথ গেলেন বাইন্যাবাড়ী
ঘরে আনলেন সোনার লড়ী।
সোনার লড়ী পিনবো বুনে
গরু বাছুর ছাইড়া দিলাম গোরকনাথের পূণ্যে।

কেমনে চিনি কেমনে চিনি
হাতের লড়ি মাথায় টুপ
গাঙ্গের পাড়ে পাড়ে পিক
তারে কয় রাখ্যাল বীর
পিক দিয়া তুললো মাটি
বসাইলাম কুমারের হাড়ি
কুমারের ঝিগো, কুমারের ঝি
গোরকনাথের পাতিল যোগাবেনী।

কেমনে চিনি, কেমনে চিনি
হাতে লড়ি মাথায় টুপ
পিক দিয়া তুললো মাটি
বসাইলাম গোয়ালের হাটি
গোয়ালের ঝিগো, গোয়ালের ঝি
গোরকনাথের দই যোগাবেনী।

কেমনে চিনি কেমনে চিনি
হাতে লড়ি মাথায় টুপ
পিক দিয়া তুললাম মাটি
গাঙ্গের পাড়ে পাড়ে পিক
তারে কয় রাখ্যাল বীর
পিক দিয়া তুললাম মাটি
বসাইলাম লোহাইতের হাটি
লোহাইতের ঝিগো লোহাইতের ঝি
গোরকনাথের কই যোগাবেনী।

কেমনে চিনি কেমনে চিনি
হাতে লড়ি মাথায় টুপ
গাঙের পাড়ে পাড়ে পিক
তারে কয় রাখ্যাল বীর
পিক দিয়া তুললাম মাটি
বসাইলাম শালুকের হাটি
শালুকের ঝিগো, শালুকের ঝি
গোরকনাথের গুড় যোগাবেনী।

কেমনে চিনি কেমনে চিনি
হাতে লড়ি মাথায় টুপ
গাঙের পাড়ে পাড়ে পিক
তারে কয় রাখ্যাল বীর
পিক দিয়া তুললাম মাটি

বসাইলাম বাড়ইয়ের হাটি
বাড়ইয়ের ঝিগো, বাড়ইয়ের ঝি
গোরকনাথের পান গোয়া যোগাবেনী।

আইলেন গোরকনাথ ঠাকুর
বইলেন কুস্তিকালে
গোরকনাথের সেবা
হাতে হাতে বাড়ে।

পোলাপান কথার মাঝে মাঝে বিষয়ান্তরে যখন যাবে তখনই বলবে পাঁচচইল পাঁচচইল...'[২৬]

আবার বারোবাঘ ব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার ব্রতী মূলত পুরুষ বা বালক–

এই পূজার উৎসবটি তথাকথিত ভদ্রসমাজে প্রচলিত ছিল না। শীতের এই সময়টায় গেরস্থের নতুন ফসল কাটা হয়েছে। খাটুয়া মানুষদের হাতে বিশেষ কাজ নেই। তাই এই উৎসবটি উপলক্ষ করে গেরস্থের গোলা থেকে কিছু সংগ্রহ করা। সন্ধ্যের সময় জনা দশ-বারো লোক এসে গেরস্থের আঙিনায় ধ্বনি দিত, ঠাকুর কুলাই ভো। ব্যস অমনি সবাই ছুটে এসে অঙ্গনে জমা হতো। তারা ছড়া বলত, বারোবাঘের ছড়া–

আইলাম লো সরণে
লক্ষ্মীদেবীর বরণে
লক্ষ্মীদেবী দিবেন বর
চাউল কড়ি বিস্তর
চাইল না দিয়া দিবেন কড়ি
শ্যাষ কাডালে সোনার লড়ি
সোনার লড়ি রূপার বাডা–

শুরুয়াৎটি অন্যভাবেও হতো। যেমন–

আইলাম লো লড়াইয়া
হস্তীর পিডে চড়ইয়া
হস্তী গেল রে
হস্তী গেল বেগমপুর
বেগমপুরে কী কাজ করে
রাজার মায়না খাইয়া বাচে–

এরকম সব ছড়া বলার পর শুরু করত বারোবাঘের পরিচয়। তা-ও ছড়া করেই বলত। এই সময় নানা ধরনের অশ্লীলতা প্রযুক্ত বাক্য পদের ব্যবহার করত তারা। তবে গেরস্থ-গেরস্থানিরা তাতে কোনও দোষ তো ধরতেনই না উপরন্তু মজা উপভোগ করতেন প্রচুর। অবশ্য প্রকৃত অর্থে এগুলোকে ঠিক অশ্লীল বলা হয়ত সংগত হয় না। এখানকার এবং বিশেষত এসব মানুষের ভাষা শব্দপদ এরকমই। তারা ছড়া কাটত–

এক বাঘরে
এক বাঘ ছৈলা গাছে
মুত্ইয়া দিল রে
মুত্ইয়া দিল ভ্যাদামাছে–

অথবা
এক বাঘের রে
এক বাঘের কপালে সিন্দুর
পোলা বিয়ায় রে
পোলা বিয়ায় ঝাপউয়া ইন্দুর।[২৭]

সংগৃহীত পুরুষব্রতের বর্তমান নমুনা

পুরুষ-ব্রতের কয়েকটি নমুনা মাঠঘুরে সংগ্রহ করা গেছে। উপরে ইতোমধ্যে তিননাথের সেবা ও গোরক্ষনাথের সেবার কথাটি আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। বলা যায়, তিনটি সেবা বা ব্রতের কথার ধরন তিনরকম। তার মধ্যে কল্কিনারায়ণ ব্রতটি ব্রতকথা দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ব্রতের ইতিহাস নির্মাণের বাইনারি অবস্থানকে প্রশ্ন করতে এবং পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব উত্থাপন করতে ব্রতকথার একটি নমুনা এখানে উপস্থাপন করা হলো। ব্রতটির নাম কল্কিনারায়ণ ব্রত। এই ব্রতটিও পুরুষ দ্বারা করা হয়ে থাকে। ব্রত ও ব্রতকথা পুরুষ কর্তৃক পরিচালিত ও ব্যক্ত হয়। ব্রত কথা যিনি বলেন, তাকে বলা হয় মোহান্ত। এই ব্রতে মোহান্তসহ মোট পাঁচজন পুরুষ ব্রতীর প্রয়োজন হয়। গ্রামে ব্রতীদের মধ্যে এই কথা 'শম্ভু-নিশম্ভুর কথা' বলে পরিচিত।

কল্কিনারায়ণ ব্রতকথা (কথকের মূল উচ্চারণ কখনও কল্হিনারায়ণ কখনও কল্কিনারায়ণ)**:** 'কেগো আফনেরা আমারে ঢেইয়াদিয়া যাইতেছেন গা, আমার কী নাম, কী ধাম, আমি কী কইরা খায়াম?

'তখনি শিবের রথ থামাইছে। থামায়ে কইতাছে তুই কলিতে কল্কিনারায়ণ ঠাকুর, তুই বাক্যিসিদ্ধ পুরুষ, তুই যাই কইবি তাই অইবো। আর এই কথা কইয়া শিব গৌরী গেছেগা কৈলাশে। আর এইদিক দিয়া কল্কিনারায়ণ ঠাকুর চিন্তা করতাছে আমি যদি কেউর কান্দে ভর না করি তাহলে তো আমার সেবা দুনিয়াতে প্রচার হইতো না।

'তখনি জালো পাড়াত আছিন এক জালো বাড়ি। দুই ভাই। শম্ভু, আর নিশম্ভু। শম্ভু অইছে গিয়া লুলা মানুষ, হে বিয়া করছে না। তার যে ছোড ভাই নিশম্ভু, হে বিয়া করছে আর তার বুড়া মা– এই তার সংসারে চাইরজন লোক। পার্শ্ববর্তী গ্রামের মধ্যে তিন চাইরদিন ধইরা একটা দরবার চলতাছিন, দরবারডা কেউ মীমাংসা করতে পারে না। তহনেই একজনে কইতাছে এই আমরা যে চাইর পাঁচদিন ধইরা দরবারডা করতাছি, দরবারডা মীমাংসা অয়না। নিশম্ভু একজন দরবাইরা লোক, নিশম্ভুরে দরবারে নিমনতন্ন করন লাগবো। তহনি অন্যেরা কইতাছে ঠিক আছে, কালকে দরবারডা ওক (হোক)। তহনি পরেরদিন একজন লোক গেছে। গিয়া, নিশম্ভুর কাছে গিয়া কইছে, আফনের দরবারে যাওন লাগবো আইজকে। বুলে, আমি দরবারে যাইতাম পারি; দরবার যদি রাত্রে অয়, তাইলে দরবারে যাইতাম পারি। আর দিনো অইলে যাইতাম না। বুলে, ঠিক আছে। রাত্রেই দরবার অইবো, আফনের যাওন লাগবো।

'নিশম্ভু মনে মনে ই করতাছে, আমি যে দরবারের লাগি কইয়া দিলাম, আমার তো রাইতে জাল ফালানি লাগবো। আচ্ছা জাল বাইলে ঠাহুরদারে লইয়া যাইয়ামগা লগে। তা উনি জালজালি যা কিছু আছিন, এইতা লইয়া নৌকার মধ্যে তুলছে। তুইলা কইছে– ঠাহুরদা? বুলে, কী? যে, আইজ তো আফনের জালো যাওন লাগবো। বুলে, এইডা কিতা কস্? আমি জালো গিয়া কী করবাম?

আমি লুলা মানুষ। বুলে, আফনেরে নৌকার মধ্যে বওয়াআ থুয়া আমার যাওন লাগবো একটা দরবারো। আফনে জালো বইয়া থাকতাতথাইনা? বুলে, হ্যা পারবাম। ফরে কী করছে–

ছবি: কল্কিনারায়ণ ব্রতে নিতুষ দেবের ব্রতকথার পর সকল ব্রতীগণ কল্কিসেবন করছেন (গ্রাম-রামপাশা, ডাক-খুরশিমূল,থানা-মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা, ০৯/০৮/২০১৯)।

ছবি: কল্কিনারায়ণ ব্রতকথার পর সকল ব্রতীগণ প্রণাম করছেন (গ্রাম-রামপাশা, ডাক-খুরশিমূল, থানা-মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা, ০৯/০৮/২০১৯)।

তার ঠাকুরদারে কান্দত কইরা নৌকাত নিছে। নিয়া ফরে তারা নৌকা ছাইড়া দিছে। নৌকা ছাইড়া দিয়া নদীর ওইপারে গিয়া কুডা কুইপ্যা ভালা কইরা দড়ি দিয়া নৌকাডা বাইন্দ্যা, তার ঠাহুরদারে নৌকাত থইয়া হে গেছেগা দরবারো। তে বেশ রাইত অইয়রছে। তহনি নদীর এইফাড় থাইকা ডাকতাছে, শম্ভু শম্ভু কইরা। চাইর-ফাচটা ডাহের ফরে রাও করছে।

–কে গো আমারে ডাকতাছুইন?

বুলে, শম্ভু তুই আমারে ফাড় কর। বুলে, এইডা কিতা কয়, ফাড় করবাম আমি? আফনে আমারে নাম ধইরা ডাকতাছুইন। অবশ্যই আফনে আমারে চিনুইন। আর আমি যে লুলা, এইডাও আফনে জানুইন। তাঅইলে কী কইরা আমি আফনেরে ফাড় করি? উনি এই ফাড় থাইকা কইতাছে শম্ভু; বুলে, তোর নৌকার মইধ্যে জাল আছে না? বুলে, হ, আছে। বুলে, জালের মইদ্যে তুই গড়াগড়ি কর। দেকবে তুই ভালা অইয়া যায়বেগা। তহন এই লোকের কথা বিশ্বাসে, এই নৌকাত যে জাল আছিন, জালের মইদ্যে কতক্ষণ গড়াগড়ি করছে। ভালা অইয়া গেছেগা। তহনি নদীর এইফাড়ে থাইক্যা কইতাছে–শম্ভু? বুলে, কী? বুলে, অহন ফাড় করতারবে? বুলে, হ ফাড়বাম।

ফরে কী করছে, খুডা উগরাইছে, উগরাইয়া নৌকা বাইয়্যা আইছেই। আয়া দেহে যে এক বুড়া বেডা খাড়ইয়া রইছে। এই বুড়া বেডারে নৌকাত তুলছে। নদী ফাড় করব। মাঝ নদীতে যহন আইছে, তহনি শম্ভু জিগাইতাছে– বুলে, আইচ্ছা আফনের কী নাম, কী ধাম? আমার কাছে আফনের ফরিচয় দেওহাইন। আফনের কথায় যে আমি লুলা মানুষ ভালা অইয়া গেলাংগা, আমি আফনের পরিচয় ছাই। যে শম্ভু? বুলে, কী? বুলে, আমি তো কলিতে কল্কিনারায়ণ ঠাহুর, আমি বাইক্যসিদ্ধ পুরুষ। যাই কই, তাই অয়। বুলে, হাছাইনি? বুলে–হ। তে আইচ্ছা, আফনের সেবা দিতে কী কী লাগে কওহাইন?

তহন এই কল্কিনারায়ণ ঠাহুরে কইছে, আমার সেবা দিতে ফাচ ছডাক ছাউল, ফাচ ছডাক গুড়, ফাচটা কলা, ফাচ ছুলুম তামুক, ধূপ-দীপ ইত্যাদি ইত্যাদি। ফাচ জাতের ফুল-ফল এইডা কইয়া, একটা কথা আছে। মোহন্তে কথাডা কইব। কথাডা কইয়া, এই মোহন্তের এক টান বরতীর একটান, মোহন্তের দুই টান, বরতীর দুই টান–এইভাবে ফাচটানে গিয়া শেষ অইব। এই কথা কইয়া যহন শেষ করছে, তহনি কল্কিনারায়ণ ঠাহুরে কইতাছে– শম্ভু? বুলে–কী? বুলে তোর নৌকার মইদ্যে জাল আছে, জালডা ফালা, এনও মাছ আছে।

তহন এই কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের কতায় জালডা কী করছে, বাইর কইরা নৌকাত থাইকা ফালায়ছে। ফালায়া অনেক কষ্টে টাইন্যা নৌকার মইদ্যে তুলছে জালডা। গিয়া দেহে জালের হাওয়ায় হাওয়ায় মাছ লাইগা রইছে। মাছের লোভ। মনে মনে কইতাছে, বুলে, জালডা আজাইর কইরা জালডা আবার ফালায়াম। তহনেই জালডা বাইর কইরা আবার যহন জাল ফালাইছে, জালের লগে নৌকাত থাইকা হেও ফইড়া গেছেগা জলের মইদ্যে। কাব্বওইয়া কুব্বয়াইয়া উঠছে। উইঠা দেহে বুড়া যে নৌকাত বইয়া আছিন, বুড়া বেডা নাই। তহনি নৌকা বাইয়া যেন নৌকাডা আছিন, হেন গেছে। গিয়া কুডা কুইপ্যা দড়ি দিয়া নৌকাডা ভালা কইরা বানছে। বাইন্দ্যা, লুলা মানুষ হঠাৎ কইরা ভালো অইছে। আডা-ছড়ি করনের মনে লইতাছে। এত রাত্রে আডা-ছড়ি কই

করবো? নৌকার মইদ্যেই, নৌকার আগাত থাইক্যা ফাছা দিয়া, ফাছা থাইক্যা আগা দিয়া, এইবায় নৌকার মইদ্যেই আডা-ছড়ি করতাছে।

আর এইদিক দিয়া কী করছে, নিশম্ভু যে দরবারও গেছিন, দরবার মীমাংসা অইছে। মীমাংসা কইরা নৌকার দিগে রওনা দিছে। আটতাছে আর মনে মনে ছিন্তা করতাছে, বুলে– ঠাহুরদারে থইয়া আইলাম, জায়গাডাও বেশি ভালা না। ঠাহুরদা লুলা মানুষ, রাত্রও অইয়রছে অনেক। এই নানানডা ছিন্তা-ভাবনা কইরা দুই কাইক আগগয়ায়, এক কাইক ফিচছয়ায়। এইবায় আইতে আইতে প্রায় নৌকার কাছাকাছি আইওরছে। তহনি নিশম্ভুর কানে একটা আওয়াজ অইছে, কে জানি আডা-ছড়ি করতাছে। তহনি একটা গলা আসকি দিছে। গলা আসকি দিলে নৌকাত থাইকা শম্ভু কইতাছে, কে রে তুই গলা আসকি দিলে? বুলে, আমি নিশম্ভু। যে আফনে কে? বুলে, আমি তোর ঠাহুরদাদা শম্ভু। বুলে, আমার বিশ্বাস অইল না। আমার ঠাহুরদাদা তো লুলা মানুষ। আফনে দেহা যায় নৌকাত আডা-ছড়ি করতাছুইন। বুলে, আমি তর লগে সত্য বললাম। তুই অনে আমার কাছে আয়। তহনি কী করছে, নিশম্ভু নৌকাত আইছে। আইয়া, শম্ভু সবকিছু বৃত্তান্ত ভাইঙ্গা কইছে; যে, ভালো অইছে। তহনি তারা দুইয়ে ভাইয়ে যুক্তি করতাছে, বুলে–আইচ্চা, এত মাছ, এই মাছেই অইবো, আর মাছ মাইরা কী অইবো? বুলে, না আর মাছ মারন লাগদো না। লও যাইগা আমরা বাড়ির ঘাডো। তহনি কী করছে, তারা দুই ভাইয়ে নৌকা বাইয়া বাড়ির ঘাডো আইন্যা নৌকা লাগাইছে। নৌকা লাগায়া নিশম্ভু শম্ভুরে কইতাছে, ঠাহুরদা? বুলে-কী? বুলে, আফনে লুলা মানুষ, ভালো অইছুইন। আফনে মার সাথে গিয়া সাক্ষাৎ করুইন। মা শুইন্যা খুব খুশি অইব। তহনি কী করছে–শম্ভু–ঘাডোত্তো গিয়া উইট্যা আটতে আটতে আইছে বাড়িত। আয়া মারে ডাকতাছে, মা, মা। চাইর-ফাচটা ডাহের ফরে তার মায়ে রাও করছে। কেরে তুই? বুলে, মা আমি শম্ভু। বুলে,তুই তো লুলা মানুষ, তুই জালো গেছিলে, তুই এত রাত্রে বাড়িত আইলে কেমনে? বুলে, মা আমি তো ভালো অইয়া গেছি। যেই ভালার কথা তার মায় শুনছে, বালিশের তলে যে ম্যাচ আছিন, ম্যাচটা টান দিয়া লইছে, বাতি জ্বালাইবো। আরেক বিছানার মধ্যে আছিন তার ফুতের বউ, নিশম্ভুর বউ; হে শাশুড়ির কাছ থাইক্যা আয়া ম্যাচটা কাইড়া লইয়া গেছে। অহন বুড়া বেডি গালাগালি করতাছে যে, অহন আমার লুলা ফুত ভালা অইয়া বাড়ি আইছে। দেহ আমি বাতি জ্বালায়াম, আর ম্যাচটা লইয়া গেছেগা কাইড়া। তহনি বউয়ে কইতাছে–আইচ্ছা আমি যে ম্যাচটা কাইড়া লইয়া গেছিগা, কিয়ের লাইগ্যা নিছিগা, এইডা তো আফনে জিগাইলাইন না? আফনে আমারে গালিগালাজ করতাছুইন। তহনি এই বেডির ছৈতন্য অইছে। মায়া এইডা তো টিহেই তো। আইচ্ছা কিয়ের লাইগ্যা নিছ, এইডা বুঝি? বুলে, ম্যাচটা নিছি এইডার লাইগ্যা–দেউকখাইন আমরার ফরিবারে চাইরজন লোক। আফনের দুই ছেরা, আফনে, আর আমি। ভাসুর ঠাহুরে বিয়াটিয়া করছে না। কোনোদিন জালোও যায় না। জালো না গেলেও তো পুরুষ মানুষ, লুলা অইলেও তো পুরুষ। আইজ যদি কোনো ষণ্ডা-গুণ্ডা জাইন্যা থাহে যে, ভাসুরটাহুর গেছেগা জালো, ভাসুরটাহুরের লগে সুর মিলায়া বাইরের থাইক্যা ডাকতে পারে। আফনে অহন বাতি জ্বালাইলে, বাতি জ্বালায়া গিয়া দুয়ার ঘুছাইবাইন, ঘরও আইয়া যদি আমার মান-ইজ্জত মারে, রক্ষা করতারবাইন? ভাসুরটাহুর ভালা অইছে তো আমরার সবারই আনন্দের বিষয়। সহালে সাক্ষাৎ

করলে অয় না? তহনি বুড়া বেডি মনে মনে ই করতাছে; বুলে, এইডা তো টিহেই কইছে। তহনি কইতাছে, আবুরে তুই যাগা অহন। সহালে সাক্ষাৎ অইবোনে।

তহনে শম্ভু যে বাইরে আছিন, শম্ভু আটতে আটতে গেছেগা নৌকাত। গিয়া তারা দুইও ভাইয়ে যুক্তি করতাছে, মাছ কেমনে বাজারো নিবো। যদি ফুজা দিয়া নেয়, তাইলে বাজারডা এট্টু কাছে। আর নৌকা বাইয়া গেলে নদীর বাঁক। কয়েকটা বাঁক ঘুরায়া যাওন লাগে, দূরা অয়। তহনি তারা দুই ভাইয়ে সিদ্ধান্ত করছে–এই নৌকা লইয়াই যাইবো। তহন এইহান থাইক্যা নৌকা ছাইড়া দিছে। রাত পোয়ানির লগে লগে বাজারের ঘাডো গিয়া নৌকা লাগাইছে। লাগায়া মাছ নিয়া তুলছে। অহন বাজার জমছে। অনেক টেহা-ফইসার বিহিকিনি করছে। বিহিকিনি কইরা আইছে নৌকাত। তার ঠাহুরদারে কইতাছে, ঠাহুরদা? বুলে, কী? যে, নৌকা ছাইড়া দেই। বুলে, হি নৌকাতো ছাড়নেই। তবে তুমি আমারে কয়েকটা টেহা দেও। বুলে, আফনে টেহা দিয়া কী করবাইন? বুলে, আমি কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের সেবা দিয়াম।

তহনি নিশম্ভু কয়েকটা টেহা দিছে। এই টেহা লইয়া গেছে বাজারও। গিয়া গুড় কিনছে, আতপ ছাউল কিনছে, কলা কিনছে, যাবতীয় যা কিছু লাগে ধূপদীপ–এইডি সবডি কিনছে। অনেকে তো তারে ছিনেও লুলা মানুষ যে। অনেকে জিগাইছে, অনেকের কাছে কইছেও–বুলে, আমি কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের কৃপায় ভালা অইছি। বাজার-টাজার কইরা আইছে নৌকাত। আয়া নিশম্ভুরে কইছে–নিশম্ভু? বুলে, কী? বুলে, এখন নৌকা ছাড়ও। তে নৌকা তারা দুই ভাইয়ে বায়া বাড়ির ঘাডো আইন্যা নৌকা লাগাইছে। লাগায়া জালজালি যা কিছু আছিন, সম্পূর্ণ বাড়িত নিয়া তুলছে। তুইল্যা তারা ছানটান কইরা খাওয়াখাইদ্য করছে। খাওয়াখাইদ্য করলে, তহনি শম্ভু নিশম্ভুরে কইতাছে–নিশম্ভু? বুলে, কী? বুলে, আমি যে কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের সেবা দিয়াম–সারা গ্রামে নিমন্তন্নো কইরা আইয়ো। তহনি কী করছে? শম্ভুর কথায় নিশম্ভু সারা গ্রামে নিমন্তন্নো করছে–বুলে, কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের সেবা।

আর এইদিক দিয়া শম্ভু লুলা মানুষ যে ভালা অইছে, পার্শ্ববর্তী গ্রামের মধ্যে আছিন এক কানা, আর এক লুলা–এরা শুনছে। শুইন্যা, আজকে যে কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের সেবা দিবো–এইডাও শুনছে। শুইন্যা এই লুলায় রওনা দিছে গইড়িয়া গইড়িয়া,আর কানা লাডি বাইড়িয়া রনা দিছে। তারা দুওজনেই শম্ভু জালোর বাড়িত আইয়া, কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের সেবা যহন অইবো, তারা দুওজনেই মানসিক করবো। তারা যদি ভালো অয়, তারাও সেবা দিবো। এই মানসিক করনের লাইগা রওনা দিছে। অহন এই লুলা যে গইড়িয়া গইড়িয়া আইতাছে, আর কানা বাইড়িয়া বাইড়িয়া আইতাছে, কানার লাডির বাড়ি ফইরা গেছেগা লুলার মাথাত। লুলায় কইতাছে, এই শালা কানার ঘরের কানা, তুই আমার মাথাত বাড়িডা মারলে! কানায় কইতাছে, ভাই দেখ, তোর লাগে তো আমার কোনো শত্রুতামি নাই। দেখ, আমি কানা মানুষ, অন্ধ মানুষ, ফত (পথ) দেহি না। লাডি দিয়া বাইড়িয়া বাইড়িয়া ফতটা ঠাহর কইরা আডি। তহনেই লুলায় কইতাছে, এইডা তো টিহেই। অন্ধ মানুষ, লাডি দিয়া ঠাহর দেয়। তহনি কইতাছে, এই কানা তুই যাইবে কই? বুলে, আমি শম্ভু জালোর বাড়িত যায়াম। শম্ভু জালো কল্কিনারায়ণের সেবা দিবো। আমি সেবা মানসিক করতাম যায়াম। এই লুলা তুই কই যাইবে? বুলে, আমিও তো এনোই যায়াম।

কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের সেবা মানসিক করণের লাইগা। দুওজনেই এক জায়গাতেই যাইবো। তহনেই লুলায় কইতাছে, এই কানা? বুলে, কী? বুলে, একটা কাজ করি, দেখ আমার গইড়িয়া গইড়িয়া যাওন লাগে। আমার আত-পাও ভালা না, লুলা মানুষ। হ্যাঁ, যাইতে বিরাট অসুবিধা অয়। দেখ, ফিডের ছাল ছামড়া উইট্টরতাছে। তরও তো অসুবিধা অয়। উষ্টা খাইয়া ফইরা যাছগা। হ্যাঁ, তরও কষ্ট অয়। বুলে, একটা কাম করি। বুলে, কিতা? বুলে, তোর তো ফাওডি ভালা আছে। আমার আত-ফাও ভালা না, আমি তো চৌক্ষে দেহি। তুই তো চৌক্ষে দেহছ না। তর কান্দো আমি উইট্টরি, আমি ফথ দেহায়া দিয়াম, আর তুই ঠাইস্যা আইট্টা যাইবেগা। তহনেই একজনের চৌখ, আরেকজনের ফাও, যাইতে যে অসুবিধা লাগবো, এইডা আর তারার কোনো জ্ঞাতো নাই।

অহন অনেক কষ্টে লুলায় কানার কান্দো উটছে। লুলায় ফথ দেহায়, কানায় আডে। উছা-নিছাও তো আছে। অনেক সময় উষ্টা খাইয়া ফরে আবার উডে। এইভাবে যাইতে যাইতে শম্ভু জালোর বাড়িত গিয়া উডছে। আর এইদিক দিয়া এই গ্রামেই আছিন এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। তার নাম মাধব। হে খুব তামুক পিয়োসী। তার পেশা একমাত্র ভিক্ষা। আর এই মাধবের ফরিবারে তিনজন লোক, মাধব, মাধবের স্ত্রী, আর মাধবের বারো বচ্ছরের ছেরা। ছেরায় মাধবরে বাপ ডাহে না। তহন এইদিন কী করছে, মাধব যহন ভিক্ষায় যায়, মাধবের যে গাই-বাছুর আছিন, ভিক্ষায় যাওনের সময় গাই-বাছুরডা নিয়া ফতের কানিত ডিগরা দিয়া, সারাদিন ভরা ভিখশিক কইরা যহন বাড়িত ফিরে, এই গাইবাছুরডা আইন্যা আরেকবার ঘরও বান্দে। এইভাবে মাধবের দিন যাইতাছে। তো এই দিন কী করছে, মাধব যহন ভিক্ষায় গেছে, গাই-বাছুরডা নিয়া ফতের কানিত ঠিহেই বানছে। কিন্তু এইদিন আওয়োনের সমো গাই-বাছুরডার কথা আর এই মাধবের খিয়াল নাই। রমারম আইওরছে বাড়িত। ভিক্ষার ঝুলি ঘরও থুইয়া একটা টিক্কা ফুরাত দিছে। কল্কির মইধ্যে তামুক ভরছে। তামুক খাইবো। এমন সমোয় হঠাৎ কইরা মনো অইছে–বুলে, বাফরি আমি যে তামুক খাওয়াত বইওরতাছি, আজকে তো আমার গাই-বাছুর আওনের সমোয় আনতাম খিয়াল নাইগা। তহনি দেহিগাছেনে গাই-বাছুরডা আনছে কিনা। এইডা মনে মনে সিদ্ধান্ত কইরা তহন ঘরও যে হাইরকেন আছিন, হাইরকেন লইয়া গিয়া গোয়াইল ঘরও ছুহি দিছে; গাই-বাছুর নাই। গাই-বাছুর আনছে না, তে থাকবো কইত্থেইক্যা। তহনেই কী করছে? তার তামুক খাওয়া আর অইলো না। এই হাইরকেন লইয়াই রওনা দিছে। যেনও ডিগরা দিছিন এনো গেছে। গিয়া দেহে গাই-বাছুর কোইত্থে আইবো, গাই-বাছুর নাই। তহনেই মাধবের মনে মনে ই করতাছে যে, গাই-বাছুরডা তো ছুইট্টা গেছে। অবশ্যই গ্রামেই গিয়া উটছে। আইচ্ছা গ্রামের এক মাথাত থাইক্যা খুঁজতে খুঁজতে যাইতে থাকবাম। এইডা মনে মনে সিদ্ধান্ত কইরা গ্রামের এক মাথাত থাইক্যা গাই-বাছুর খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে এই শম্ভু জালোর বাড়িত আইয়া হাজির অইছে।

হাজির অইয়া দেহে যে, এনো এক আছানক তামশা। তামশাডা কী? একজনে কথা কইতাছে, চাইরজনে নীরব অবস্থায় বইয়া রইছে। আর শতাশতি লোক দেহুইয়া। সবারই মৌন ভাব। একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোনো রাও নাই। অ্যাঁ, সবাই এই মোহন্ত'র কথা শুনতাছে। তহনেই মাধব যহন গেছে, মাধবেও মনে মনে কইতাছে–বাফরি, আমি জাতে ব্রাহ্মণ। কত ফূজা

ফার্বণ করছি। কিন্তু এই ফূজা তো আমি জীবনেও দেখছি না। আইচ্ছা এই ফূজার কী নাম, কী ধাম এইডা তো জানন লাগে। এইডা মনে মনে ই কইরা হেও বইছে। যহন মোহন্তের কথা শেষ অইছে, শেষ কইরা উক্কা টানাটানি কইরা পান-প্রসাদ লইয়া একজনের লগে আরেকজনে রাও করছে। তহনেই মাধবে জিগাইতাছে, মোহন্ত গোঁসাই? বুলে, কী? বুলে, আফনেরা কিসের ফূজা করলাইন? বুলে, এইডা তো কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের ফূজা করলাম। বুলে, এই ফূজা করলে কী অয়? বুলে, এই ফূজা করলে নির্ধনের ধন অয়,আরাইল ধনে ঘর লয়, অফুতরার ফুত্র অয়, যে যে কামনা করে সিদ্দি অয়। লুলা, ল্যাংড়া, আতুড় ভালা অয়, অন্ধের চৌক্ষু দান অয়। বুলে, আইচ্ছা আমি যে গাই-বাছুর আরাইছি, আমি যদি মানসিক করি, গাই-বাছুর ফাইয়াম? বুলে, অবশ্যই ফাইবাইন। তহনেই কী করছে? গলাবস্ত্র অইয়া ফরছে, ফইরা মানসিক করছে। কল্কিনারায়ণ ঠাহুর গো–আমার গাই-বাছুরডা যদি ফাই, আমি আফনের সেবা দিয়াম। মানসিক কইরা ফান(পান), প্রসাদ লইয়া এই মাধব রনা দিছে বাড়ির দিগে।

আর এইদিক দিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামের থাইক্যা যে আইছিন কানা, লুলা–এরা জলঘড়ের জল আর ভূষির ছাই লইয়া ভালা অইয়া বাড়ির দিগে রওনা করছে। মাধব যে রওনা করছে, মাধবের বাড়িত এমন সময় লাগযে কাইয্যা; মায়ে-ফুতে। মায়ে কইতাছে–ফুতরে ফুত বারো বচ্ছইরা ফুত অইছচ বাফেরে বাফ ডাহছ না। হ্যাঁ, সারাদিনভরা ঘুরাছ আর খাছ। বুড়া মানুষ সহালে ভিক্ষায় যহন যায়, গাই-বাছুরডা নিয়া ফতের কানিত ডিগরা দেয়। তারফরে সন্ধ্যার সময় যহন বাড়িত আইয়ে, গাই-বাছুরডা আইন্যা বান্দে। তুই সারাদিনভরা কী করছ? গালাগালি ফারতাছে। তহনেই তার মা যহন গালাগালি করতাছে, তহন ছেরাও কইতাছে দুষ কি আমার একলার? তুমিও তো এই বুড়া বেডার লগে রাও করো না। দুইল্যা ভাত ফুডায়া খালি ফাতো দেও। এই লাগাতেই। আর তো রাওটাও করতে দেহি না। ছেরাও তার মায়রে গাইল ফারতাছে। তহনি তার মায় কইছে–আবুরে তোরও দুষ আছে, আমারও দুষ আছে। আইচ্ছা দেখ, বুড়া মানুষ। সারাদিনভরা ভিখশিক কইরা আইছে। তামুকটাও লাগাতে খাইতারছে না। খুব তামুক প্রিয়োসী। মনের দুঃখে ফাঁস লইয়াও মরতারে, বিষ খাইয়াও মরতারে। এট্টু আগগইয়া দেখ্। এইকথা যহন কইছে, ছেরার মনডা এট্টু নরম অইছে। তহন কী করছে? রওনা দিছে তার বাপ কই আছে দেহনের লাইগ্যা।

আর এইদিক দিয়া কল্কিনারায়ণের কৃপায়–শম্ভু জালোর বাড়িত গিয়া রওনা করছে মাধব, এই কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের কৃপায়েই ফতের কিনাতেই গাই-বাছুরে ঘাস খাইতাছে–এই দেখছে। দেইখ্যা দড়ির মইধ্যে দইরা হারায়া আনতাছে। তহনেই হাইরকেনের দৃষ্টিডা দেইখ্যা ডাকতাছে ছেরায়–বাবা, বাবা গাই-বাছুর ফাইছুন? চাইর-ফাচটা ডাহের ফরে রাও করছে যে, হ ফাইছি। যহন ফাইছি কইছে, ছেরায় দইরা গেছে। গিয়া কইতাছে দেউহাইন দরিডা আমার ডাইন, আফনে ফাছে দিয়া আওহাইন। হারায়া ছেরায় লইয়া আইতাছে, আর ফাছে দিয়া মাধবে ছিন্তা করতাছে, দেহ বারো বছরে ফুত আইজ বাফ ডাকলো। মনে অয় কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের কৃপায়েই। আর এইদিক দিয়া টিক্কাডা যে ফুরাত দিছিন, এই টিক্কাডা কল্কির মইধ্যে তুলছে। তুইল্যা সাজায়া ব্রাহ্মণী কী করছে; বাড়ির সামনে আইছে। আয়া ডাকতাছে–কর্তা কর্তা গাই-বাছুর ফাইছুন? তহন হেই চাইর-ফাচটা ডাহের পরে রাও করছে। বুলে, হ ফাইছি। বুলে, এনো আওহাইন কর্তা।

হুক্কাডা খাইতে খাইতে আওহাইন। ছেরাডারে বিহালেই কইছিলাম, গাই-বাছুরডা আনোনের লাইগ্যা, গাই বাছুরডা আনলো না। মানে ছেরার উফরে দুষ দিয়া হে ভালা অইরছে। এইদিন থাইক্যা কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের সেবা মানসিক করছে। এইদিন থাইক্যা তারার দিনকাল ভালাই যাইতাছে। ব্রাহ্মণের লগে ব্রাহ্মণীর কোনো ই নাই। আর ব্রাহ্মণীর লগে ব্রাহ্মণের কোনো ই নাই। ভালা মিশমিইশা দিন যাইতাছে।

অইলে কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের সেবা যে মানসিক করছিন, এই সেবার কথা আর মনও নাই মাধবের। কথা প্রসঙ্গে একদিন এইরমই একটা কটূক্তি করছে ব্রাহ্মণী। বলাবাহুল্য, তহনেই মনে মনে কইতাছে এই কথাডা যে ব্রাহ্মণী কইল, এইডার কারণ কী? তর্জমা করতাছে মনে মনে। তর্জমা কইরা হঠাৎ কইরা তার মনও অইছে–বুলে, আমি যে অনেকদিন আগে কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের সেবা মানসিক করছিলাম, হিই সেবা তো আমি দিলাম না। এইডার কারণে ব্রাহ্মণী এই কথাডা কইছে? তহনি প্রকাশ্যে কইতাছে, ব্রাহ্মণী? বুলে, কী? বুলে, আমি তো কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের সেবা দিতাম। বুলে, দেওহাইন, ভালো কথা। তহন কী করছে? মাধব এইদিন থাইক্যা কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের সেবা দেওয়া আরম্ভ করছে। হে বার্ষিক করছে, ফরত্যেকদিনই কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের সেবা দেয়।

তহনেই আরেকদিন এই মাধবের যে গুরুদেব আছিন শঙ্কর; এই শঙ্কর শিষ্যালয় থাইক্যা ফিরার ফথে–এই তার নৌকাত তামুক নাই। মাঝি বেডায় কইতাছে, গুরুদেব? বুলে, কী? বুলে, দেউকখাইন আমরা জাতে জালো। সারাদিনভরা নৌকা বাইছ করি। আমরার তো তামুক খাইয়া অভ্যাস। আফনের নৌকাত তামুক নাইগা। আমরারে তামুক জোগাড় কইরা দেওন লাগবো। বুলে, বাবারে, এনো তো কুনু হাটবাজার নাই যে তুমারে তামুক কিইন্যা দিয়াম। তবে এই-ই-ই যে গ্রামডা দেহা যায়–এট্টু এট্টু দেহা যায়। এই গ্রামে আমার এক শিষ্য আছে। হের নাম মাধব। হে খুব তামুক প্রিয়োসী। এই পর্যন্ত তোমার বাইয়া যাওন লাগবো। হের ফরে তোমারে তামুক লইয়া দেওন।

তহন মাঝি বেডা আর কী করবো। সারাদিন নৌকা বাইছ কইরা সন্ধ্যার ফরে এই মাধবের বাড়িতে নৌকা লাগাইছে। লাগাইলে গুরুদেবে কইতাছে–যাও এই যে বাড়িডা, এই বাড়িডাই অইতাছে মাধবের বাড়ি। গিয়া আমার কথা কইলেই তুমারে দুই-তিন ছুলুম তামুক দিয়া দিব। আর মাঝি বেডা কী করছে? সারাদিনভরা তামুক খাইতারছে না। তামুক পিয়াসা এইরমভাবে ধরছে। নৌকাত থাইক্যা লামছে। লাইম্যা যাইতাছে, আর মনে মনে সিদ্ধান্ত করতাছে–গিয়া তিন ছুলুম তামুক লইয়া এক ছুলুম তামুক হেনও বইয়া ইচ্ছামতো খায়াম। আর দুই ছুলুম তামুক আতো কইরা লইয়া আয়াম। উক্কা চুঙ্গা তো নাও আছেই, তামুক সেনে নাইগা। এইডা মনে মনে সিদ্ধান্ত কইরা গেছে বাড়িত। গিয়া দেহে যে, আছানক তামশা। একজনে ফ্যারফেরাইতাছে, আর চাইরজনে হের বায় চায়া বইয়া রইছে। আর শতাশতি লোক। সবারই মৌন ভাব। একজনের লগে আরেকজনে রাও করে না। সবাই মন দিয়া শুনতাছে কথাডা। তহন এই মাঝি বেডায় গিয়া কইতাছে–আফনেরা কেডা আছুইন গো? আফনের গুরুদেবে কইছে তিন ছুলুম তামুক দিতাইন। ডাহাডাহি করতাছে, তামুক দিব এইডাও কয় না, না দিব এইডাও কয় না। তহনি মাঝি বেডার

মনে মনে রাগ আইছে। বুলে, দেহ না দিলে তো না করোক, আমি যাইগা। দিব এইডাও কয় না, না দিব এইডাও কয় না। হ্যাঁ, তারা কি একটা ফূজা করতাছে এইডার ধ্যানে সবাই মগ্ন। তহনেই রাগে আইরছে মাঝি বেডা নৌকায়। আইলে গুরুদেবে কইতাছে, কী, তামুক আনছ? বুলে, তামুক দিলে সেনে আনতাম। বুলে, এইডা কিতা কয়, দিলে সেনে আনতাম! বাড়িত কুনু লুক (লোক) নাই? তহনি কইতাছে, লুক নাই মানে লুকে লুকারণ্য। কী একটা ফূজা করতাছে। একজনে ফ্যারফেরাইতাছে, চাইরজনে হের বায় ছাইয়া বইয়া রইছে। আফনের দুহাই দিছি। তামুক দিব এইডাও কইলও না, না দিব এইডাও কইলও না। বুলে, তাই নাকি? বুলে, হ। বুলে তুমি নৌকাত থাহো। আমি যাইতাছি। তহনি এই শঙ্কর নৌকাত থাইক্যা নামছে। নাইম্যা আটতে আটতে গেছে মাধবের বাড়িত। গিয়া উডানের মইধ্যে আডাছরি করতাছে। সবাই দেখতাছে যে, মাধবের গুরুদেব আইছে। কিন্তু কেউই আর তারে যত্ন করে না। সবাই ফূজার খেয়ালে রইছে। তহনি গুরুদেবের বিরাট রাগ উঠছে। বুলে, দেহ আমি গুরুদেব আইছি, আমারে ফরযন্ত কুনু ভালা যত্নফাতি, ভালামন্দ কিছু জিগায় না। কী একটা ফূজা করতাছে মাধবে। আইচ্ছা দেহি ফূজাডা কেমনে করে মাধবে। মনে মনে সিদ্ধান্ত কইরা ভোগ নৈবেদ্য যে আছিন, এইডি আতে ছিতরায়া বিতরায়া লণ্ডভণ্ড কইরা আইরছে নৌকাত।

আয়া মাঝি বেডারে কইতাছে–এই বেডা নৌকা ছাড়। আর কিছু দূর গেলেই তো আমরার বাড়ি। বাড়িত গিয়া ইচ্ছামতো তামুক খাওয়ায়াম। মাঝি বেডা আর কী করবো, নৌকা ছাইড়া দিছে। আর এইদিক দিয়া গুরুদেবে ফূজা নষ্ট করছে, মাধবেরও তো করার কিছু নাই। তহনি যেডি যেডি ভালা আছিন, এইডিও তুলছে আর ঘরও কিছু আছিন এইডি দিয়া নতুন কইরা আবার কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের ফূজা আরম্ভ করছে। আর এইদিক দিয়া শঙ্কর যেই বাড়ির ঘাডো নৌকা লাগাইছে, বাড়ির দিগে ছাইছে শঙ্করে; দেহে যে, বাড়ি জুইরা আগুন লাইগ্যা ফরছে। শঙ্কর আর মাঝি বেডা দইড়া গেছে বাড়িত। যাইতেই আগুন দাপ কইরা নিইভ্যা গেছেগা। শঙ্করে কইতাছে, বাবা এইডা তো আছানক ব্যাফার। হ্যাঁ, গৈবি আগুন লাগছে, ধাপ কইরা নিইবভাও গেছেগা। নিইবভা যে গেছেগা, এই বাড়ির এরিয়ার ভিতরে ফশু-পক্ষী মানুষ যা কিছু আছিন, সবাই যে ঘুমায়া আছিন, ঘুমোই। যে বইয়া আছিন বইয়াই রইছে কথা কইতো ফারে না। হ্যাঁ, অক্করে ফশু (পশু) পক্ষি ধইরা। গৈবি আগুন যহন লাগে শঙ্করের এক কাহা আছিন বুড়া মানুষ, এ আছিন শঙ্করের বাড়ির বাইরে। সীমানার বাইরে। তহন এই আগুন লাগলে দইরা আইছে। আয়া বাড়িত না, বাড়ির ফাছে দিয়া এক ফুকুর (পুকুর) আছিন, এই ফুকুরের কানি দিয়া গিয়া ফইরা রইছে, ফানিফুনার মইধ্যে। এই লোকে কথা কইতে ফারে।

তহন শঙ্কর যহন মাঝি বেডার লগে আলাপসালাপ করতাছে, তহনেই তার কাহায় শুনছে। শুইন্যা তার কাহায় ডাকতাছে, শঙ্কর শঙ্কর কইরা। শঙ্কর শুইন্যা দইরা গেছে। গিয়া তার কাহারে ফানিফুনা থাইক্যা টাইন্যা তুলছে। তার কাহায় কইতাছে, শঙ্কর? বুলে, কী? বুলে, তুমি শিষ্যালয় থাইক্যা ফেরার ফথে, ফথের মইধ্যে কি অঘটন কুনু কিছু করছ? বুলে, হ করছি। বুলে, কী করছ? বুলে, আমার নৌকার মইধ্যে মাঝি বেডার তামুক আছিন না। আমি মাধবের কাছে পাডাইছিলাম তামুকের লাইগ্যা। আমার দুহাই দিছে তামুক দিল না। ফরে আমি নিজে গেছি। আমারে ফরযন্ত

কুনু সম্মান করলো না। আমি যে গুরুদেব গেছি, আমারে জিগাইলো না ভালা-মন্দ। সবাই ফূজার ধ্যানে আছে। ফরে আমি রাগে তার এই ফূজাডা নষ্ট কইরা দিয়া আইছি। তহনি তার কাহা কইতাছে–এ সব্বনাশ, তুমি তো বিরাট খারাপ কাজ করছো। হ্যাঁ, মাধবে, শুনছি পরত্যেকদিনই কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের সেবা দেয়। বার্ষিক। তুমি এই সেবা নষ্ট কইরা আইছ। নষ্ট করণে তুমার আইজ এই অবস্থা। বুলে, এখন কী করা? বুলে, এখন আর কী করা? তবে প্রত্যেকদিনই এই মাধবে এই কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের সেবা দেয়। তুমার কালকে যাওন লাগবো। তহনি কী করছে, তারা তিনজনে আলাপসালাপের মাধ্যমে এই রাত্রডা পোহাইছে। ফরেরদিন সহালে এই শঙ্কর গেছে মাধবের বাড়িত। আর মাধব কী করছে ঘুম থাইক্যা উইঠ্যা ছান সন্ধ্যাআগনি কইরা ভিক্ষার ঝুলি আতো লইছে। হে ভিক্ষাত যাইবো। তার পেশা একমাত্র ভিক্ষা। যহন ভিক্ষার ঝুলি আতো লইয়া ঘর থাইক্যা বাইর অইছে, বাইর অইতে দেহে যে গুরুদেবও হাজির। তহন এই ভিক্ষার ঝুলি থইয়া তার গুরুদেবেরে সেবা শুশ্রূষা করাইয়া শুয়াইছে। শুয়াইআ কইতাছে গুরুদেব? বুলে, কী? বুলে, জানুনই আমার পেশা একমাত্র ভিক্ষা। বুলে, হ। তে তুমি কি পরত্যেকদিনই কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের সেবা দেও? বুলে, হ আমি পরত্যেকদিনই দেই। বুলে, আজকে অন্যদিনের চেয়ে অট্টু সহাল কইরো। বুলে, ঠিক আছে, গুরুদেবের আদেশ। এইদিনো ভিক্ষাত গেছে। এইদিনো অন্যদিনের চেয়ে এট্টু সয়সহালে আইয়রছে। গুড়, কলা, ছিনি (চিনি); যাবতীয় যা কিছু লাগে বাজার থাইক্যা লইয়া এইদিন সয়সহালে আইয়রছে। মোহন্ত গোঁসাইরেও কইয়া দিছে, আজকে এট্টু অন্যদিনেরছে সয়সহাল করবাইন আফনেরা। এইদিন মোহন্ত গোঁসাইরা এট্টু সয়সহালে আইয়রছে। আয়া ফূজা আরম্ভ করছে। মোহন্ত গোঁসাই কথা কইছে। কথা কইয়া, উক্কা টানাটানি কইরা পান-প্রসাদ লইয়া একজনের লগে আরেকজন যহন রাও করছে, গুরুদেব যে শুইয়া আছিন–গুরুদেব গেছে। গিয়া কইতাছে মোহন্ত গোঁসাই? বুলে, কী? বুলে, কালকে তো আমি বিরাট অন্যায় করছি। এই অন্যায়ের মাফ দেওহাইন আমারে। বুলে, এইডা কিতা কইন! মাফ দেওয়ার মালিক তো আমি না। মাফ দেওয়ার মালিক অইছে গিয়া কল্কিনারায়ণ ঠাহুর নিজে। আফনে মাফ চাওহাইন, অবশ্যই মাফ দিবো। তহনেই গলাবস্ত্র অইয়া ফরছে। কল্কিনারায়ণ ঠাহুর গো আমি কালকে যে অফরাধ করছি, আমারে মাফ কোরহাইন। মাফ চাইয়া মাধবরে ডাক দিছে–মাধব? বুলে, কী? বুলে, আমারে দুইডা ফাত্র (পাত্র) দেও। দুইডা ফাত্র দিছে। একটার মইধ্যে লইছে জল–ঘডের জল, আরেকটার মইদ্যে কল্কির ভূষি। লইয়া রওনা কইরা দিছে বাড়ির দিগে। আর এইদিক দিয়া শঙ্করের কাহা শঙ্করের ফত ফানে চায়া রইছে কোনসমো শঙ্কর আইবো। শঙ্কররে দেইখ্যা–যে শঙ্কর আইছ? বুলে, হ আইছি। বুলে, কী আনছ? বুলে একটার মইধ্যে জল–ঘডের জল, আরেকটার মইধ্যে কল্কির ভূষি। বুলে, দেও একটা আমার কাছে, তুমি একটা রাহো। একটা কাহার কাছে দিছে। একটা হে লইছে। লইয়া বাড়ির ভিতরে গেছে। গিয়া একজনে জল–ঘডের জল ছিডায়া দিতাছে, আরেকজনে কল্কির ভূষি ছিডায়া দিতাছে। যে যেন আছিন হরিবোল হরিবোল কইরা সজাগ অইছে। এর থাইক্যা কল্কিনারায়ণ ঠাহুরের সেবা প্রচার অইছে।'[২৮]

উপসংহার

ব্রতকথাগুলোর মধ্যে শুধু নারী নয়, নারী-পুরুষ লিঙ্গ নিরপেক্ষ ব্রতের যেমন দেখা মেলে, তেমনি শুধু কুমারী বা সধবা নারীদের জন্যও ব্রতকথায় ব্রতের প্রকরণ বোঝার সুযোগ রয়েছে। ব্যক্তিগত অসুখ বা সংকট বা সংসার-সম্পদের সাথে সম্পর্কিত ব্রত সাধারণত নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই কথিত হতে দেখা যায় এবং সামাজিকভাবে নারীর লৈঙ্গিক পরিচয় ও সমাজ-বিধি সম্পর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত ব্রতকথাগুলোতে শুধু নারীকেন্দ্রিক হওয়ার বিষয়টি প্রকট বা একমাত্র হয়। যদিও কল্কিনারায়ণ ব্রতকথায় ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সম্পর্কের উন্নতির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকে ব্রত বিষয়ে মনোযোগী হতে দেখা যায়।

ব্রতকথার মধ্যে সংকট কি নারীর, না পুরুষের? আর সংকট থেকে মুক্তির জন্য ব্রত কে করছে? বিপদ যার, মুক্তির জন্য ব্রতীও সেই হবে। এই তত্ত্বে দেখা যায় ব্রতকথাগুলোতে নারীর সংকটে নারীই ব্রত করছে, বয়স যাই হোক না কেন। কিন্তু বালক বা পুরুষ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য যখন ব্রতকে গ্রহণ করছে তখন অনেক সময়ই সেই ব্রত নারী দ্বারা করানো হচ্ছে। বিপদ মুক্তির এই চরিত্র থেকে যে প্রশ্নটি সামনে আসে– ব্রতের একটি সার্বজনীন চরিত্র ছিল কিনা এবং সেই চরিত্রের ক্রমরূপ বদল ঘটেছে কি? এইসব প্রশ্নের উত্তর থেকে ব্রতের মধ্য দিয়েও পিতৃতান্ত্রিক বাস্তবতার বিবর্তন পাঠ করার সুযোগ তৈরি হয়। ফলে ব্রতকথার মধ্যেও খাঁটি বা আদি ব্রতের বিবর্তন-সূত্রটি যেমন খোঁজার সুযোগ থাকে, তেমনি সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তনের পাঠও এখান থেকে খোঁজা যেতে পারে। এই বিবর্তন শুধু ঐতিহাসিক নয়, আধুনিকতাবাদীদের মানস চরিত্রও পাঠ করার পথ করে দেয়। ফলে ব্রতকথাকে শুধু মেয়েদের ব্রতকথা বলে সংগ্রহ করার প্রবণতা ও প্রকরণকে প্রশ্ন করা যায়। ব্রতকথাগুলো যখন মেয়েদের ব্রতকথা নামে সংগ্রহ করা হচ্ছে, এই প্রবন্ধে সংগৃহীত নমুনা প্রমাণ করে যে, পুরুষদের ব্রতকথাও তখন মাঠে অহরহই প্রচলিত ছিল। 'ঐতিহ্য'-এর সাথে নারীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে বাইনারি সংস্কৃতি তৈরি করার এই প্রক্রিয়াকে তাই পুনঃপাঠ করা জরুরি, যা পশ্চিমা উপনিবেশবাদের 'ঐতিহ্য' বা 'লোক' তত্ত্বকে তৎকালীন কৃষিভিত্তিক ভারতীয় উপমহাদেশে গ্রহণ করার নীতিটি বুঝতে সাহায্য করবে।

তথ্যসূত্র

১ কামিনীকুমার রায়, "সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নি ও আচার-নিয়মের বিবরণ"। *ময়মনসিংহের ইতিহাস* (লেখক: কেদারনাথ মজুমদার, হরচন্দ্র চৌধুরী, শৌরীন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী), কমল চৌধুরী [সংগ্রহ ও গ্রন্থনা], কলকাতা, দে'জ পবলিশিং, ২০০৫, পৃ. ১৩৮

২ কমল চৌধুরী (সংকলন ও সম্পা.), *বাংলার ব্রত ও আলপনা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃ. ৬

৩ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বাংলার ব্রত", *বাংলার ব্রত ও আলপনা* (কমল চৌধুরী: সংকলন ও সম্পা.), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃ. ১৯

৪ কমল চৌধুরী (সংকলন ও সম্পা.), *বাংলার ব্রত ও আলপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত*, কলকাতা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৪০২, পৃ. ৫

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৯ প্রাগুক্ত

১০ যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, "বাঘাইর বয়াত", *ময়মনসিংহের ইতিহাস*, (লেখক: কেদারনাথ মজুমদার, হরচন্দ্র চৌধুরী, শৌরীন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী), কমল চৌধুরী [সংগ্রহ ও গ্রন্থনা], কলকাতা, দে'জ পবলিশিং, ২০০৫, পৃ. ১৪৪

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

১৩ শামসুজ্জামান খান, প্রধান সম্পাদক, *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: নেত্রকোনা*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১৮, পৃ. ২০৬

১৪ কামিনী কুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

১৫ সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক: বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ. ১০২

১৬ শামসুজ্জামানখান, প্রধান সম্পাদক, *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: মানিকগঞ্জ*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১৪, পৃ. ৩০২

১৭ শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পা.), *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: পঞ্চগড়*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১৩। পৃ. ১৮৫

১৮ কাজল দেব (বয়স ৬৭ বছর), লেখক গৃহীত সাক্ষাৎকার (অডিও রেকর্ড)। গ্রাম- খুরশিমূল, ডাক- রামপাশা, থানা-মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা, ১০/০৬/২০১৯

১৯ কালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ সংকলিত, বৃহৎ *বারোমেসে মেয়েদের ব্রতকথা*, কলকাতা, অক্ষয় লাইব্রেরী, ২০০৭, পৃ. ১৮৭

২০ দিলীপ চন্দ্ররায় (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রীশ্রী কল্কীনারায়ণের পাঁচালী*, ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯, পৃ. ৪

২১ প্রাগুক্ত, পৃ.৬

২২ কালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

২৩ দিলীপ চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

২৪ কালু চন্দ্র দে (বয়স ৭৫ বছর), *তিননাথের সেবা'র কথা*। লেখক কর্তৃক সংগৃহীত (অডিও রেকর্ড)। রানীগাও গ্রাম, থানা- মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা, ১৪/০৮/২০১৯

২৫ মিহির সেনগুপ্ত, *বিষাদবৃক্ষ*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ. ৪৬-৪৭

২৬ কালু চন্দ্র দে (বয়স ৭৫ বছর)। *গোরক্ষনাথের সেবা 'র কথা*। লেখক কর্তৃক সংগৃহীত (অডিও রেকর্ড)। রানীগাও গ্রাম, থানা-মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা, ১৪/০৮/২০১৯

২৭ মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২

২৮ নিতুষদেব (বয়স ৬৭ বছর), *কল্কিনারায়ণ ব্রতকথা*। লেখক কর্তৃক সংগৃহীত (অডিও রেকর্ড)। গ্রাম- খুরশিমূল, ডাক- রামপাশা, থানা-মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা, ০৯/০৮/২০১৯

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/জুন ২০২১

প্রবাজপুর শাহী মসজিদ : বাংলার স্থাপত্যের এক অনন্য প্রত্ন-নিদর্শন

হাফিজ আহমেদ*

সারসংক্ষেপ

মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসনামলে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় বাংলায় সুলতানী আমল (১২০৪-১৫৭৬), মোগল আমল (১৫৭৬-১৭৫৭) এমন কি ঔপনিবেশিক শাসনামলে (১৭৫৭-১৯৪৭) অসংখ্য ধর্মীয় ও লৌকিক ইমারত নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু কালের পরিক্রমায় প্রকৃতির নির্মম কশাঘাতে ও মানুষের অজ্ঞাতবশত চৌর্যবৃত্তির কারণে সেগুলোর অধিকাংশই আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় নিপতিত। তথাপিও প্রত্নতাত্ত্বিক খননাঙ্কিত কিছু প্রত্ন-নিদর্শন ও ইমারত বাংলার স্থাপত্য ঐতিহ্যের নীরব সাক্ষী হিসেবে আজও বিদ্যমান। প্রসঙ্গত বাংলার স্থাপত্যের এক বৃহৎ অংশ হলো মসজিদ যেগুলো শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় অথবা স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে বাংলার রাজধানী শহরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্মিত হয়েছিল। সেই ধরনের একটি অনন্য প্রত্ন-নিদর্শন হলো সাতক্ষীরা জেলার প্রবাজপুর শাহী মসজিদ। বারান্দাযুক্ত এক গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, নামাজঘরের তিনটি প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে তিনটি অবতল মিহরাব, বক্রাকার ও সমান্তরাল কার্নিস, কার্নিস বরাবর উত্থিত বর্গাকার কোণস্থিত বুরুজ, গম্বুজ নির্মাণে স্কুইঞ্চ ও পান্দানতিফের ব্যবহার, দ্বিকেন্দ্রিক কৌণিক খিলান, গম্বুজে শীর্ষদণ্ডের ব্যবহার, কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও মিহরাবের উদগত ভাব, তাকবিশিষ্ট কর্নার বুরুজ এবং মসজিদের বহির্গাত্রে বন্ধনি নকশা প্রভৃতি। উল্লেখিত কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের কারণে মসজিদটি বাংলার ইতিহাসে এক অনন্য প্রত্ন-নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হবার যোগ্য। বিদ্যমান এ মসজিদের ভূমি নকশা ও গঠনশৈলীর বিবরণ উল্লেখসহ নির্মাণকাল ও বাংলার স্থাপত্যে এর স্থান নির্ধারণ করাই এ প্রবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য।

ভূমিকা

মুসলিম স্থাপত্যের প্রধান প্রাণরূপী অঙ্গ হলো মসজিদ। আর মসজিদ বিজিত অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা, শক্তি এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে।[১] ইসলামের দৃষ্টিতে মসজিদ নির্মাণ প্রতিটি মুসলমানের জন্য বিশেষ পুণ্যের কাজ। এরূপ অনুপ্রেরণা থেকেই বিজিত অঞ্চলের প্রতিটি দেশে কিংবা অঞ্চলে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং স্থানীয় প্রশাসন কিংবা বিত্তশালীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে মসজিদ নির্মিত হতে দেখা যায়। বাংলার স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। বরং ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে এদেশের শাসকবর্গের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগ কিংবা ধনাঢ্যদের অনুপ্রেরণা ও অর্থায়নে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে। বাংলার স্থাপত্যের দিকে দৃষ্টি দিলে উল্লেখিত বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যাবে। বিশেষ করে আলোচ্য মসজিদ এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। জনদৃষ্টির অন্তরালে থাকা এ

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস ও সভ্যতা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

মসজিদের গঠনশৈলী ও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে এর নির্মাণকাল উদঘাটন ও বাংলার স্থাপত্যে এর স্থান নির্ধারণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

অবস্থান ও নামকরণ

সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে ৪ কিলোমিটার পূর্বে মথুরেশপুর ইউনিয়নের প্রত্নসমৃদ্ধ স্থান ঐতিহাসিক প্রবাজপুর গ্রামে মসজিদটি অবস্থিত। গ্রামটির পূর্বে সেকেন্দার নগর, পশ্চিমে ঈশ্বরপুর, উত্তরে দিয়া এবং দক্ষিণে মুকুন্দপুর গ্রাম অবস্থিত। প্রচলিত জনশ্রুতি হলো, রাজা বিক্রমাদিত্যের সেনাধ্যক্ষ জনৈক পরবাজ খাঁ (মতান্তরে পারভেজ খাঁ) এর নামানুসারে গ্রামটির নামকরণকরা হয়েছে প্রবাজপুর। তবে পরবাজ খাঁ নামের কোনো সেনাপতির নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না।[২] যাহোক, গ্রামটির নামানুসারে মসজিদের নামকরণ হয়েছে প্রবাজপুর শাহী মসজিদ।

ভূমি-নকশা ও গঠনশৈলী

নামাজঘর ও সম্মুখস্থ বারান্দার সমন্বয়ে গঠিত আলোচ্য মসজিদটি আয়তাকারে নির্মিত। এর বহিস্থ পরিমাপ (বারান্দাসহ) পূর্ব-পশ্চিমে ৫২´ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৪০´-২´´। আর বর্গাকৃতির নামাজঘরের পরিমিতি ২১´-৬´´। ইষ্টক নির্মিত ও চুন-শুড়কির সমন্বয়ে গঠিত এ মসজিদের দেয়ালের পুরুত্ব ৬´-৬´´। নামাজঘরটি অর্ধগোলাকৃতির বিশাল গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজটি নির্মাণে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির আড়াআড়ি খিলান (squinch) ও পান্দানতিফ (pendentive) পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আড়াআড়ি খিলানগুলো আটটি পোস্তার উপর স্থাপিত।

মসজিদটির নামাজঘরের সম্মুখস্থ বারান্দার উপর তিনটি গম্বুজ সংস্থাপিত; যেগুলো বর্তমানে পুনর্নির্মিত (আলোকচিত্র-৪)। বারান্দার অভ্যন্তরীণ পরিমিতি পূর্ব-পশ্চিমে ৬´-১০´´ এবং উত্তর-দক্ষিণে ২৫´। বারান্দার দেয়ালের প্রশস্ততা ৫´-৪´´। বারান্দার গম্বুজের অবস্থান্তর পর্যায়ে পান্দানতিফ পদ্ধতির ব্যবহার পরিলক্ষিত (আলোকচিত্র-১)। আর গম্বুজ শীর্ষ একদা কলস চূড়ায় শোভিত হলেও বর্তমানে সেগুলো লয়প্রাপ্ত।

নামাজগৃহের প্রবেশপথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে তিনটি অবতল মিহরাব বিদ্যমান (আলোকচিত্র-২)। বাংলার স্থাপত্যের প্রচলিত রীতি অনুসারে মধ্যবর্তী মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটি অপেক্ষা কিছুটা বড়। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি প্রস্থে ২´-৬´´ হলেও উভয় পার্শ্বের মিহরাব দুটি ১´-৯´´ প্রশস্ত। প্রতিটি মিহরাব আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত এবং মিহরাবের খিলান মুখ খাঁজ নকশায় সজ্জিত। প্রতিটি খিলান অষ্টভুজাকৃতি স্তম্ভের উপর স্থাপিত (আলোকচিত্র-২ ও ৩)। কেন্দ্রীয় মিহরাবের ডান পার্শ্বে তিন ধাপবিশিষ্ট একটি মিম্বর অদ্যাবধি লক্ষ করা যায়।

মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে (আলোকচিত্র-৪)। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি উভয় পার্শ্বের প্রবেশপথ অপেক্ষা বৃহদাকারে নির্মিত। বলাবাহুল্য, এ তিনটি প্রবেশপথ ছাড়াও নামাজঘর এবং বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে

প্রবেশপথ বিদ্যমান। প্রতিটি প্রবেশপথ দ্বিকেন্দ্রিক কৌণিক খিলানবিশিষ্ট এবং আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত। বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশপথগুলো লোহার গ্রিল দ্বারা বন্ধ। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও নামাজঘরের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথ সম্মুখ দিকে উদগত এবং এ উদগত ভাব কেন্দ্রীয় মিহরাবের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত।

নামাজঘরের চার কোনায় চারটি এবং বারান্দার উভয় কোণে দুটিসহ মোট ছয়টি বর্গাকার বুরুজ সংযোজিত; যেগুলো পাঁচস্তর বিশিষ্ট এবং কার্নিস বরাবর উত্থিত (আলোকচিত্র- ৪, ৬ ও ৭)। আলোচ্য মসজিদের বর্গাকার কোণস্থিত বরুজ বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত এবং এক অনন্য সংযোজন বলা যেতে পারে। মসজিদের ছাদ কার্নিশ বাংলার কুঁড়েঘরের ন্যায় ঈষৎ বক্রাকারে রচিত (আলোকচিত্র-৬, ৭)।

অলংকরণ

মসজিদের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্পী ও কারিগরগণ বিভিন্ন কারুকার্য সম্পাদন করেন। মসজিদে অলংকরণের ক্ষেত্রে যেহেতু ধর্মীয়ভাবে প্রতিকৃতির কোনো স্থান নেই, সেহেতু মুসলিম শিল্পীগণ স্থাপত্য অলংকরণে পাথরে খোদাই পদ্ধতি, মোজাইক, পলেস্তারার দেয়ালচিত্র, রঞ্জিত টালি, জ্যামিতিক নকশা, আরব্য নকশা ও বিভিন্ন বিমূর্ত বিষয়বস্তু সংবলিত টেরাকোটা নকশার প্রয়োগ করেন।

প্রবাজপুর শাহী মসজিদের গাত্রালংকরণ খুবই আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর। ইটের চমৎকার লোহিতবর্ণ এই ইমারতটির বর্ণালংকারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। মসজিদটির জ্যামিতিক নকশা, পত্রনকশা এবং জাঁকালো টেরাকোটা শৈল্পিক প্রয়োগের এক অনন্য উদাহরণ। মসজিদের অভ্যন্তরের কেন্দ্রীয় মিহরাবের খিলান স্তম্ভ বিভিন্ন গুল্ম ও পুষ্প নকশায় শোভিত। এ মিহরাব কুলঙ্গির মাঝে টেরাকোটাফলকে রচিত শিকলঘণ্টার নকশা যথেষ্ট আকর্ষণীয়। তাছাড়া লতাপাতা, ফুলদানি ও লতাগুল্ম সমৃদ্ধ টেরাকোটা নকশা এর সার্বিক গাত্রালংকরণে বৈচিত্র্য এনেছে। মিহরাবের আয়তাকার কাঠামোয় মনোমুগ্ধকর সর্পিল আকারে খোদিত পুষ্প ও লতাপাতার নকশার বিন্যাস মিহরাবটির সৌন্দর্য বর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। খিলানপটে সংযোজিত গোলাপ ও পত্র নকশা এর নান্দনিকতা বৃদ্ধি করেছে। প্রসঙ্গত পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটির অলংকরণ বিন্যাস কেন্দ্রীয় মিহরাবের ন্যায় হলেও এদের কুলঙ্গিতে সংযোজিত অতিরিক্ত ৪০টি ছাঁচকৃত নকশা শিল্পকলার এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য।

নামাজঘরের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের আভ্যন্তরভাগে দুটি করে স্বল্পগভীর কুলঙ্গি নকশা একঘেয়েমি দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। তবে ধর্মীয় গ্রন্থাদি রাখা অথবা রাতের অন্ধকার দূরীকরণের জন্য প্রদীপ/ মোমবাতি প্রজ্বলনের জন্য সম্ভবত এ ধরনের কুলঙ্গি সংযোজিত হয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় গম্বুজের নিম্নাংশে জ্যামিতিক নকশার প্রয়োগ এর সৌন্দর্য বর্ধনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে (আলোকচিত্র-১)।

মসজিদের বহির্গাত্রের অলংকরণশৈলী অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন। কোণস্থিত বুরুজসহ সমগ্র দেয়ালের নিম্নভাগ, মধ্যভাগ ও কার্নিশ তিন স্তরবিশিষ্ট বন্ধনী নকশা দ্বারা অলংকৃত (আলোকচিত্র-৬)। এ ধরনের বন্ধনী নকশা বাংলার স্থাপত্যে বিরল বলেই প্রতীয়মান। তাছাড়া বুরুজের নিম্নভাগের প্রথম স্তরে টেরাকোটার বরফি নকশা, দ্বিতীয় স্তরে খাঁজ নকশা, তৃতীয় স্তরে পত্র নকশা এর সৌন্দর্য সৃজনে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এরূপ রীতির অলংকরণশৈলী দেয়ালের মধ্যভাগ এবং ছাদকার্নিশেও অনুসৃত হয়েছে। তবে দেয়ালের মধ্যভাগে তিনস্তর বিভাজনকারী মোল্ডিং নকশার উপরে এবং নিচে পত্রনকশাযুক্ত ফলক ও কুলঙ্গি নকশা (আলোকচিত্র-৬ ও ৭) মসজিদটির সৌন্দর্য বর্ধনের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

কিবলা দেয়ালের বহির্ভাগে ইটের সুনিপুণ বিন্যাস মসজিদটিকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে (আলোকচিত্র-৫)। কোণস্থিত বুরুজ ও কেন্দ্রীয় মিহরাবের পশ্চাৎভাগে সংযোজিত ইটের বিন্যাস আয়তলেখ/বারলেখ (histogram) আকৃতি ধারণ করেছে এবং এর মধ্যস্থলে জ্যামিতিক নকশার মাধ্যমে জানালার অবয়ব প্রদান অলংকরণের ক্ষেত্রে এক অনন্যতা সৃষ্টি করেছে (আলোকচিত্র-৭)

নির্মাণকাল

মসজিদটির নির্মাণকাল-সম্পর্কিত কোনো নির্ভুল তথ্য অদ্যাবধি পাওয়া যায় না। তবে খুলনা জজকোর্টে চলমান একটি মোকদ্দমার নথিপত্র (দলিল ও ফরমাননামা) থেকে মসজিদটির নির্মাণকাল সম্পর্কিত কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। ফরমানের তথ্যানুযায়ী (আলোকচিত্র-৫) জনৈক নুরুল্লা খাঁ[৩] ১১০৪ হিজরি মোতাবেক ১৬৯৩ সনে আলোচ্য মসজিদের নামে ৫০ বিঘা লাখেরাজ জমি দান করেছিলেন।[৪] সেই মতে, মসজিদটি হয়তবা সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামল বা তার পূর্বে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বিদ্যমান মসজিদের ভূমিনকশা ও অলংকরণ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় উক্ত ফরমানের সনকে মসজিদের সুনির্দিষ্ট নির্মাণ তারিখ হিসেবে গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ এ মসজিদের একগম্বুজ বিশিষ্ট বারান্দাযুক্ত ভূমি নকশা, বক্রাকার কার্নিস, কার্নিস পর্যন্ত উত্থিত কোণস্থিত বুরুজ, টেরাকোটার ব্যবহার প্রভৃতি সুলতানী বাংলার স্থাপত্য ঐতিহ্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন– দিনাজপুরের গোপালগঞ্জ মসজিদ (১৪৬০) ও সুরা মসজিদ (পঞ্চদশ শতক), গৌড়ের লট্টন মসজিদ (হোসেনশাহী আমলে নির্মিত) ও খানিয়া দিঘি মসজিদ (১৪৮০), পঞ্চদশ শতকে নির্মিত বারোবাজারের গোড়ার মসজিদ ও সিংদহ আউলিয়া মসজিদ প্রভৃতির নাম উল্লেখিত বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থাপন করা যায়। পক্ষান্তরে একগম্বুজ বিশিষ্ট বারান্দাযুক্ত ভূমি নকশা, কেবল বারান্দার সমান্তরাল কার্নিস ও চার আক্ষিক উদগত অংশ বাংলার মোগল স্থাপত্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ (১৬০৯) এ রীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যাহোক, সুলতানি ও মোগল উভয় নির্মাণশৈলীর উপস্থিতির কারণে অনুমিত হয় যে, মসজিদটি অবস্থান্তর পর্যায়ের[৫] এক অনন্য স্থাপত্যকীর্তি।

পর্যালোচনা

সুলতানি আমলে নির্মিত মসজিদগুলো বিশ্লেষণ করলে কতিপয় বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। এসব বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে নামফলকহীন মসজিদগুলোর নির্মাণকাল নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রবাজপুর শাহী মসজিদের ভূমিনকশা ও অলংকরণের সাথে সুলতানি আমলের মসজিদের সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১. এ সময়ের মসজিদগুলো ছোট আকৃতির ইটের তৈরি। জোড়ক-মসলা হিসেবে চুন-সুড়কি ব্যবহার করা হয়েছে। দেয়াল বেশ পুরু (১.৫ - ৪ মিটার), সম্মুখভাগে পাথর অথবা পাথরের সর্দল মাঝখান দিয়ে সরাসরি বসানো।[৬]

২. বাংলার মসজিদ স্থাপত্যে সংযোজিত কোণস্থিত বুরুজগুলো গোলাকার, অষ্টকোণাকার, বহুভুজাকার, বর্গাকার ও বিভিন্ন স্তরে (বাঁশের গিটের মতো) নির্মিত এবং পোড়ামাটির ফলক, লতাগুল্ম ও ফুল নকশায় সজ্জিত। এসব বুরুজ মসজিদের ছাদ কার্নিশ বরাবর উত্থিত।

৩. মসজিদের ছাদ কার্নিশ সাধারণত বক্রাকার এবং প্রচলিত কুঁড়েঘরের কার্নিশের অনুকরণে তৈরি বলে ধারণা করা হয়।

৪. সরাসরি খিলানের উপর গম্বুজ সংস্থাপন।

৫. গম্বুজগুলো সাধারণত চাড়ির আকৃতির এবং এদের ভারবহনের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ত্রিকোণাকৃতির পান্দনতিফ, তবে মাঝেমাঝে স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলার স্থাপত্যের এই পান্দনতিফ এবং স্কুইঞ্চের ধারণা প্রাক-ইসলামি বাইজান্টাইন এবং পারসিক স্থাপত্য থেকে গৃহীত।[৭]

৬. ফ্রেমে আবদ্ধ লতা-পাতার নকশা, ঝুলন্ত নকশা ও ইষ্টক বিন্যাসে সৃষ্ট অলঙ্করণ।[৮]

প্রবাজপুর শাহী মসজিদ এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার এবং তিন গম্বুজবিশিষ্ট বারান্দাযুক্ত। সমগ্র নামাজঘরের উপরের ছাদ বিশাল অর্ধবৃত্তাকার চাড়ির ন্যায় গম্বুজ দ্বারা আবৃত। নামাজঘরের বিশাল গম্বুজ নির্মাণে স্কুইঞ্চ ও পান্দানতিফ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সুলতানি আমলে বাংলায় এ নির্মাণ রীতির প্রথম উদাহরণ হলো, দিনাজপুরের গোপালগঞ্জ মসজিদ (১৪৬০)।[৯] এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে বাংলায় বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়। যেমন– পটুয়াখালির মসজিদবাড়ি মসজিদ (১৪৬৫),[১০] গৌড়ের চামকাটি মসজিদ (১৪৭৫),[১১] খনিয়া দিঘি মসজিদ (১৪৮০),[১২] বারোবাজারের গোড়ার মসজিদ (পঞ্চদশ শতক),[১৩] দিনাজপুরের সুরা মসজিদ (ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে)[১৪] এবং টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ (১৬০৯)[১৫] প্রভৃতি।

মসজিদের নামাজঘরের ছাদ কার্নিশ বক্রাকার। আর এই বক্রাকার ছাদ কার্নিশের উৎসস্থল বাংলার সেই সাদা-সিধে কুঁড়েঘর। বাংলার স্থপতিরা দেশজ এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত দক্ষতার

সঙ্গে ইটের নির্মিত ইমারতে ব্যবহার করতে সক্ষম হন। মুসলিম স্থাপত্যে এ ধরনের ঈষৎ বক্রাকার ছাদ কার্নিশের সর্বপ্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত গৌড়ের একলাখি সমাধি সৌধে।[১৬] তবে অনেকেই ধারণা করেন যে, এ ধরনের স্থাপত্যশৈলী প্রাক-ইসলামি যুগের মন্দির স্থাপত্য থেকে গৃহীত হয়েছে।[১৭] কিন্তু বিদ্যমান উদাহরণের অভাবে এটি নিশ্চিত করে বলা যায় না। যাহোক, সুলতানি আমলের প্রায় প্রতিটি ইমারতেই এরূপ ঈষৎ বক্রাকার কার্নিশের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন– বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ (১৪৫৯),[১৮] খানজাহান আলীর সমাধি (১৪৫৯),[১৯] ছোট সোনা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯),[২০] বারোবাজারের গোড়ার মসজিদ (পঞ্চদশ শতক),[২১] রাজশাহীর বাঘা মসজিদ (১৫২৩),[২২] টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ (১৬০৯), পাবনার চাটমোহর মসজিদ (১৫৮১-৮২), খেরুয়া মসজিদ (১৫৮২),[২৩] ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল মসজিদ (১৬৭০)[২৪] প্রভৃতি ইমারতসমূহের ছাদ কার্নিশ ঈষৎ বক্রাকারে নির্মিত। বাংলার দেশজ উপাদান হতে গৃহীত এ নির্মাণ পরিকল্পনা দিল্লির মোগল স্থাপত্য ও রাজপুত স্থাপত্যের পাশাপাশি এদেশের মন্দির স্থাপত্যেও বিশেষভাবে দৃশ্যমান। প্রসঙ্গত ভূমি নকশার দিক থেকে আলোচ্য মসজিদটি উপরোক্ত সুলতানী স্থাপত্যের এমনকি দু-একটি মোগল উদাহরণের অনুকরণে নির্মিত হলেও গঠনশৈলীর দিক থেকে কিছুটা বৈচিত্র্যময়। অর্থাৎ এর নামাজঘরের ছাদ কার্নিশ বক্রাকার হলেও বারান্দার ছাদ কার্নিশ সমান্তরাল, যা ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ বলেই অনুমিত এবং এটি মোগল মসজিদ স্থাপত্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত।

মসজিদের সন্মুখভাগের বারান্দার দ্বিকেন্দ্রিক সুচাগ্র তিনটি খিলানপথই আয়তাকার কাঠামো দ্বারা আবদ্ধ ও সম্মুখ দিকে কিছুটা উদগত। প্রতিটি কাঠামোর মাঝে রয়েছে জ্যামিতিক নকশার দৃষ্টিনন্দন অলঙ্করণ। মূলত ইসলামী শিল্পকলায় প্রাণী ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতিকে বাদ দিয়ে নির্বস্তুককে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ কারণে শিল্পীগণ স্থাপত্যশিল্পে বৃত্ত, ঘনক, সরল ও বক্ররেখা সংবলিত জ্যামিতিক নকশা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন। মোগল আমলে নির্মিত অধিকাংশ মসজিদের প্রবেশপথ সম্মুখদিকে উদগত। প্রবাজপুর শাহী মসজিদের প্রবেশপথ প্রাক-মোগল আমলে নির্মিত খেরুয়া মসজিদ, চাটমোহর মসজিদ ও আতিয়া মসজিদের প্রবেশপথের ন্যায় সামান্য উদগত।

সুলতানি আমলে নির্মিত মসজিদ স্থাপত্যে বুরুজের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং বুরুজগুলো ছাদ কার্নিশে সমাপ্ত। তবে ষাট গম্বুজ মসজিদ ও বাঘা মসজিদে এর কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। এ দুটি মসজিদের বুরুজগুলো ছাদ কার্নিশ থেকে উপরে উত্থিত। জালাল উদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪১৫-১৪৩২) এ ধরনের নির্মাণরীতির বিকাশ ঘটে।[২৫] যদিও মুসলিম স্থাপত্যে আব্বাসীয় আমলে নির্মিত বহু ইমারতে এবং পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে তোগলক স্থাপত্যে ইমারত সুদৃঢ়করণে বুরুজের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তথাপি ঐ সব বুরুজের চেয়ে বাংলার স্থাপত্যের চারকোণায় ব্যবহৃত বুরুজ ভিন্নতর ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

গোলাকার ও অষ্টভুজাকৃতির বুরুজগুলোতে ব্যবহৃত অলংকরণ বিন্যাস এগুলোকে গিটযুক্ত বাঁশের রূপ প্রদান করেছে (যেমন: বাঘা মসজিদ, কুসুম্বা মসজিদ, গোড়ার মসজিদের কোণস্থিত বুরুজগুলো গিটওয়ালা বাঁশের মতো)। আলোচ্য মসজিদের ছাদ কার্নিশ বরাবর উত্থিত কোণস্থিত বুরুজগুলো জ্যামিতিক ও ছাঁচ নকশা দ্বারা অলংকৃত। বুরুজে এরূপ নকশার ব্যবহার পঞ্চদশ শতকে নির্মিত বারোবাজারের গোড়ার মসজিদ ও ফরিদপুরের পাতরাইল মসজিদে (পঞ্চদশ শতক) লক্ষ করা যায়। সুলতানি বাংলার এ স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যটি পরবর্তী প্রাথমিক মোগল আমলে নির্মিত খেরুয়া মসজিদ ও চাটমোহর শাহী মসজিদে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য বৈশিষ্ট্যটি মূলত বাংলার দোচালা বা চৌচালা কুঁড়েঘরের চারকোণার বাঁশের খুটির অনুকরণ-একথা বললে মোটেও অতুক্তি হবে না।

সুলতানি আমলের মসজিদগুলো দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার প্রধান কারণ হলো, এ সময়ে নির্মিত মসজিদগুলোর দেয়াল অনেক প্রশস্ত, যেমন– ষাটগম্বুজ মসজিদের দেয়াল ২.৮ মিটার,[২৬] সিংগার মসজিদের ২.১৩ মিটার,[২৭] মসজিদবাড়ি মসজিদের ২.০ মিটার,[২৮] খনিয়াদিঘি মসজিদের ২.১ মিটার,[২৯] এবং বাঘা মসজিদের ২.২২ মিটার[৩০] পুরু। অবস্থান্তর যুগের মসজিগুলোর দেয়াল ও সুলতানি আমলের মসজিদের ন্যায় বেশ প্রশস্ত। যেমন- খেরুয়া মসজিদের দেয়ালের পুরুত্ব ২.০ মিটার,[৩১] চাটমোহর মসজিদের দেয়াল ১.৯৮ মিটার এবং আতিয়া মসজিদের দেয়াল ২.২৩ মিটার পুরু।[৩২] পক্ষান্তরে পলেস্তরাবিহীন প্রবাজপুর শাহী মসজিদের দেয়ালের পুরুত্ব ২.০৪ মিটার। অর্থাৎ অবস্থান্তর যুগে নির্মিত মসজিদের দেয়ালের প্রশস্ততার সাথে প্রবাজপুর শাহী মসজিদের দেয়ালের পুরুত্বর যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আলোচ্য মসজিদের কিছু আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য দর্শনার্থীদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এগুলোর মধ্যে বহির্গাত্রের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ তিন স্তরবিশিষ্ট বন্ধনি নকশা, চতুর্ভুজাকৃতির বুরুজের অভ্যন্তরে ইটের বিন্যাসে সৃষ্ট আয়তলেখ নকশা (তাকবিশিষ্ট নকশা) এবং ছাদ কার্নিশের নিম্নভাগে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে রচিত পাড় নকশা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের আলংকারিক বৈশিষ্ট্য আলোচ্য মসজিদকে সমসাময়িক যুগের মসজিদ থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্রতা দান করেছে এবং বাংলার স্থাপত্যের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটিয়েছে।

অবস্থান্তর যুগে নির্মিত আতিয়া মসজিদের গম্বুজ কলস ও পদ্মকলি শীর্ষদণ্ড সংবলিত। প্রবাজপুর শাহী মসজিদের গম্বুজ শীর্ষেও অনুরূপ শিরোচূড়া দৃশ্যমান। কিন্তু সময় পরিক্রমায় সেগুলো আজ লয়প্রাপ্ত। ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্রের তথ্যানুসারে, একদা মসজিদের গম্বুজের উপরে কলস ও পদ্মকলি ছিল।[৩৩] গম্বুজে এরূপ কলস ও পদ্মকলির প্রয়োগ সাধারণত মোগল স্থাপত্যে লক্ষ করা যায়। আলোচ্য বৈশিষ্ট্যটি হিন্দু স্থাপত্য থেকে গৃহীত হলেও এতে হিন্দু ধর্মের প্রতীকী ব্যঞ্জনার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। বরং আলংকারিক উপকরণ হিসেবে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে এর সংযোজন ঘটে।

পঞ্চদশ শতকে খলিফাতাবাদ ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় খান জাহান আলী এবং তাঁর অনুসারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু সংখ্যক মসজিদ নির্মিত হয়। এসব মসজিদের নির্মাণশৈলীর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকায় ঐতিহাসিকগণ এদের 'খান জাহানি রীতি' বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। খান জাহানি রীতির চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য হলো– কিউপোলা মণ্ডিত গোলায়িত কোণস্থিত বুরুজ, আলংকারিক প্রাচুর্যের বিপরীতে সাদামাটা সাজসজ্জা, গঠনে বলিষ্ঠতা ও শক্তিমত্তা প্রভৃতি। ষাট গম্বুজ মসজিদ (১৪৪৯ সালের পূর্বে), সিংড়া মসজিদ (পঞ্চদশ শতক), নয় গম্বুজ মসজিদ (পঞ্চদশ শতক), ছয় গম্বুজ মসজিদ (১৪৮১-৮৭), মসজিদকুর মসজিদ (পঞ্চদশ শতক) প্রভৃতি খান জাহানি রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করা প্রয়োজন, বাগেরহাটের পার্শ্ববর্তী জেলা সাতক্ষীরায় অবস্থিত প্রবাজপুর শাহী মসজিদে খান জাহানি রীতির কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায় কি-না? প্রবাজপুর শাহী মসজিদের কোণস্থিত বুরুজগুলো গোলায়িত ও কিউপোলা মণ্ডিত নয়, বরং বর্গাকৃতির। মসজিদের প্রতিটি বুরুজ কুলঙ্গি লজেন্স ও খাঁজ নকশায় ও প্রবেশপথগুলো জ্যামিতিক নকশায় সজ্জিত এবং বহির্দেয়াল অলংকরণে পোড়ামাটির ফলকের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। অর্থাৎ মসজিদটির আলংকারিক সৌন্দর্য খান জাহানি রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই বলা যেতে পারে, মসজিদটি খান জাহান আলীর সমসাময়িক নয়, বরং তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে।

প্রবাজপুর শাহী মসজিদটি মোগল আমলে ১৬৯৩ সালে নির্মিত হয়েছে বলে মিজানুর রহমান *সাতক্ষীরার পুরাকীর্তি* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী ও অলংকরণ বিশ্লেষণ করলে সুলতানি আমলের মসজিদ স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্যতার পাশাপাশি মোগল নির্মাণশৈলীর উপস্থিতিও বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত। ফলে অনুমিত হয় যে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে মসজিদের নামে জমি সম্প্রদান করা হলেও মসজিদটি অনেক পূর্বেই নির্মিত হয়েছে।

অবস্থান্তর পর্যায়ে নির্মিত মসজিদ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এ. বি. এম. হোসেন উল্লেখ করেন, গ্রামাঞ্চল এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ নগর কেন্দ্রসমূহে নির্মিত এ যুগের কিছু কিছু ইমারতে প্রাক্‌মোগল দেশীয় নির্মাণ রীতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এসব দেশজ উপাদানসমূহের মধ্যে স্থানীয় কুঁড়েঘরের আকৃতির ছাদ, বক্রাকৃতির কার্নিশ, দেয়ালগাত্রে পোড়ামাটির অলংকরণ এবং গম্বুজের ভার বহনের জন্য কর্বেল পান্দানতিফো প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য।[৩৪] আলোচ্য মন্তব্যটির সাথে প্রবাজপুর শাহী মসজিদের গঠনশৈলীর যথেষ্ঠ সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রবাজপুর শাহী মসজিদটি বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের এক ব্যতিক্রমধর্মী নিদর্শন। পঞ্চদশ শতকে নির্মিত সুলতানি আমলের অসংখ্য মসজিদের নির্মাণশৈলীর সাথে সাদৃশ্য থাকলেও কিছু মোগল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। অর্থাৎ মসজিদটি সুলতানি ও মোগল নির্মাণশৈলীর সমন্বয়ে গঠিত। এ থেকে অনুমিত হয় যে,

প্রবাজপুর শাহী মসজিদটি অবস্থান্তর যুগে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভের কোনো এক সময়ে নির্মিত স্থাপত্যকীর্তি। সময়ের বিবর্তনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে প্রবাজপুর গ্রামটি জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং মসজিদটির উপরে বিভিন্ন আগাছার সৃষ্টি হলে মসজিদটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীকালে মসজিদটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিষ্কার করে নামাজের উপযোগী করা হয় এবং ১৯৮৫ সালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর মসজিদের বারান্দার গম্বুজগুলো পুনর্নির্মাণ করে এটিকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। বর্তমানে ইমারতটির বহির্দেয়ালের বিভিন্ন অংশে নোনা ধরে এর স্থায়িত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে। এমতাবস্থায় সংস্কার করে মসজিদটিকে সুরক্ষিত করলে এটি মধ্যযুগীয় স্থাপত্যকলার নিদর্শন হিসেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আলোকিত করবে এবং আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস হবে সমৃদ্ধশালী।

চিত্রসমূহ

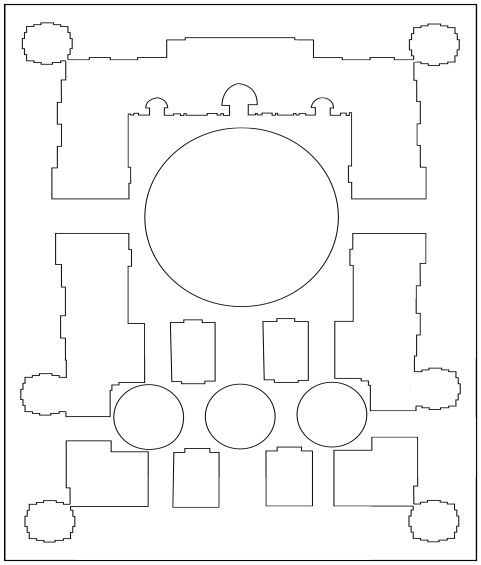

ভূমি নকশা: প্রবাজপুর শাহী মসজিদ; আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় লেখক কর্তৃক তৈরীকৃত

আলোকচিত্র-১: নামাজগৃহ ও বারান্দার গম্বুজ

আলোকচিত্র-২: মিহরাব

আলোকচিত্র ৩: কেন্দ্রীয় মিহরাব

আলোকচিত্র-৪: পূর্ব দেয়ালের প্রশেপথ

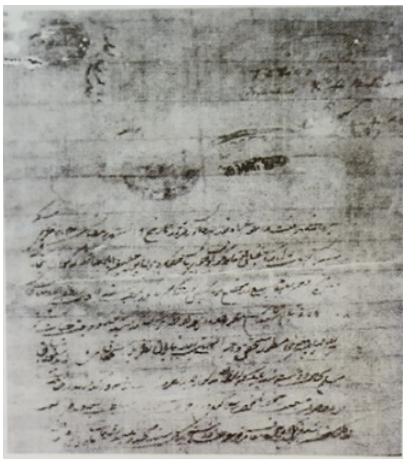

আলোকচিত্র-৫: (প্রবাজপুর শাহী মসজিদের লাখেরাজ সম্পত্তির ফারসি ফরমাননামা,
তারিখ: ১৯ রমজান, ১১০৪ হিজরি (২৫ মে ১৬৯৩ খ্রি.), উৎস: মিজানুর রহমান, *সাতক্ষীরার পুরাকীর্তি*

আলোকচিত্র-৬: মসজিদের উত্তর দেয়াল

আলোকচিত্র-৭: মসজিদের পশ্চিম দেয়াল

তথ্যসূত্র

১ M. Mujeeb, *Islamic Influence on Indian society* (Meerut: Meenakshi Prakasan, 1972), p. 108; মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ* (রাজশাহী: প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর, ১৯৯৬), পৃ. ১

২ এ. এফ. এম আব্দুল জলিল, *সুন্দরবনের ইতিহাস* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৬), পৃ. ৬৫৮

৩ সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় নুরুল্লা খাঁ যশোরের ফৌজদার ছিলেন। নানা কারণে নুরুল্লা খাঁ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন এবং তার সময়ে ফৌজদারের সীমানা বৃদ্ধি হয়। তিনি একই সঙ্গে যশোর, মেদিনিপুর, হুগলি ও বর্ধমান এলাকার প্রশাসক ছিলেন। দ্রষ্টব্য: এ. এফ. এম আব্দুল জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০

৪ মিজানুর রহমান, *সাতক্ষীরার পুরাকীর্তি* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৮), পৃ.৬৯

৫ অবস্থান্তর বলতে বুঝায় এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উত্তরণের অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Transition। আহমেদ হাসান দানি তাঁর গ্রন্থে Phase of transition বা অবস্থান্তর শব্দটি তুলে ধরেছেন। তাছাড়া আবু সাইয়েদ এম আহমেদ তার গ্রন্থেও Transition phase শব্দটি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, প্রাক-মোগল যুগে মোগল রাজধানী ঢাকার বাইরেও কিছু মসজিদ নির্মিত হয়েছিল যাতে সুলতানি বৈশিষ্ট্যের সাথে মোগল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, যা বাংলার স্থাপত্যে অবস্থান্তর যুগের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ সুলতানি যুগের শেষ ও মোগল আমলের প্রারম্ভিক সময়ে বাংলার স্থাপত্যে সুলতানি ও মোগল উভয় স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণ দেখা যায়। তাই এই সময়কে অবস্থান্তর পর্যায় বলা হয়। দ্রষ্টব্য: A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961), p. 177; Abu Sayeed M. Ahmed, *Mosque Architecture in Bangladesh*, UNESCO, Paris, 2006, p.134

৬ A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961), p. 19
৭ এ. বি. এম. হোসেন (সম্পা.), *স্থাপত্য: বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-২* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ৭৮
৮ এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, "মধ্যযুগীয় বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য: প্রকৃতি ও ধারা", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, সাঁইত্রিশতম খণ্ড, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ১৫
৯ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মুসলিম পুরাকীর্তি* (ঢাকা: মাওলা ব্রদার্স, ১৯৭১), পৃ. ২২৬
১০ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০১১), পৃ. ৪৪১-৪২; সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭-৩৮
১১ গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৪), পৃ. ৪০৭
১২ সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-৩ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), পৃ. ৩২৭-৩২৮
১৩ কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, *জেলা ঝিনাইদহের পুরাকীর্তি* (ঝিনাইদহ: সৃজনি প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিকেশন, ২০১৩), পৃ. ১২৮-৩৩; আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৯
১৪ A. H. Dani, *op.cit*., p. 161
১৫ এ. বি. এম. হোসেন, *প্রাগুক্ত*, ২৬৫
১৬ P. Brown, *Indian Architecture* (Islamic period), (Bombay: D. B. Taraporevala Sons & Co. Pvt. Ltd., 1981), p. 38; সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), পৃ. ২০৫-২০৬
১৭ Andrew Petersen, *Dictionary of Islamic Architecture in Bangladesh* (London: Routledge, 1996), p. 39
১৮ সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ১৩, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), পৃ. ১৪৭-১৫১
১৯ সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৭৯-৩৮০
২০ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৫
২১ কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, ১৩০
২২ সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৯, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), পৃ. ১৮০-৮১
২৩ এ. বি. এম. হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২
২৪ সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ১৩, পৃ. ২৮০-২৮১
২৫ A. H. Dani, *op.cit*., p. 14
২৬ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৬
২৭ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫
২৮ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪২
২৯ *তদেব*, পৃ. ৩১৫
৩০ *তদেব*, পৃ. ৩৩৩
৩১ এ. বি. এম. হোসেন, *প্রাগুক্ত*, ২৬২
৩২ রোকসানা ফিরদাউস নিগার, "বাংলার স্থাপত্যে সুলতানি থেকে মোগল অবস্থান্তর পর্যায়: প্রেক্ষিত - আতিয়া, সরাইল ও খেরুয়া মসজিদ", *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, বায়ান্ন বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৪২৫/২০১৭-১৮, ঢাকা, পৃ. ২১
৩৩ সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোর খুলনার ইতিহাস*, খণ্ড-২ (ঢাকা: লেখক সমবায়, ২০১১), পৃ. ৭৫
৩৪ এ. বি. এম. হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/জুন ২০২১

লালনের সমাজদর্শন: বর্তমান প্রেক্ষাপট

মোহাঃ আলমগীর হোসেন*

সারসংক্ষেপ

লালনের প্রতিটি সৃষ্টিই তার সমাজ-অভিজ্ঞতার ফসল। সমাজ, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে লালন তাঁর গান বেঁধেছেন। তিনি তাঁর সমাজে এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সৃষ্টি করে তাদের নিয়ে বৃহত্তর সমাজ বদলের সংগ্রামে নিয়োজিত থেকেছেন। লালনের সম্প্রদায় সমাজে থেকেও প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। আর এটিই হলো শ্রেণি সংগ্রামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজে সব মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় লালন একাই গোটা সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষের পক্ষে সংগ্রাম করে গেছেন। ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন জাতপাতের সকল দেয়াল। এটি করতে গিয়ে তিনি সকল কিছুর ওপরে স্থান দিয়েছেন মানুষকে। মৌলবাদী সমাজের সংস্কারযুক্ত শক্ত কাঠামোকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছেন। জাতপাত সমাজটাকে এতটাই কলঙ্কিত করে ফেলেছিল যে, সমাজে নিম্নবর্ণের লোকের ছায়া পর্যন্ত অপবিত্র ছিল উচ্চবর্ণের লোকের কাছে, সেই সমাজের মূল ফটকে দাঁড়িয়ে লালন ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী প্রচার করেছেন। এ প্রবন্ধে লালনের উঁচু-নীচু, জাত-পাত, আশরাফ-আতরাফ মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

সমাজ বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আধুনিক সমাজ শ্রেণিবিভাজিত, অর্থনৈতিক ও সেই সঙ্গে সামাজিকভাবে বর্তমান সমাজ বৈষম্যমূলক। স্বভাবতই এ সমাজে বিরাজমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত এক অনিবার্য প্রক্রিয়া। আর্থ-সামাজিকভাবে বৈষম্যমূলক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট শ্রেণিবিভাজিত সমাজ কাঠামোর বলয়ে জীবনসংগ্রাম জটিল আবর্তে ঘূর্ণায়মান। দেখা যায়, জীবনসংগ্রাম সর্বদাই দুটি ধারায় প্রবাহিত। এক. কর্মময়তা, কাজ করা বা শ্রম দেয়া, দুই. শ্রমের ন্যায্যতা প্রাপ্তির বা আদায়ের বিষয় নিশ্চিত করা অর্থাৎ বৈষম্যমূলক বণ্টন ব্যবস্থার নিরসন করা। অনন্তকাল ধরে চলছে এ সংগ্রাম। গ্রামীণ সমাজ এবং কোনো দেশ বা জাতির আম-জনতা প্রাত্যহিকভাবে আজন্মকাল ধরে বাঁচার সংগ্রামে নিরত; তাদের রয়েছে জয়ের স্বপ্ন, বাঁচার স্বপ্ন, নতুন করে শুরু করার অঙ্গীকার। এই যে গ্রামীণ জনতা, আম-জনতা তাদের আছে প্রেম, ভালোবাসা, দুঃখ-যাতনা, জীবনযন্ত্রণা, সর্বোপরি তাদের রয়েছে জীবনানুভূতি। এ অনুভূতির প্রকাশভঙ্গি অনেক সহজ সরল কিন্তু তীক্ষ্ণ; এ অনুভূতির প্রকাশ প্রাণস্পর্শী; জীবনের এসব দুঃখ, বেদনা হাহাকার বাণীবদ্ধ হয়ে প্রকাশ ঘটে বাউল মতবাদে। আর 'বিভিন্ন মতবাদের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাউল মত। হিন্দু-মুসলমানের মিলনে হয়েছে বাউল সম্প্রদায়, তাই পরমত সহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা, গ্রহণশীলতা, বোধের বিচিত্রতা, মনের ব্যাপকতা ও উদার সদাশয়তা এদের বৈশিষ্ট্য।'[১]

মানবতত্ত্ব বাউল সাধনার লক্ষ্য। পরমার্থের সাধনা করতে গিয়ে বাউলরা উদার মানবিকতা ও প্রেমাদর্শের জয়গান গেয়েছেন। 'সমাজের নিয়মে আমরা পরস্পরকে ব্যবহার করি বটে, কিন্তু

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ।

কেহ কাহারও 'মর্ম' জানি না। কাজেই সমাজবিধি মানিয়া লাভ নাই। নর-নারীর বন্ধনের মধ্যে অধ্যাত্মযোগ ছাড়া আর কোনো বন্ধন থাকিলে তাহা সত্য নহে। সেই অধ্যাত্ম যোগেরই প্রকাশ হইল আমাদের প্রেমে।'[২] বাউল মতে, চিরন্তন মানবসত্তা নিগূঢ় তাৎপর্যে এক ও অবিভাজ্য। মানুষে মানুষে কোথাও কোনো পার্থক্য নেই। এত বড় উদার আদর্শ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে মেলে না। তাই বাউল সাধনার মুক্তাঙ্গনে মিলিত হতে পেরেছে সব সম্প্রদায়ের মানুষ, বাউল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অবিচারে অত্যাচারে দুর্গত মানুষের মধ্যে জেগে উঠেছে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়। ধর্ম-জাতি-বর্ণের সংকীর্ণ সীমার উর্ধ্বে বাউলরাই একমাত্র অখণ্ড মানবতার আদর্শ-প্রচারক। বাউলের এই সামাজিক আবেদন অবিস্মরণীয়।

সমাজের প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকে বাউল মতবাদের উদ্ভব। সামাজিক শোষণের বিপরীতে বিদ্রোহী হয়ে সমাজের একশ্রেণির মানুষ নিজেদের সমাজের প্রতিপক্ষ ভেবে প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে এক প্রকার প্রতিবাদ সৃষ্টি করে। সেই প্রতিবাদের ফসল হিসেবেই সমাজে বাউলদের আবির্ভাব। বাউলেরা তাদের এই প্রতিবাদের মাধ্যমে নিজেদের তথাকথিত সমাজের বাইরে নিয়ে আলাদা এক পরিবর্তিত সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। ফলে শুধু জাতিভেদ প্রথাই নয় সমাজের শোষক-শ্রেণি, সমাজাচার, সমাজের ধর্মের নামে অনাচার সব কিছুকেই অবজ্ঞা করতে পেরেছেন অবলীলায়। তাদের জীবন-প্রণালি, ধর্মাচার সবকিছুতেই বহমান প্রতিবাদের এক অনিবার্য দৃষ্টান্ত। 'বাউল সাধনাকে এমনি একটি প্রতিবাদী মতাদর্শ বলা যেতে পারে, যা সর্বতোভাবে অধ্যাত্মচেতনাবাদী। নিম্নশ্রেণির মানুষ এই মতাদর্শ গড়ে নিয়েছে একটি প্রতিবাদী আদর্শে। এই মতাদর্শ সমাজের প্রবঞ্চিত মানুষের একদিন প্রতিদিন বেঁচে থাকার প্রেরণার স্থল। এই সাধনার উৎস কোন বিশেষ একটি ধর্ম বা সময়ে নিহিত নয়। এর ইতিহাসও তাই একটি বিশেষ সময়ে খোঁজা নিরর্থক।'[৩] সুতরাং জাতি-বর্ণ প্রথার প্রকট সামাজিক বিভাজন এবং আর্থ-সামাজিক শোষণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে বাউল মতবাদের উদ্ভব।

> সমাজের দাবী তাঁরা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। ...এই প্রত্যাখ্যানের পশ্চাতে গভীর দুঃখবোধ ও সামাজিক ভেদ-বিচারের নির্মম উৎপীড়ন বর্তমান ছিলো, তা বলাই বাহুল্য। যাঁরা উত্তর সাধনারূপে এই ভাবাদর্শ গ্রহণ করেছেন এবং সামাজিক কর্ম-সম্পর্কের বাইরে আপনার ঠাঁই খুঁজে নিয়েছেন। তাঁদের ক্ষেত্রে না হলেও যাঁরা প্রথম প্রবক্তা তাঁরা প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়া এ পথের পথিক হয়েছেন, এটা ভাবা কঠিন।[৪]

'বাউলগণের মধ্যে লালন শাহ সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি প্রতিভাবান কবি ছিলেন; দুই থেকে আড়াই হাজার বাউল গান রচনা করেন। তিনি নিজে গানও গাইতেন। বাণী ও সুরের বিবেচনায় তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় বাউল ছিল না।'[৫] তাই বাউলসাধক লালন ছিলেন লোকায়ত মরমি সাধনার এক অসামান্য সমাজদর্শনের প্রতীক। তাঁর সমাজদর্শন তাঁকে কালোত্তীর্ণ প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছে। 'শাস্ত্রের দাসত্ব ও ধর্মের মোহ থেকে তিনি মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন স্বকাল ও উত্তরকালের মানুষকে। মুক্তবুদ্ধি, সম্প্রদায়-সম্প্রীতি আর মানবমহিমা-বোধের সুবাতাস প্রবাহিত করার আকাঙ্ক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন এই সমাজমনস্ক ভাবসাধক।'[৬]

লালনের সমাজদর্শনে জাত-পাতের স্থান নেই, সেখানে হিন্দু মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান যেমন নেই তেমনি নেই ধনী এবং বর্ণাশ্রম। তিনি সমাজের ভেদাভেদ দূর করতে চেয়েছেন। বিষয়ের উপর অল্প গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্তি মানুষের আত্মিক ও শারীরিক উন্নতির মাধ্যমে সুফি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। লালন আখড়াকেন্দ্রিক জীবনধারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যেখানে সবাই একপাতে ভাত খাবে। গুণ্ডামি এবং ফিকিরকে নাজায়েজ করে, সুস্থ-সুন্দর সৎ-সত্য জীবন ও সুপথ তার সমাজে তিনি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। লালন বলেন–

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে।
যেদিন হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান জাতি-গোত্র নাহি রবে।
শোনায়ে লোভের বুলি
নেবে না কেউ কাঁধের ঝুলি;
দূরে ঠেলে না দেবে।[৭]

লালন এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন যে সমাজ হবে জাতিগোত্রহীন, এ সমাজ নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদহীন সমাজ হবে। প্রচলিত সমাজ অর্থাৎ শাস্ত্রশাসিত সমাজ যে দ্বিধান্বিত তা তিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন–

কেউ বলে মক্কায় যেয়ে হজ করিলে যাবে গোনা,
কেউ বলিছে মানুষ ভজে মানুষ হ-না।
কেউ বলে পড়লে কালাম ভেস্তখানায় পায় সে আরাম
কেউ বলে সেই সুখের ঠাই কারো কায়েম রয় না।[৮]

লালনের সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারটি হচ্ছে ধর্ম-বর্ণহীন এক সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা। তিনি সমাজকে নিরীক্ষণ করেছেন খালি চোখে, খোলা মনে; ঠুলি বা চোখে ঠুসি পরে নয়। মানুষের মুক্তির কথা লালন চিন্তা করেছেন। যে মুক্তি মোক্ষ লাভ বা স্বর্গ লাভ নয়। তাঁর এই চিন্তার মধ্যে কোনো প্রকার বেহেস্ত-দোজখ-স্বর্গ-নরক বা কোনো আধ্যাত্মিক মুক্তির কোনো নিশানা ছিল না; ছিল কেবল মানুষের সামাজিক মুক্তি।

লালনের জন্ম ১৭৭৪ সাল এবং 'লালনের স্থান ছিল কুষ্টিয়ার নিকট। তিনি জন্মত ছিলেন হিন্দু, পরে সিরাজ সাঁই নামে মুসলমান ফকিরের কাছে দীক্ষা নেন। তাঁহার সাধনাতে দুই ধর্মেরই যোগ দেখা যায়।'[৯] তাঁর মৃত্যু ১৮৯০ সাল মতান্তরে। তবে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু সময়ের ব্যবধান ১১৬ বছর। অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী সময়।

ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ পরিবর্তনে পলাশীর যুদ্ধ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ পলাশীর যুদ্ধের পরই ভারতীয় সমাজ দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হতে থাকে। পলাশী যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ভারতীয় সমাজ ছিল অগাস্ট কোঁৎ-এর স্ট্যাটিক সমাজ। এর প্রতিটি গ্রাম ছিল একেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম। অর্থাৎ রিপাবলিক ভিলেজ। গ্রামের সদস্যদের জীবন কেটে যেত গ্রামের মধ্যেই। নিজ গ্রামের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন তাদের তেমন হয়নি। গ্রামের মধ্যেই তেল ও লবণ ছাড়া তাদের প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যই তারা উৎপাদন করতে পারত এবং গ্রামীণ বাজার ব্যবস্থার (মূলত হাঁ ব্যবস্থাপনা) মাধ্যমে গ্রামের সব সদস্য তাদের স্ব স্ব প্রয়োজন মিটিয়ে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করতে পারত। এমনকি প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। ফলে গ্রামের সীমানার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন তাদের কখনই হয়নি। কিন্তু পলাশী যুদ্ধে নবাবের পরাজয়, ব্রিটিশদের রাজক্ষমতা দখল, হিন্দু কর্তৃক ব্রিটিশদের সাদরে গ্রহণ এবং ইংরেজ বনে যাওয়ার অতিমাত্রায় উৎসাহ, নতুন জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাব, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

> সবকিছু মিলিয়ে সমাজ কাঠামোতে এক বড় ধরনের পরিবর্তন অতি আসন্ন। সমাজ পরিবর্তনের এই ডামাডোলের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব ও সমাজে সামাজিক বৈষম্য ও সামাজিক নিপীড়ন বেড়ে চলে। এমনই এক সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে লালন শাহের জন্ম ও বেড়ে ওঠা।[১০]

সমাজ মানুষকে সৃষ্টি করেনি, মানুষই সমাজ সৃষ্টি করেছে। জন্মের সময় মানুষ জাতি-গোত্র-ভেদ নিয়ে জন্মায় না, সামাজিক ও সমষ্টিগত চাপে পড়ে তাকে কোনো না কোনো জাতি হিসেবে চিহ্নিত হতে হয়, লালনের এই তত্ত্ববোধটি বিজ্ঞানসম্মত। জাতি-গোত্র ভেদ এনে দেয় বিভেদ বুদ্ধি। মানুষকে বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে নিয়ে যায়। জাতির নামে ব্যবহৃত বর্ণবিদ্বেষই যে অপসংস্কৃতি, লালন তা গানের ভাষায় বেশ স্বচ্ছ ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে যুক্তিতর্কের উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমাজ-সচেতনতা লালনের মধ্যে স্বচ্ছরূপে ছিল বলেই প্রায় নিরক্ষর হয়েও লালন গানের ভাষায় নবজাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানব-প্রীতিই ছিল লালনের জীবনের আদর্শগত মূল ভিত্তি। এ জন্যেই তিনি কারো ধর্মমতকে আঘাত করেননি। যে কোনো স্তরের, যে কোনো ধর্মের যে কোনো বর্ণের লোককে 'এমন কি' যে কোনো গুরুর শিষ্যকেও তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছেন। স্বীয় মতবাদে অটল থেকেও পরধর্মের প্রতি এই যে সহিষ্ণুতা, এটিই মূলত লালনের সমাজদর্শন। গানের ভাষায় তাই তিনি বলেন–

জগন্নাথে দেখ রে যেয়ে
জাত কেমন রাখে বাঁচিয়ে
চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণে তাই খায় চেয়ে।।
জাত না গেলে পাইনে হরি,
কি ছার জাতের গরব করি;
ছুঁস্‌নে বলিয়ে–
লালন কয়, জাত হাতে পেলে
পোড়াতাম আগুন দিয়ে।।[১১]

মানুষের কিসে ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়, কিসে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভেদাভেদ দূরীভূত করে সুন্দর সুখী সমাজ গড়ে তোলা যায়, সে জন্যে লালন উপর্যুক্ত কঠোর বক্তব্য পেশ করেছেন। মানুষে মানুষে পার্থক্য, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, ধর্মে ধর্মে কলহ ইত্যাদি পরিহার করার জন্য লালন ছিলেন অত্যন্ত সোচ্চার। সে জন্যই তিনি বলেন–

মানুষে নাই জাতির বিচার
এক এক দেশে এক এক আচার।
লালন বলে জাতির ব্যবহার
গিয়াছি ভুলে।[১২]

আদিমকালে মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। জীবনের অন্বেষণে অনেক সময় আত্মরক্ষার তাগিদে আদিম মানুষ বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত। একের সাথে অন্যের যোগাযোগ হতো না। দৈনন্দিন জীবন বিচ্ছিন্ন ছিল। এই কারণে তাদের আচার-বিচার ভিন্ন রূপ ধারণ করে। কেউ কারো খবর রাখত না। এর ফলে গোত্র সৃষ্টি হয়, মানুষ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহারের সাথে অন্য সম্প্রদায়ের

আচার-ব্যবহারের মিল ছিল না। এজন্যে মানব-সমাজ বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। একের ধর্মাচরণ অন্যের ধর্মাচরণ থেকে আলাদা রূপ ধারণ করে। সৃষ্টি হয় জাতি-গোত্র। আর বিবাদ লাগে জাতিতে জাতিতে, গোত্রে গোত্রে। আশাবাদী-সমাজবাদী লালন তাই বলেন–

ধর্ম-কুল গোত্র-জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগির;
কেঁদে বলে লালন ফকির
কেবা দেখায়ে দেবে।[১৩]

এভাবে গানের ভাষায় লালন সুগভীর সমাজদর্শনের পরিচয় দিয়েছেন, যাতে তাঁর অর্থনৈতিক শ্রেণি-চেতনা ও সমতাবাদী মানবতত্ত্ব সুচিহ্নিত হয়েছে। পারিপার্শ্বিকতার বিচার-বিশ্লেষণ করে লালন সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণি-সংঘর্ষ তুলে ধরে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সাম্যতান্ত্রিক অর্থনীতির সুপারিশ করে বলেছেন– 'এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে' ইত্যাদি। আর এটাই মানবতাবাদী বা মানবতাত্ত্বিক এক মহান মানব-কল্যাণের মূলমন্ত্র। প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো যে শোষণের পুঁজি ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির উপকরণ– এ কথা ভেবেই তাঁর আমূল পরিবর্তন চেয়েছেন লালন। লালন বারবার গানের ভাষায় মানুষ-সৃষ্ট জাতপাতের ভেদাভেদের মূলে কুঠারাঘাত করে 'জাত গেল জাত গেল' বলে প্রশ্ন রেখেছেন–

জাত গেল জাত গেল বলে
একি আজব কারখানা।।
সত্য পথে কেউ নয় রাজি
সব দেখি তানা-না-না।।[১৪]

লালন তাঁর সমাজের একজন প্রাগ্রসর ব্যক্তি ছিলেন। বাউল নাম শুনলেই মনে হয়, তারা সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু তা নয়। অর্থাৎ লালন পুরোদস্তুর সামাজিক মানুষ ছিলেন। আধ্যাত্মিকতা তাঁর স্বভাবদর্শন আর সমাজবিপ্লব হলো তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতার ফসল। সমাজের অন্যান্য গীতিকবির সাথে লালনের পার্থক্য হলো– তিনি বিনোদনের জন্য কখনো কোনো গান বাঁধেননি বরং তিনি তাঁর সমাজ-অভিজ্ঞতা এবং স্বভাবজাত তাগিদ থেকে গান বেঁধেছেন। যে কারণে তাঁর গান মানুষের মুক্তির গান হয়ে পথ দেখিয়েছে সকল কালে সকল মানুষকে। 'তিনি মনের মানুষকে খুঁজেছেন, সত্য-সুপথের সন্ধান দিয়েছেন, সমাজে জ্বেলেছেন মুক্তির মশাল। ভাবা যায়, সেই উনিশ শতকের মতো বদ্ধ সমাজে বসে তিনি সুরের মাধ্যমে সকল অসুরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন। জাতপাত, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক বৈষম্য, মানুষের আত্মিক দীনতা সকল কিছুই তার মরমি মনের অভিব্যক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে।'[১৫] তাই লালন বলেন–

সত্য বল্ সুপথে চল্ ওরে আমার মন।
সত্য সুপথ না চিনিলে পাবে না মানুষের দরশন।।[১৬]

লালনের সমসাময়িক গ্রামীণ সমাজে জমিদারি শাসন শোষণ ও আমলাতান্ত্রিক শোষণ সমাজকে জর্জরিত করে তুলেছিল। মুনাফাখোর জমিদারেরা সাধারণ প্রজার প্রভুতে রূপান্তরিত হয়ে প্রজা সাধারণের রক্ত চুষে খাচ্ছিল। আর তাদের এই কাজে সহযোগিতা দিচ্ছিল ব্রিটিশ সরকারের আমলারা। অথচ ব্রিটিশ সরকারের আমলাদের উপরে সাধারণ প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার

দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। প্রজাসাধারণ তথা সমাজের সাধারণ মানুষ সরকারের আমলাদের কাছে গিয়ে জমিদার তথা সমাজপতিদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার চেয়ে পেয়েছে উল্টোফল। জমিদার-সমাজপতি-সরকারি আমলা এ যেন সাধারণ প্রজা পীড়নের যোগসাজসের এক মরণ ফাঁদ। এই ফাঁদে সমাজের সাধারণ মানুষের মুক্তির পথ ছিল রুদ্ধ। সমাজের সাধারণ মানুষের আর্তি শোনার আর কেউ ছিল না। তাই লালন বলেন–

শহরে ষোল জনা বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিলো তারা সব লুটে।।[১৭]

আবার সমজের মধ্যস্বত্বভোগী মহাজন ও উচ্চবিত্তের লোকেরা সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ করে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করে তাদের নিজেদের আখের গুছিয়েছে গণমানুষকে ঠকিয়ে। লালন তার বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন। লালন গণমানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে বলেছেন–

ভেঙেছে সরকারি তহবিল
সাক্ষীও আছে কাতেবীন
হুজুরে হয়ে হাজির
বলতে হবে সত্য বুলি।।[১৮]

এ ছাড়াও সমাজ বদলে লালনের সংগ্রামের সহযোদ্ধাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান বিচার করলে এ কথা বলা যায় যে তারা সবাই সমাজের বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম থেকে আসলেও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মূলত একই পর্যায়ের ছিল। লালনের কাছে গিয়ে তারা তাদের পূর্বের জাতিধর্ম, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থান সকল কিছু ভুলে নিজেদের অভিন্ন সত্তা হিসেবে ভেবেছে। এখানে কেউ কারো চেয়ে মর্যাদাবান নয় বা কারো অবস্থান নিচে নয়। সবাই সমান। কারণ লালনের আন্দোলনে সামিল হওয়ার পূর্বশর্তই ছিল নিজেকে কুলের উর্ধ্বে তুলে কুলহীন করা। লালনের ভাষায়–

কুলের বউ হয়ে মনা
আর কতকাল থাকবি ঘরে
ঘোমটা খুলে যাওনা চলে সাধ বাজারে।।[১৯]

লালন সমাজের একজন সচেতন সমাজকর্মী ছিলেন। সমাজের উন্নয়নের জন্য, সমাজের মানুষের মুক্তির জন্য আজীবন কাজ করে গিয়েছেন। যখন শ্রেণিবৈষম্য আর জাতপাতের করাল গ্রাসে পড়ে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ মুক্তির আশায় প্রহর গুনছিল তখন লালন দুহাতে মুক্তির ঝাণ্ডা নিয়ে আসেন সমাজের অন্ধকার বিবরে নিমজ্জিত মানুষদের মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য। তাই তাঁর দর্শনজুড়ে কেবলই মানুষের জয়গান, মানবমুক্তির আকুতি। তিনি এই মানুষের বাইরে আর কিছুই বুঝতেন না। তাঁর ধর্ম-কর্ম, ধ্যান-জ্ঞান সবই ছিল মানুষকেন্দ্রিক। মানুষের মুক্তির গান গাইতে গিয়ে তিনি মানুষ ও ঈশ্বরকে একাকার করে দিয়েছেন। তাই তাঁর কাছে মানুষে মানুষে বিভেদ মানে ঈশ্বরকে খণ্ডিত করা। তাঁর মতে, ঈশ্বর এই মানুষের মধ্যেই আছে। কোনো ধর্মালয়ে যা ধর্মগ্রন্থে নয়। তাই লালন বলেন–

ওগো মানুষের তত্ত্ব বলো না
ভাবের মানুষ কয়জনা।।

এই মানুষে আছেরে মন যাঁরে বলি মানুষরতন।
মনের মানুষ অধর মানুষ সহজ মানুষ কোনজনা।।[২০]

লালনের প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর সমাজ-অভিজ্ঞতার ফসল। সমাজ, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে লালন তাঁর গান বেঁধেছেন। লালন তাঁর সমাজে এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সৃষ্টি করে তাদের নিয়ে বৃহত্তর সমাজ বদলের সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছেন। লালনের সম্প্রদায় সমাজে থেকেও প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। আর এটিই হল শ্রেণি সংগ্রামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই লালন তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের, যারা একটি আলাদা বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের জন্য, তাঁদের আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য যেমন গান বেঁধেছেন, তেমনি তাদের সামাজিক মুক্তির জন্যও রচনা করেছেন অজস্র গান। তাই তিনি বলেন–

কোন্ কুলেতে যাবি মনরায়
গুরুকুলে যেতে হলে লোককুল ছাড়তে হয়।।[২১]

সমাজে সব মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় লালন একাই গোটা সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষের পক্ষে সংগ্রাম করে গেছেন। ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন জাতপাতের সকল দেয়াল। এটি করতে গিয়ে তিনি সকল কিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন মানুষকে। মৌলবাদী সমাজের সংস্কারযুক্ত শক্ত কাঠামোকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছেন। জাতপাত সমাজটাকে এতটাই কলঙ্কিত করে ফেলেছিল যে, সমাজে নিম্নবর্ণের লোকের ছায়া পর্যন্ত অপবিত্র ছিল, উচ্চবর্ণের লোকের কাছে, সেই সমাজের মূল ফটকে দাঁড়িয়ে লালন ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী প্রচার করেছেন। অর্থাৎ

ব্রাহ্মণ চণ্ডাল চামার মুচি
এক জলেতে সকল শুচি;
দেখ শুনে হয় না রুচি
যমে তো কাকেও থুবে না।।[২২]

সমাজে জাতপাত মানুষে মানুষে বিভেদের এমন এক কঠিন প্রাচীর তুলে দিয়েছিল যে, ব্রাহ্মণের ঘরবাড়ি তো দূরের কথা ব্রাহ্মণ যে উপাসনালয়ে পূজা-অর্চনা করত সেখানে চণ্ডাল প্রবেশ করতে পারত না। একইভাবে ব্রাহ্মণের মৃতদেহ সৎকারে যে শ্মশান ব্যবহার করা হতো সেখানে নিম্নবর্ণের কোনো হিন্দুর সৎকারের কথা চিন্তাও করা যেত না। এটা যে শুধু হিন্দু সমাজের চিত্র তা নয়। হিন্দু সমাজের মতো মুসলিম সমাজেও কোন আশরাফ কখনো কোন আশরাফের সঙ্গে ওঠাবসা দূরে থাক, তাকে তার বাড়ির সিংহদ্বার পর্যন্ত প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। লালন ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, আশরাফ-আতরাফ সমাজের এই শ্রেণিবৈষম্যকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন মানবতার মহামন্ত্র দিয়ে। আর এটি করতে গিয়ে তিনি সব সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ তর্জনী উঁচিয়ে বলেছেন:

যখন তুমি ভবে এলে
তখন তুমি কি জাত ছিলে
কি জাত হবা যাবার কালে
সেই কথা ভেবে বলো না।।[২৩]

লালনের গানে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনচেতনা, মানবমহিমাবোধ, আচারসর্বস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরোধিতা, জাতিভেদের প্রতি ঘৃণা, সামাজিক অসাম্য অবসানের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত হয়েছে। লালনের বিদ্রূপ মূলত চিরাচরিত শাস্ত্রাচার ও প্রচলিত অন্ধধর্মবোধের বিরুদ্ধে। এসব বিষয়ে লালনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবতাবাদী মননের পরিচয় পাওয়া যায়। লালন বলেন–

অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই
দেব-দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।।[২৪]

লালনের সমকালের সমাজ ছিল ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। লালন জীবনব্যাপী সংগ্রাম করেছেন এই কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা তা তাঁকে সংস্কারমুক্ত মানসিকতা অর্জনে সাহায্য করেছে। মারাত্মক বসন্ত রোগে আক্রান্ত লালনকে মুসলমান গৃহে আশ্রয় নেয়ার জন্য কেবল সমাজচ্যুতই হতে হয়নি; একই সঙ্গে পিতা-মাতাসহ পরম আত্মীয়দের চিরতরে ত্যাগ করতে হয়েছে। এটি ছিল তাঁর জীবনের চরম নির্মম ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। জাতের সীমাবদ্ধতা যে মানুষকে খণ্ডিত ও কূপমণ্ডূক করে রাখে এ ঘটনায় লালন তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন। এ জন্য লালন জাত হাতে পেলে তা আগুন দিয়ে পোড়ানোর বাসনা ব্যক্ত করেছেন। তাই লালন কবীর-তুলসীদাস-রজ্জবের মতোই ধর্মীয় বিভেদকে তুচ্ছজ্ঞান করে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ সমাজ গঠনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। তিনি বলেন, সমগ্র মানবসংসারের জন্ম-মৃত্যু-আসা-যাওয়া অনন্তকাল ধরে একইভাবে ক্রিয়াশীল, একই পানি আমরা পান করি তবু আমরা কেন বিভেদের মিথ্যা বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসতে পারি না। তাই লালন বলেন–

কেউ মালা কেউ তসবি গলায়
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার রে।।[২৫]

লালন শুধু সমাজের ধর্মের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করেছেন তা নয়। সমাজের গণমানুষের অধিকার আদায়ে তিনি সমাজের সকল অনুসঙ্গ যা শোষণের সাথে জড়িত–সবকিছুর বিরুদ্ধেই সোচ্চার কণ্ঠ ছিলেন। তিনি একটি সুশীল সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। সমাজের নীচুতলার মানুষের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সমাজপতি, ধর্মপতি এবং সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুপের প্রতি কড়া প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। তিনি যথার্থভাবেই সমাজের সকল অসঙ্গতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। লালন সমাজের বিভিন্ন সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে এভাবেই সোচ্চার হয়েছেন–

এসব দেখি কানার হাটবাজার
বেদবিধির পর শাস্ত্র কানা
আর এক কানা মন আমার।[২৬]

শ্রেণিবৈষম্য ও বর্ণবৈষম্যে জর্জরিত সমাজ, যেখানে ভণ্ড সমাজপতিরা নানাভাবে সমাজের কলকাঠি নেড়ে সমাজকে বিষিয়ে তুলেছিল। যারা প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের অপব্যাখ্যায় সমাজে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করত আর সমাজের অন্যান্য অনুষঙ্গও তাদের এই অন্যায় অবিচার, শোষণ-নিপীড়ন মেনে নিয়ে সমাজকে কুর্নিশ জানাতে ব্যস্ত। তখন লালন এই অতি প্রভাবশালী ভণ্ড ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। লালনের দৃঢ় উচ্চারণ–

কত কত মুণি ঋষি,
যুগ-যুগান্তর বনবাসী;
পাব বলে কাল-শশী বসিয়ে তপে।।[২৭]

ধর্ম, শাস্ত্র, পণ্ডিত, সাধু, মাতব্বর সবার বিরুদ্ধে লালনের এই যে সংগ্রাম তা সমাজের জাতপাতের ঊর্ণজালে আবদ্ধ মানবতাকে মুক্ত করার জন্য। তিনি আজীবন যেমন সমাজ কাঠামো বদলের আন্দোলন করেছেন, তেমনি এই পরিবর্তনের জন্য সমাজকে যোগ্যভাবে গড়ে তোলার জন্যও কাজ করে গেছেন। তাঁর এই সমাজ বদলের আন্দোলন শুধু তাত্ত্বিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি প্রায়োগিকভাবেও সমাজ বদলের আন্দোলন করে গেছেন। লালন সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয়, বঞ্চিত, নিপীড়িতজনদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছেন।

সমাজের সকল সত্তার প্রতি এই যে প্রতিবাদ তা শুধু সমাজে সকল মানুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। সমাজ থেকে সকল ভেদাভেদ দূর করে একটা সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য। যে সমাজে কোন শোষণ থাকবে না, অনাচার থাকবে না, সামাজিক নির্যাতন থাকবে না। আশরাফ আতরাফের কোন বিভেদ থাকবে না। লালনের সমসাময়িক সমাজের নিয়ন্ত্রক কর্তা ছিল তথাকথিত সমাজপতিরা। যারা শুধু নিজের স্বার্থ রক্ষাতেই বেশি ব্যস্ত ছিল। অন্যায়ভাবে পেশি শক্তির জোরে পরের জমি দখল, সামাজিক আচারের অপব্যবহার এবং সমাজের কুসংস্কারের দোহাই দিয়ে সমাজে নানা শোষণ জায়েজকারীদের বিরুদ্ধে লালনের এ এক যুগান্তকারী প্রতিবাদ। সমাজের শাসকগোষ্ঠীকে লালন অন্ধ আখ্যা দিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজের চার দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাই লালন বলেন–

এক কানা কয় আর এক কানারে
চল দেখি যাই ভবপারে
নিজে কানা পথ চেনে না
পরকে ডাকে বারংবার।[২৮]

লালন শাহের এই প্রগতিবাদী সমাজ চিন্তা সত্যিকার অর্থেই সমাজের বঞ্চিত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেণিসচেতনতা সৃষ্টি করেছিল। তাই তো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের শোষিতেরা দলে দলে তাদের সমাজ, ধর্ম, বর্ণ, জাতপাতকে পেছেনে ফেলে তার আন্দোলনে শামিল হয়ে সমাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

নালিশ জানানোর কোন জায়গা নেই, প্রতিকার পাবার কোন আশা নেই। তাই সমাজের মানুষকেই জেগে উঠতে হবে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে। লালনের এই প্রতিবাদ

জমিদারের বিরুদ্ধে, জমিদারের খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে। সমকালীন জমিদাররা সমাজের কৃষক রায়তদের রক্ত শুষে খেত। জমিদারেরা নিজেদের মুনাফার জন্য নানা রকম ছুতায় প্রজাদের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দিত এবং সেই কর আদায়ের জন্য হেন পন্থা নেই যা তারা গ্রহণ করত না। এ সম্পর্কে বাইশ প্রকার চাঁদা আদায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই জমিদারেরা কোনক্রমেই প্রজাহিতৈষী ছিলেন না এবং প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা তাদে কোনক্রমেই বিচলিত করে নাই। বরং প্রজাপীড়নই ছিল তাদের চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে লালনের বন্ধু ও ভাবশিষ্য কাঙাল হরিনাথের কুঠিবাড়ির চাকুরি ত্যাগের কথা স্মর্তব্য।[২৯]

লালনের আন্দোলন গ্রামীণ সমাজ থেকে শহুরে সমাজ, সমাজের নিম্ন শ্রেণি থেকে উচু শ্রেণি সবাইকে কমবেশি প্রভাবিত করেছিল। এটা সমাজের সমস্ত মানুষের জন্য সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির আন্দোলন। কারণ, তিনি মানুষের পূর্ণাঙ্গ মুক্তি কামনা করেছেন।

> মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ-বঞ্চনা-অবিচার-অবজ্ঞার চির অবসান কামনা করে লালন শ্রেণিহীন শোষণমুক্ত এক অভিনব আলোকিত সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য-ব্যবধান লালন কখনো অনুমোদন করেননি। তাঁর আন্তরিক প্রত্যাশা ছিল ধর্ম-কুল-গোত্র-জাতিহীন সাম্যশাসিত সমাজের। মানবাত্মার লাঞ্ছনায় কাতর মানুষের দুর্দশা-দুঃখে ব্যথিত, মানবমুক্তির প্রত্যাশায় ব্যাকুল লালনের এই ব্যতিক্রমী উচ্চারণ তাঁকে অনায়াসে শোষিতজনের পরমবান্ধব সমাজমনস্ক এক অসাধারণ মরমি-মনীষী হিসেবে চিহ্নিত করে। আবহমান বাংলার সংস্কার ও শোষণের অচলায়তনের দুর্গে এমন শক্ত আঘাত এসেছে এক নিরক্ষর গ্রাম্য সাধকের নিকট থেকে নিঃসন্দেহে এটি একটি ব্যতিক্রমী ও বিস্ময়কর ঘটনা।[৩০]

মানুষের কোনো জাতি নেই। মানুষে মানুষে কোনো ভেদ-বিভেদ নেই। এ বিষয়ে লালন দৃঢ় সত্যে উপনীত। যাকে বলা যায় বিজ্ঞান-সত্য। এ রকম প্রত্যয়ের কারণে লালন সমকালের সমাজে মোল্লা-পুরোহিত তথা ধর্মব্যবসায়ী ও ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বিভেদ-বিভাজন সৃষ্টিকারীদের প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। পোশাক-আশাক, চাল-চলন, অভ্যাস-সংস্কার সর্বোপরি জীবনধারার পার্থক্য ও মত-পথের পার্থক্য দিয়ে মানুষের জাতিগত বিভিন্নতা শনাক্ত করার মানসিকতাকে লালন দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে সর্বজনীন মানবতার বাণী ব্যক্ত করেছেন। তাই তিনি অশিক্ষিত বাঙালকে মানুষ, সোনার মানুষ এবং মনের মানুষ হবার আহ্বান জানান যা বাঙালির রক্তে নতুন মাত্রার সংযোজন। তিনি বলেন–

> মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।
> মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপা রে, তুই মূল হারাবি।।[৩১]

লালনের এই সমাজপরিবর্তনের যে আন্দোলন তার পথ খুব মসৃণ ছিল তা কিন্তু নয়। তাঁর সমকালে বা উত্তরকালে সমাজপতি, শিক্ষাবিদ, ধর্মগুরু, ধর্মব্যবসায়ী সবাই তাদের সামাজিক অবস্থানকে টিকিয়ে রাখার জন্য লালনের আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন। কারণ, লালনের আন্দোলন মানুষকে ধর্মীয় গোঁড়ামি ভুলে উদার হতে শিক্ষা দিয়েছে। তাই সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুপ শঙ্কিত হয়ে প্রতিরোধের আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। লালনের বিরুদ্ধে সমাজের স্বার্থান্বেষী মহলের আক্রোশ এবং প্রতিরোধ ছিল স্পষ্ট।

মূলত লালন তৃণমূল সমাজেরই একজন সদস্য। নগর নয়, গ্রামে তিনি বাস করেছেন। আর এই গ্রামীণ সমাজকে তিনি পরিবর্তন করতে চেয়েছেন নানাভাবে, যা আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে। এ ছাড়াও বলা যায়,

> লালনের সমাজে পরনারী-পরদ্রব্য হরণ গ্রহণীয় নয়। এই নৈতিকতায় বাঙালি সমাজ শক্তিশালী হতে পারে। জীবনকালের যে জন্মান্তরবাদ তিনি ব্যক্ত করেছেন, সেখানে মানুষের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীলতাকে লক্ষ করা হয়েছে, এ লালনের বিচক্ষণ দার্শনিক পর্যবেক্ষণ। সর্বোপরি লালন ভেড়ুয়া বাঙালকে মানুষ, সোনার মানুষ এবং মনের মানুষ হবার আহ্বান জানান যা বাঙালির রক্তে নতুন মাত্রার সংযোজন, এই সোনার মানুষের দেশই সোনার বাংলা। এ চিন্তা দার্শনিক রাজার চিন্তা পার হয়ে দার্শনিক সমৃদ্ধ এবং বাস্তবসম্মত দেশেরই রূপকল্প। দেহ হলো সর্বোচ্চ মূল্যবহ, তাই সুস্থ ও শক্তিশালী দেহধারণের জন্য সকল রকম আয়োজন অত্যাবশ্যক, এই চিন্তার চেয়ে আর প্রয়োজনীয় কি চিন্তা থাকতে পারে? এ কথা প্রমাণিত যে এককভাবে নয় পদ্ধতিগুলো অর্জন করতে হবে যৌথ প্রয়াসে–তারপরও ব্যক্তিক সুস্থতার মূল্য এক বিন্দুও হ্রাস পাবে না। আর ব্যক্তি যত বেশি সোনার মানুষ হয়ে উঠতে পারবে তত বেশি সোনার হয়ে উঠবে দেশ। এটাই সোনার বাংলার প্রকৃত রূপকল্প।[৩২]

যা বর্তমান সমাজব্যবস্থার মূলমন্ত্র।

মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ-বঞ্চনা-অবিচার অবজ্ঞার চির-অবসান কামনা করে লালন শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। উচ্চ-নিচ, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান লালন অনুমোদন করেন নি। ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে এবং নিপীড়িত মানুষের পক্ষে তিনি ছিলেন সংগ্রামরত। আজ সময় এসেছে লালনের মানবতাবাদী চিন্তাদর্শের প্রচার ও অনুশীলন করার। আর সংঘাত নয়, ধ্বংস নয়, শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য সমস্ত ব্যক্তি-স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠে লালনের আরাধ্য সমাজ ও শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, বুকস্ ফেয়ার, ঢাকা, জুলাই ২০১৮, পৃ.৩৯
২. ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, *বাংলার বাউল*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ.৬৩
৩. আনোয়ারুল করীম, *বাংলাদেশের বাউল-সমাজ-সাহিত্য ও সংগীত*, বর্ণায়ন, ঢাকা ২০০২, পৃ.৩১-৩২
৪. অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ*, কলিকাতা, অক্টোবর ১৯৫৮, পৃ.২৫৮
৫. ওয়াকিল আহমদ, *বাউল গান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ ২০০০, পৃ.২২
৬. আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁই ও বাঙালি সমাজ*, শোভা প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৮২
৭. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭১
৮. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯
৯. ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯
১০. ফজলুল হক সৈকত (সম্পা), *লালন: চিন্তা ও কর্ম*, নবরাগ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ.১৬২-১৬৩
১১. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৩
১২. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ.১৮৮
১৩. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭২
১৪. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

১৫. আবু ইসহাক হোসেন, *ফকির লালন সাঁই দর্শন ও সমাজতত্ত্ব*, দি ইউনিভার্সেল একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ.৪৯
১৬. আবদুল ওয়াহাব, *লালন-হাসন: জীবন-কর্ম-সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০৯, পৃ. ৩৭০
১৭. আবু ইসহাক হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮
১৮. আবু ইসহাক হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
১৯. আবু ইসহাক হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
২০. মোস্তাক আহমাদ, *লালন সমগ্র: পরমতাত্ত্বিক আধ্যাত্মিক ও সুফি ভেদরহস্য*, দি ইউনিভার্সেল একাডেমি, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ. ৩৩১
২১. আবদুল ওয়াহাব, *লালন-হাসন: জীবন-কর্ম-সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১
২২. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪
২৩. ওয়াকিল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪
২৪. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
২৫. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০
২৭. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
২৮. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০
২৯. আবু ইসহাক হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
৩০. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
৩১. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪
৩২. আফজালুল বাসার, *লালন ও বাঙালি*, বাংলা গবেষণা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১০৫

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/জুন ২০২১

গ্রন্থ-সমালোচনা

কাশ্মীর : দেশীয় রাজ্য থেকে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল প্রলম্বিত সংকটের আখ্যান, আকমল হোসেন, ঢাকা: সংহতি প্রকাশন, ২০২০, পৃ. ১২৬, মূল্য: ২৪০ টাকা (১০ ডলার)

২০১৯ সালের ৫ আগস্ট ভারতের সংবিধানের ৩৭০ ধারা জাতীয় সংসদে বাতিল হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে 'স্বতন্ত্র' রাজ্যের মর্যাদা বিলুপ্ত করে কাশ্মীরকে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে নিয়ে আসা হয়। এজন্য জম্মু-কাশ্মীরকে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাঘ নামে ভূখণ্ডগতভাবে দুই অংশে ভাগ করা হয়। জম্মু-কাশ্মীরের এই রাজনৈতিক মর্যাদা এবং ভূখণ্ডগত পরিবর্তন কাশ্মীর নিয়ে জনপরিসরে নতুন করে আগ্রহ এবং আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করে। এরকম একটা বাস্তবতায় কাশ্মীর নিয়ে পেশাগতভাবে অবসরে যাওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক আকমল হোসেনের লেখা *কাশ্মীর: দেশীয় রাজ্য থেকে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল প্রলম্বিত সংকটের আখ্যান* একাডেমিক বইয়ের জগতে একটা অনন্য সংযোজন।

এমনিতেই বাংলা-ভাষায় কাশ্মীর নিয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত গবেষণামূলক পুস্তক খুব অপ্রতুল বা নাই বললেই চলে। তাই এ সময়ের কাশ্মীরকে জানবার জন্য আগ্রহী পাঠকগণের জন্য আকমল হোসেনের লেখা গ্রন্থটি খুব সহায়ক হবে। বইটা পড়া শেষ করলে পাঠক অন্তত এটুকু অনুধাবন করতে পারবেন যে, কাশ্মীরকে ঘিরে ঐ অঞ্চলের নিজস্ব রাজনীতি ও ভূরাজনীতি; ভারত-পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি; ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক, জাতিসংঘের ভূমিকা; চীন, রাশিয়া (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন), উপনিবেশকালীন ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক আগ্রহ এবং দক্ষিণ-এশিয়া অঞ্চলে তাদের নিজস্ব হিসেব-নিকেশের কারণে কাশ্মীরকে খুব চট করে বা সহজে বুঝার কোনো উপায় নেই। এই জটিলতার জট খোলা এবং কেন্দ্রীয় শাসনে একীভূত বর্তমানের কাশ্মীরকে বিশ্লেষণের জন্য ইতিহাসের পিঠে সওয়ার হওয়া একটা খুব কার্যকরি উপায়। এই উপায়টিকে খুব সফলভাবে লেখক প্রয়োগ করেছেন তাঁর ২০২০ সালের প্রকাশিত বইটিতে। এটিতে কাশ্মীরের আজকের পরিণতির যে চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটল ৩৭০ ধারা বাতিলের মধ্য দিয়ে, সেই ধারাকে ইতিহাস-নির্ভর বিশ্লেষণ করেছেন লেখক।

ইতিহাসের পিঠে সওয়ার হয়ে আকমল হোসেন কাশ্মীরের বর্তমান পরিণতির বিশ্লেষণ করেছেন, ভূমিকা এবং শেষাংশ ছাড়া, বইটির মোট আটটি অধ্যায়ে।

কাশ্মীর নামটির উৎস থেকে শুরু করে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের শ্রীনগরের পত্তন, হিন্দু ধর্মের আগমন, মোঘল শাসন, আফগান শাসন, শিখ শাসন এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৪৬ সালে অমৃতসর চুক্তির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে রাজা হরি সিং কর্তৃক সেই ভূখণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করা এবং সাম্প্রদায়িক ডোগরা রাজত্বের বিকাশ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা হয়েছে বইটির প্রথম অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ের ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের

উপর আলোকপাত করার সাথে সাথে কাশ্মীর মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল হলেও ওখানে ধর্মগত বৈচিত্র্যের শক্তিশালী উপস্থিতির বিষয়টি লেখক তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও, কাশ্মীরের মত ৫৬২টি দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনীতি, ধর্মপরিচয়ের প্রেক্ষাপটে ভারত কিংবা পাকিস্তানে যোগ দেওয়া বা স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখা সংক্রান্ত ঔপনিবেশিক ব্রিটেনের ভিন্ন নীতি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের কাশ্মীর রাজ্যকে কোন অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বাস্তবতা ও ভূ-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে মহারাজা হরি সিং ইন্সট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশন স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করল, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে এই অধ্যায়ে। এটা যে একটা সাময়িক ও শর্তযুক্ত প্রক্রিয়া ছিলো, সেটা নিশ্চিত করেছেন লেখক। সেই সময় এই অঞ্চলের ভারতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটি সাময়িক একটা ব্যবস্থা ছিল বলে মনে করতেন কাশ্মীরি নেতা শেখ আব্দুল্লাহ। এই বিষয়টিও লেখক সংক্ষেপে আলোচনায় এনেছেন। তাই কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য গণভোটের শর্তটির প্রাসঙ্গিকতা কী, সেটারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক। একই সাথে কীভাবে কাশ্মীরকে ঘিরে ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ হলো এবং জম্মু-কাশ্মীর পাকিস্তান-প্রভাবিত এক-তৃতীয়াংশ আজাদ কাশ্মীরে পরিণত হলো কিংবা ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান কেন ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তাদের নিয়ন্ত্রিত অংশের একটা এলাকা চীনকে ছেড়ে দিল, সেটাও জানা যায় এই অধ্যায়টিতে।

লেখক তৃতীয় অধ্যায়ে আলোকপাত করেছেন সামগ্রিকভাবে কাশ্মীর বিষয়ে জাতিসংঘের ভুমিকা নিয়ে। বিশেষ করে ১৯৪৭-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতায় যুদ্ধবিরতি, কাশ্মীরের অসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা এবং কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে গণভোটের প্রস্তাব এবং তা শেষ পর্যন্ত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ার বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তিনি অধ্যায়টিতে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধকে ঘিরে ভারত-পাকিস্তানের জাতিসংঘে কূটনৈতিক তৎপরতা, পারস্পরিক দোষারোপের রাজনীতির ধারাবাহিকতা, যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ ও জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রচেষ্টা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

বইটির চতুর্থ অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার মতে, এটাই পুরো বইটার কেন্দ্রীয় অধ্যায়। ১৯৩০-এর দশকে ভারতভুক্তির পূর্বে কাশ্মীরের রাজনীতিতে ডোগরা শাসনের সাম্প্রদায়িক এবং বৈষম্যমূলক নীতি বিরোধী মুসলমান জনগোষ্ঠীর তীব্র গণআন্দোলন এবং সেক্যুলার নেতা শেখ আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং চৌধুরী গুলাম আব্বাস ও মিরওয়াইজ মোহাম্মদ ইউসুফ শাহের নেতৃত্বে মুসলিম কনফারেন্স নামের দুটি সংগঠনের বিকাশ নিয়ে এই অধ্যায়ের শুরুতেই আলোকপাত করা হয়েছে। সংগঠনগত রাজনৈতিক বিকাশ শেষ পর্যন্ত মহারাজা হরি সিংকে বাধ্য করেছিল কাশ্মীরে সাংবিধানিক পদক্ষেপসহ ৭৫ সদস্যের আইনসভা গঠন করতে। মুসলিম কনফারেন্সও ধর্ম পরিচয়ের বৈচিত্র্য এবং কাশ্মীরের রাজনীতিতে নানা চিন্তার জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির কথা বিবেচনা করে তাদের সংগঠনের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি ছেঁটে ফেলে। শুরুর এই আলোচনা পাঠককে বুঝতে সাহায্য করবে, কেন রাজতন্ত্রবিরোধী সেক্যুলার নেতা শেখ আব্দুল্লাহর চাপে এবং পাকিস্তানবিরোধী অঞ্চল বিকাশের অভিপ্রায়ে ভারতের সংবিধানের

প্রণয়নকারীরা সংবিধানে ৩০৭ ধারা সংযুক্ত করে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছিল এবং কেন তাকে প্রধানমন্ত্রী বানানো হয়েছিল। তবে কংগ্রেস আর নেহেরুর রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে শেখ আব্দুল্লাহর রাজনৈতিক অবস্থানের একরকমের একাত্মতা থাকলেও প্রধানমন্ত্রীত্বকালীন তাঁর ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ হিন্দু সম্প্রদায় এবং জমিদার ও দক্ষিণপন্থি আমলারা খুব ভালো চোখে দেখেনি এবং তাঁরা ৩৭০ ধারার বাতিলের দাবি তোলে। এগুলোর প্রতিক্রিয়ায় শেখ আব্দুল্লাহ গনভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরের স্বাধীনতাকে বিকল্প পথ হিসেবে উপস্থাপন করলে ভারত সরকার ১৯৫৩ সালে তাকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারপন্থি বকশী গোলামকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করে। তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন। যেমন: কেন্দ্রের বিভিন্ন আইন প্রয়োগ, প্রশাসনিক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক কাশ্মীরে প্রবেশের অধিকার দেওয়া। তারপরও কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৩ সালে তাকে পদচ্যুত করে রাজ্যের আইনসভার বদলে গভর্নর নিয়োগ করার ক্ষমতা নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নেয়। এতে এরপর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় মুখ্যমন্ত্রী বদলে যেতে শুরু করে। পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালে শেখ আব্দুল্লাহকে মুক্ত করেন আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি থেকে সরে আসার চুক্তির শর্তে, যদিও ৩৭০ ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে শেখ আব্দুল্লাহ নির্বাচনে জয়ী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হন। এ সকল তথ্য এবং ব্যাখ্যা প্রদানের মধ্য দিয়ে লেখক এই অধ্যায়ে দেখিয়েছেন, কীভাবে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার রাজনীতির মারপ্যাঁচে ইতোমধ্যে সংবিধানের ৩৭০ ধারাকে কাশ্মীরিদের জন্য একটি প্রতীকী ধারায় পরিণত করেছে ক্রমান্বয়ে। সম্ভবত এই অধ্যায়টি পরিস্কার ধারণা তৈরি করবে যে, বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক মতাদর্শই একমাত্র কারণ নয়, সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের জন্য। আসলে ১৯৪৭ সালের পর থেকেই কাশ্মীরের নিজস্ব রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই ভারতের কেন্দ্রীয় শাসকদের একটা অনাস্থা ছিল এবং কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ধারণা এবং ভারত রাষ্ট্রের অখণ্ডতা সংক্রান্ত সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি তাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল সামগ্রিক অর্থে। শেখ আব্দুল্লাহকে পদচ্যুতি ও গ্রেফতার, আবার শর্তযুক্ত চুক্তির মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ফিরে আসা এই অনাস্থা বা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রভাবিত রাজনৈতিক আচরণ, এ সবকিছুর উদাহরণ। আসলে ৩৭০ ধারা নিয়ে ভারতের জাতীয় পর্যায়ে আগে থেকেই বিরাজমান অনাস্থা, বিতর্ক বিজেপির জন্য ধারাটির বাতিল করার কাজটিকে সহজ করে দিয়েছে মাত্র ২০১৯ সালে। তাই এ সবকিছু বিবেচনায় চতুর্থ অধ্যায়টিই আজকের কাশ্মীরের নতুন বাস্তবতা বুঝার জন্য সহায়ক।

লেখক পঞ্চম অধ্যায়ে কাশ্মীরিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের বিকাশের ধারা কোন কোন পথে গেছে এবং কোন প্রেক্ষাপটে তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হলো এবং বিশেষ করে ২০০৬ সালের পরবর্তীকালে নিরস্ত্র প্রতিবাদকে বেছে নিল, তা বিশ্লেষণ করেছেন খুব সুচারুভাবে। একই সাথে ১৯৮৭ সালের নির্বাচনের কারচুপির প্রতিক্রিয়ায় কীভাবে এবং কেন তিনটি বড় গোষ্ঠী যেমন, হারকাত-উল-মুজাহেদিন, লস্কর-ই-তয়বা এবং জইশ-ই-মোহাম্মদ পাকিস্তানের সমর্থন নিয়ে তাদের সশস্ত্র কর্মতৎপরতা চালিয়েছে তাঁর ব্যাখ্যা করেছেন। আবার পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই কীভাবে কাশ্মীরিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামকে জেহাদ হিসেবে সামনে এনে এই

গোষ্ঠীগুলোকে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাও সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন লেখক। এই অধ্যায়ে একই সাথে ভারতীয় মূলধারার বিশ্লেষকরা তাদের আলোচনায় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাশ্মীরিদের বিদ্রোহকে ব্যাখ্যা করার কারণে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিদিনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার প্রয়োজনীয় রসদ জুগিয়েছে, সেই আলাপটাও প্রাসঙ্গিকভাবে এনেছেন তিনি। তবে নিরস্ত্র প্রতিবাদের সূচনার মধ্য দিয়ে কাশ্মীরিদের বিদ্রোহ যে একটা সর্বজনীন রূপ পেয়েছিল, তা উল্লেখ করেন লেখক এই অধ্যায়ের শেষ মন্তব্যে, যদিও ফিলিস্তিনের ইন্তিফাদার আদলে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে কাশ্মীরিদের প্রতিবাদকে ভারতীয় গণমাধ্যম 'ইসলামী সন্ত্রাসবাদী' বলে প্রচার দিয়েছিল বলে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে মোটা দাগে কাশ্মীরে বিদ্রোহ দমনে রাষ্ট্রের সহিংসতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিদ্রোহ দমনে ভারতীয় সরকারের কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি কর্মসূচি গ্রহণের প্রেক্ষাপট আলোচনায় কী করে একদিকে কাশ্মীরিদের বিভিন্ন কর্মসূচিকে 'আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা' হিসেবে চিহ্নিত করা এবং অন্যদিকে বিদ্রোহী কার্যকলাপকে পাকিস্তান প্ররোচিত ঘটনা হিসেবে দাবী করা, সেই সময়কার কাশ্মীরের দ্বিতীয় মেয়াদের গভর্নর কর্তৃক নিষ্ঠুর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করার সহিংস চেষ্টা করা, তার বিবরণ দিয়েছেন লেখক। সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০-এর দশকে সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৯০ ও উপদ্রুত এলাকা আইন, ১৯৯৭-এ দায়মুক্তি ধারা সংযুক্ত করে নিরাপত্তা ও সামরিক বাহিনীগুলোকে বিদ্রোহ এবং রাজনৈতিক আন্দোলন দমনে অস্বাভাবিক ক্ষমতা দেওয়া হয়। তবে এতে বন্দুক যুদ্ধ, এনকাউন্টার, সাধারণ মানুষ হত্যার প্রতিক্রিয়ায় তরুণদের যোগদানের আগ্রহ আরো বাড়ে। পরবর্তীকালে ২০০১ সালের ডিসেম্বরে ফেদাইন যোদ্ধাদের ভারতীয় সংসদ ভবনে আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ওই ঘটনাকে ভারতের উপর আক্রমণ বলে বিবেচনা করেন। একই কায়দায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদভানী এই আক্রমণকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার সাথে তুলনা করেন। সবকিছু মিলিয়ে সরকারি হেফাজতে মৃত্যু, বেআইনী গ্রেফতার এবং অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে এবং কখনো কখনো তা আরও বেশি নৃশংসতা নিয়ে হাজির হয়। পরিসংখ্যানের ছক দিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়টিতে। আবার ভারত সরকারের নৃশংস এবং সহিংস পদক্ষেপের সীমাবদ্ধতা নিয়ে খোদ সশস্ত্র বাহিনীর কেউ কেউ যে দুশ্চিন্তায় ছিল, তা দাবী করে লেখক এই অধ্যায়ের শেষের দিকে ভারতের নর্দার্ন আর্মি কমান্ডার লে. জেনারেল ডি এস হুদার ব্যাপকভিত্তিক সংলাপের প্রস্তাব কিংবা অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল কপিল কার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ে সামরিক বাহিনীর আগ্রহ এবং পুলিশি দায়িত্ব পালনে অনিচ্ছার কথা জানিয়েছেন লেখক।

সপ্তম অধ্যায়ে লেখক কাশ্মীর ইস্যু ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে কী প্রভাব ফেলেছে গত ৭২ বছরে তা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক হোসেন ভারতীয় বিশ্লেষকেরা কীভাবে এই বিষয়টাকে দেখছেন তার অবতারণা করেছেন এবং একই সাথে পাকিস্তানের কাশ্মীরনীতি যে সব সময় এক রকম থাকেনি তা বলেছেন। এ বিষয়ে ভারতের জন্য কাশ্মীরের চারটি তাৎপর্য তুলে ধরেন লেখক। যেমন: কাশ্মীরকে ঘিরে সংঘাতের দীর্ঘদিনের উপস্থিতি 'কৃত্রিম' ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে হিন্দুত্ববাদ গ্রহণ করে বিচ্ছিন্নতাবাদ সমাধান করা;

বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর কাশ্মীরে ধারাবাহিক উপস্থিতি গণতন্ত্রের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি এতে সীমান্ত-সমস্যাও বাড়িয়েছে; ৩৭০-ধারা বাতিল হলে রাজ্যের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ভারসাম্য হিন্দু অধ্যুষিত ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে যাবে; ভারতের সরকারগুলো কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করার কারণে স্বায়ত্তশাসনের দাবি ভারত রাষ্ট্রের অখণ্ডতার জন্য হুমকি। আবার পাকিস্তানের কাশ্মীর নীতি প্রসঙ্গে লেখক জানান যে, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কয়েকবার যুদ্ধ হলেও পাকিস্তান ১৯৫০-১৯৮০ এই সময়কালে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে পরাশক্তির সাহায্যে ভারতের সাথে দ্বন্দ্বের সমাধান করতে চেয়েছে। ১৯৮০-২০০৪ পর্যন্ত কাশ্মীরি বিদ্রোহীদের সশস্ত্র সংগ্রামে সাহায্য করেছে। একই সাথে কাশ্মীর নিয়ে সামরিক প্রতিযোগিতা ভারত-পাকিস্তানকে পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত করেছে তেমনি আন্তঃসীমান্ত সংঘাতের ক্ষেত্রেও ভয়াবহতা বাড়িয়েছে। উদাহরণ হিসেবে লেখক ২০১৬ সালে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে ভারতীয় সামরিক ঘাঁটি উরিতে সশস্ত্র জঙ্গি হামলার ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। পাল্টা জবাবে পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মাধ্যমে জঙ্গি হত্যার ঘটনাটিও বর্ণনা করেছেন। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতেও ভারত নিয়ন্ত্রিত পুলাওয়ামা জেলায় জইশ-ই-মোহাম্মদের আত্মঘাতী হামলা এবং ভারতীয় বিমানবাহিনীর পাকিস্তানের পাখতুনখাওয়া প্রদেশে জঙ্গি শিবিরে পাল্টা আক্রমনের বিষয়টিও আলোকপাত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এই ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে এগুলো শেষ পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা এবং আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে। সংবিধানের ৩৭০-ধারা বাতিলের প্রেক্ষাপট বুঝার জন্য এই ঘটনাগুলোর আলোকপাত খুব প্রাসঙ্গিকভাবেই করেছেন লেখক এই অধ্যায়ে।

শেষ অধ্যায় অর্থাৎ অষ্টম অধ্যায়ে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল কেন এবং কীভাবে হলো তা ব্যাখ্যা করেছেন। সেটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক এর আগে রাজ্যটিকে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে নিয়ে আসার সাথে এবারের ৩৭০ ধারা বাতিলের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএসের রাজনৈতিক সংগঠন জনসংঘের উত্তরসুরী হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ২০০৯ সাল থেকে তাদের নির্বাচনি প্রচারণায় সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলকে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে তুলে ধরে। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই উগ্র ডানপন্থি জনসংঘই কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টার বিরোধিতা করেছিল শুরুতেই। এ কথাও অনস্বীকার্য যে, কাশ্মীর নিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা সামগ্রিক অর্থেই রাজনীতিতে কম-বেশি শক্তিশালী ছিল। মোটা দাগে বলা যায়, ভারতের নির্বাচনি রাজনীতির বাস্তবতায় মূলধারার কোনো রাজনৈতিক দলই সুস্পষ্টভাবে এই ইস্যুতে বিকল্প কোনো ধারার সূচনা ঘটানোর সাহস করেনি। উপরন্তু কাশ্মীরকে ঘিরে 'ইসলামিক' পাকিস্তানের সাথে বিরোধ, যুদ্ধ এবং সীমান্ত সংঘাতের পরিবর্তিত চরিত্র ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এ রকম বিকল্প চিন্তার সম্ভাবনাকে একেবারেই দুরূহ করে তুলেছিল, 'দেশদ্রোহী' হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার আশঙ্কার কারণে। এরকম একটা বৃহৎ পর্যায়ে বিরাজমান অনুকূল প্রেক্ষাপটে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে সংঘটিত সংঘাত ৩৭০ ধারাটি বাতিল করার প্রক্রিয়াটিকে অপরিহার্য করে তোলে। এ দিকটা ওভাবে এই অধ্যায়ে এত বিস্তৃতভাবে আলোচিত না হলেও বিজেপি এই ধারা বাতিলের যুক্তি হিসেবে দেশীয় ও

আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের জন্য খুব চতুরতার সাথে কীভাবে ৩৫-ক ধারাকে কাশ্মীরের অস্থায়ী অধিবাসী এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর ৩৭০ ধারা বাতিল সংক্রান্ত ভাষণে কাশ্মীরে সরকারের বেশ কিছু গৃহীত পদক্ষেপের কথা ও আশ্বাস দিয়ে ৩৭০ ধারা বাতিলের মাধ্যমে সেখান থেকে সন্ত্রাসবাদ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অনুন্নয়ন দূর করবে তা আলোচনা করেছেন লেখক। লেখক দেখিয়েছেন যে, এই ধারা বাতিলের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানের ভুমিকা, চীনকে নিজেদের আনুকূলে পাওয়ার জন্য নিরাপত্তা পরিষদে ব্যবহারের ব্যর্থ চেষ্টা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বল অবস্থান এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে দেখার ফলে ভারতকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো জোরালো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়নি। ধারাটি বাতিলের ব্যাপারে জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্বেগ প্রকাশের ধরনটা সনাতনী ছিল না বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি মহাসচিবের ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত সিমলা চুক্তি অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীরের চূড়ান্ত মর্যাদা নির্ধারণের ওপর জোর দেওয়ার প্রসঙ্গ টানেন।

বইটির শেষাংশের একটি উদ্ধৃতি খুব প্রাসঙ্গিক, এই বইটির আটটি অধ্যায়ে ইতিহাস-নির্ভর প্রাসঙ্গিক ঘটনার বর্ণনার মধ্য দিয়ে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের প্রেক্ষাপট এবং তার ভবিষ্যৎ ঝুঁকি অনুধাবনের জন্য। লেখক খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে বইটির ৯৯ পৃষ্ঠায় কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে বলেছেন,

> এ সমস্যার সমাধান কবে হবে, কীভাবে হবে তার উত্তর খোঁজা যেমন চলতে থাকবে, অন্যদিকে বর্তমান দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ও শান্তির জন্য এটা বড় হুমকি হয়ে থাকবে। সংকটটি শুরু থেকেই ভারত-পাকিস্তানের দ্বন্দ্বে পরিণত হওয়ায় এর অভ্যন্তরীণ উপাদানটি হারিয়ে গিয়েছে। ভারতীয় রাষ্ট্রের আচরণ যে কাশ্মীরবাসীর মানসিক বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী তা বিবেচনা করা হয়নি কখনই। বিষয়টি শুধুমাত্র ভারত-পাকিস্তানের সমস্যা ধরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় প্রতিক্রিয়া দেখায়।

অধ্যাপক আকমল হোসেনের পুরো বইটিতে তার বিশ্লেষণকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণা পদ্ধতির আলোকে দেখলে এটা স্পষ্ট যে, তিনি কাশ্মীরের সংকট বুঝার ক্ষেত্রে মূলত অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং রাষ্ট্র- এ দুটি স্তরে অনেক বেশি মনোযোগী ছিলেন। জাতিসংঘের ভুমিকা আলোচনায় আসলেও সেটা করা হয়েছে শুধু ভারত-পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রের কূটনৈতিক তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন কীভাবে কাশ্মীরকে ঘিরে স্নায়ুযুদ্ধের বাস্তবতায় এই দুই দেশকে নিজেদের বলয়ে নিতে চেয়েছে তা মোটাদাগে অনুপস্থিত বইটিতে। বিশ্বরাজনীতির কাঠামো দিয়ে বিশ্লেষণ না করার কারণে কাশ্মীরিদের সশস্ত্র সংগ্রাম সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতা হিসেবে জোরালো পরিচিতি পাওয়া এবং পাকিস্তানের পরিবর্তিত ভুমিকায় বা ৩৭০ ধারা বাতিলের পরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়সারা প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ৯/১১ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থার প্রভাবের বিষয়টি অন্ধকারেই থেকে গেল। আবার কিছু কিছু অধ্যায়ে ঐতিহাসিক ঘটনার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েছে, ভূ-রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখক ঘটনার ঐতিহাসিক বর্ণনায় অনেক বেশি মনোযোগী ছিলেন। এতে লেখকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, মন্তব্য, বিশ্লেষণ অপ্রতুল রয়ে গেছে। আবার ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত লেখা বা তথ্যের সূত্রের উল্লেখ পরের সংস্করণে পূর্ণাঙ্গভাবে

দিলে ভবিষ্যৎ গবেষকরা অনেক উপকৃত হবে। তার সাথে আলাদা করে তথ্যপঞ্জিকা বা গ্রন্থের তালিকা দিলে বইটির বিদ্যায়তনিক মূল্য আরো বাড়বে। এ সব ছোট-খাটো এবং স্বাভাবিক দুর্বলতা সত্ত্বেও কাশ্মীর সংকট নিয়ে বাংলা ভাষায় এরকম একটা বই, বাংলাদেশের জ্ঞান জগতে একটা অনন্য দলিল হয়ে থাকবে। সেজন্য লেখক অধ্যাপক আকমল হোসেনকে অভিনন্দন।

মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান*

* অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/জুন ২০২১

গ্রন্থ-সমালোচনা

মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানঃ *নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণিঃ রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০২০, পৃষ্ঠা ৪৪৩, মূল্যঃ ৪০০ টাকা

নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণি: রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতি গ্রন্থটি মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান-এর এ-বিষয়ে দীর্ঘ দিনের অধ্যয়ন ও গবেষণার ফসল। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, নবাবী শাসনামল বঙ্গ-ভারতের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। আঠারো শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতির যুগে মুর্শিদকুলি খানের নেতৃত্বে বাংলাকে কেন্দ্র করে যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের শাসন যুগের সূচনা হয়, ইতিহাসে এটিই 'নবাবী শাসনামল' নামে পরিচিত। নবাব হিসেবে পরিচিত মুর্শিদকুলি খান এবং তাঁর উত্তরসূরি শাসকগণ আইনত মুঘল কেন্দ্রীয় রাজশক্তির সার্বভৌমত্বাধীন হলেও অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও রাজ্য পরিচালনায় কার্যত তাঁরা ছিলেন স্বাধীন। মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন যুগে ভারতব্যাপী বিশৃঙ্খল ও অরাজক পরিস্থিতির বিপরীতে নবাবী বাংলায় শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ধারা প্রবহমান ছিল। কিন্তু মাত্র অর্ধশতকের ব্যবধানে গোটা পরিস্থিতি পাল্টে যায়। ১৭৫৭ সালের ঐতিহাসিক পলাশি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলার নবাবী শাসনের পতন ঘটে। শুধু তাই নয় এই নবাবী বাংলাই সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত হয়ে দাঁড়ায়। পলাশির প্রান্তরে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর পরাজয়ের মাধ্যমে কেবল বাংলায় নয় ক্রমান্বয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ প্রায় দু'শ বছরের জন্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কবলে নিপতিত হয়।

আঠরো শতকে ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের যুগে নবাব শাসিত বাংলা ছিল পুরোপুরি ব্যতিক্রম। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ সময় বাংলার রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ও আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল একে সমকালীন ইউরোপীয় দেশসমূহের পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলকে ছাড়িয়ে বাংলার এ ব্যতিক্রমী উন্নতির কারণ কী? আবার অল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলাসমেত সমগ্র ভারতে বিদেশি শাসনের দ্বার উন্মোচনের ঐতিহাসিক গ্লানিও কেন নবাব শাসিত বাংলাকে বহন করতে হয়? আলোচ্য গ্রন্থে মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান নবাবী বাংলার উপর্যুক্ত ব্যতিক্রমী উন্নয়ন এবং একই সাথে এর অধোগতি ও পতনে নবাব ছাড়াও তদানীন্তন সামাজিক শক্তি অভিজাত শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লেষের কথা বলেছেন। নবাবী বাংলার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি, সার্বিক উন্নয়ন ও চূড়ান্ত পতনের সাথে তিনি অভিজাত শ্রেণির যোগসূত্র থাকার কথা দাবি করেছেন। আর এ কারণেই নবাবী বাংলার ইতিহাস অধ্যয়ন ও সে সময়কার যুগ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্য এ অভিজাত শ্রেণির গঠন ও বিকাশ এবং নবাবী বাংলার রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁদের

ভূমিকা ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিষয়ে অনুসন্ধানী গবেষণাকে গ্রন্থকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন।

মুঘল শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার যুগসন্ধিক্ষণে অবস্থিত নবাবী আমলের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সংশিষ্ট ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষক ছাড়াও ইতিহাস অনুরাগী সাধারণ পাঠকের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। এ বিষয়ে গত প্রায় পৌনে তিন'শ বছরে রচিত ইতিহাস গ্রন্থের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। তবে এসব গ্রন্থের বেশির ভাগেরই মূল উপজীব্য রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর সব সমাজই নানা শ্রেণিতে বিভক্ত। বিভাজিত সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গশক্তি হলো অভিজাত শ্রেণি। আধুনিক যুগে রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা অন্যান্য সামাজিক শক্তির তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু মধ্যযুগে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অভিজাত শ্রেণির ভূমিকার সবিশেষ গুরুত্ব ছিল। সামাজিক পদ-মর্যাদায় রাজা-বাদশাহ ও রাজপরিবারের পরেই এদের অবস্থান হলেও কার্যত এ শ্রেণিকে শাসকগোষ্ঠীর অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। নবাবী বাংলায়ও এর ব্যতিক্রম ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আধুনিক কালে রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি সামাজিক ইতিহাস চর্চার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুগপ্রবণতা অনুযায়ী নবাবী বাংলার সামাজিক ইতিহাস নিয়েও ইতোমধ্যে কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণি-সম্পর্কিত স্বতন্ত্র অধ্যয়ন এখনও ইতিহাসবিদদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। ফলে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত আলোচনা এ যাবৎ উপেক্ষিত ও অবহেলিতই রয়ে গেছে। এতদবিষয়ে বিশেষ করে বাংলা ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থের অভাব রয়েছে। এরূপ বাস্তবতায় উপর্যুক্ত শিরোনামে বর্তমান গ্রন্থটি প্রণয়নে উৎসাহী হয়েছেন বলে লেখক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান গ্রন্থের প্রাক-কথন ও ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণি: রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতি গ্রন্থটি ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এক্ষেত্রে যথাযথ অধ্যায় বিন্যাসের মাধ্যমে গ্রন্থটিতে লেখক ক্রমান্বয়ে তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক তাঁর আলোচ্য ক্ষেত্র ও পরিধি নির্ধারণসহ বিষয়বস্তু এবং গ্রন্থ রচনার যৌক্তিকতা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রসঙ্গত 'নবাব' শব্দের উৎপত্তি, পর্যালোচনাধীন সময়ের শাসকগোষ্ঠীকে নবাব অভিধায় অভিষিক্তকরণের কারণ এবং 'অভিজাত' শব্দের ব্যাখাও তিনি ভূমিকায় যুক্ত করেছেন। এতে গ্রন্থটি রচনায় সহায়ক তথ্য-উপাত্তের যে পর্যালোচনামূলক বর্ণনা সংযোজন করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

পর্যালোচনাধীন গ্রন্থটির আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণি এবং সমকালীন রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে তাঁদের ভূমিকা। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কাঙ্ক্ষিত বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ইতিহাস গবেষণার স্বতঃসিদ্ধ একটি নিয়ম। বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় লেখক

সচেতনভাবেই এ নিয়ম রক্ষা করেছেন। এ-কারণেই গবেষণার প্রেক্ষাপট রচনার প্রয়োজনে লেখক প্রথম অধ্যায়ে প্রাক-নবাবী যুগের রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির উপর সবিস্তার আলোকপাত করেছেন। প্রাক-নবাবী আমলেই বাঙালি জাতিসত্তার উদ্ভব ও বিকাশকালের সূচনা হয়। এই অধ্যায়ে বাংলার স্বাধীন সালতানাত যুগে কীভাবে একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক মানচিত্র এবং রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ বাঙালির এই পৃথক জাতিসত্তা গঠনের ভিত্তি রচনা করেছিল লেখক তা আলোচনা করেন। নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণির স্বতন্ত্র গঠনকাঠামো নির্দেশের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই সম্ভবত লেখক এ অধ্যায়ে প্রাক নবাবী বাংলার সামাজিক শ্রেণি বিন্যাস ও অভিজাত শ্রেণির গঠন-বৈশিষ্ট্যও তুলে ধরেন এ অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের পটভূমিতে বাংলায় নবাব সরকার প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট। প্রসঙ্গত, লেখক মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনের যে আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন তা পাঠকদের জন্য একটি মূল্যবান ও অতিরিক্ত প্রাপ্তি। এ অধ্যায়ে নবাব সরকারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখক মুর্শিদকুলি খান কীভাবে বাংলাকে সুবা থেকে নিজামতে রূপান্তর করে বংশগত ও উত্তরাধিকারভিত্তিক নবাবী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন তা বর্ণনা করেছেন। লেখকের বর্ণনায় উঠে এসেছে নামেমাত্র মুঘল সার্বভৌমত্বাধীনে নবাবদের কার্যত স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠার কথা। বস্তুত নবাবী শাসন ব্যবস্থা ছিল এক মিশ্র প্রকৃতির ব্যবস্থা। এতে শাসন ব্যবস্থায় মুঘল রীতি বজায় রাখার পাশাপাশি স্থানীয় বাস্তবতার নিরিখে নতুন অনেক রীতি-নীতি যুক্ত হয়- যা বাংলার শাসনকাঠামোকে এক বিশেষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিল। নবাবী শাসনের এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় দিকটিও লেখক যথাযথভাবে নির্দেশ করেছেন এ অধ্যায়ে।

গ্রন্থটির তৃতীয় অধ্যায়ে নবাবী বাংলার সমাজকাঠামো ও সামাজিক শ্রেণি বিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। লেখক নবাবী বাংলার সমাজকাঠামোকে পিরামিড সদৃশ আখ্যা দিয়ে এর অঙ্গশক্তিসমূহ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণির অবস্থান এবং সমাজ জীবনে তাঁদের ভূমিকা পর্যালোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত, সমকালীন ইউরোপীয় মধ্যবিত্তদের সাথে নবাবী বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে তা এ অধ্যায়ের আলোচনার গুণগতমান বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে লেখক প্রমাণ করেছেন যে, নবাবী আমলে পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় যে অভিজাত শ্রেণি এসময় গড়ে উঠেছিল তার প্রধান অঙ্গশক্তি ছিল তিনটি- অমাত্য-অভিজাত, ভূস্বামী-জমিদার অভিজাত এবং বণিক অভিজাত। এ গঠনকাঠামোটি যে পূর্ববর্তী সুলতানি ও মুঘল সুবাদারি শাসন যুগ অপেক্ষা ভিন্ন ছিল সে কথাও এতে আলোচিত হয়েছে। এ সময় অভিজাত শ্রেণিতে বাঙালি বিশেষ করে বাঙালি হিন্দুদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি

উঠে এসেছে আলোচনায়। একই সাথে অভিজাত শ্রেণিতে বাঙালি মুসলিমদের অনুপস্থিতির কারণও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, লেখক নবাবী আমলের অভিজাতদের সাথে সমসাময়িক ইউরোপীয় অভিজাতদের তুলনামূলক আলোচনা করে এর বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। অভিজাত শ্রেণির বিকাশ, নবাব ও রাজ দরবারের সাথে এ শ্রেণির সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াসও রয়েছে এ অধ্যায়ে।

গ্রন্থটির পঞ্চম অধ্যায়ে নবাবী আমলের সরকার ও প্রশাসনে অভিজাতদের ভূমিকা এবং একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসেবে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। প্রাক-নবাবী আমলে প্রদেশসমূহের শীর্ষ নির্বাহী নায়েব নাজিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু দিল্লী থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ায় এই প্রক্রিয়ায় প্রাদেশিক অভিজাতদের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল কম। কিন্তু নবাবী আমলে প্রাদেশিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার লড়াইয়ে বিজয়ী উত্তরাধিকারীগণই নবাব পদে আসীন হওয়ার ফলে এই প্রক্রিয়ায় অভিজাতদের ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি হয়। অভিজাতগণ নিজেদের স্বার্থতাড়িত হয়ে এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ফলে যে রাজনৈতিক জটিলতা ও সংকট সৃষ্টি হয় তার একটি প্রাঞ্জল বর্ণনা রয়েছে এ অধ্যায়ে। নবাবী আমলে সরকার ও রাজনীতির সীমানার বাইরে নবাবী বাংলার অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে অভিজাতদের ভূমিকা বিস্তৃত হয়েছিল। গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লেখক এ বিষয়ে সবিস্তার আলোকপাত করেছেন।

শুধু বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, বিশ্ব ইতিহাসেও একটি যুগান্তকারী ও তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা হলো ১৭৫৭ সালের পলাশি যুদ্ধ। সামরিক দিক থেকে যুদ্ধ হিসেবে এটি উল্লেখযোগ্য না হলেও এর পরবর্তী ফলাফল ও প্রভাব বিবেচনায় একে একটি ইতিহাস নির্ধারণকারী চূড়ান্ত মীমাংসাত্মক ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আধুনিক কালের ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ পলাশির যুদ্ধকে একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ গ্রন্থের লেখকও পলাশিকে শেষোক্ত অভিধায় আখ্যায়িত করে এতে সমকালীন অভিজাত শ্রেণির ভূমিকা বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে এ-সংক্রান্ত আলোচনায় লেখক পলাশি সম্পর্কে বিদ্যমান প্রচলিত অনেক ধারণা ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি পলাশির ঘটনাকে চিত্রিত করেছেন সমকালীন অভিজাত শ্রেণির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা হিসেবে। আর এতে যে অভিজাতদের শ্রেণিস্বার্থ চেতনার বিষয়টি যুক্ত ছিল না লেখকের আলোচনায় তা স্পষ্টত প্রতিফলিত হয়েছে। পলাশির মাধ্যমে একদল অভিজাত নবাবী বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নিজেদের অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁদের স্বার্থ রক্ষার অনুকূল অন্য একজনকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের এ স্বপ্ন পূরণ হয় বটে। তবে এর মাধ্যমে তাদের নিজেদেরও যে পতন ঘটে এ অধ্যায়ের আলোচনায় এ বিষয়টিও স্থান পেয়েছে। আলোচনার মূল বিষয় না হলেও পলাশির ষড়যন্ত্রে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সংশ্লিষ্টতার বিষয়টিও এতে সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়েছে। দেশীয় অভিজাত ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে ইংরেজদের

বাণিজ্যিক স্বার্থ ও উচ্চাভিলাষ যুক্ত হয়ে কীভাবে পলাশির বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এ অধ্যায়ে লেখক সেটিও দেখিয়েছেন।

উপর্যুক্ত সাতটি অধ্যায়ের আলোচনার সারসংক্ষেপ নিজস্ব বিশ্লেষণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে উপসংহারে। গ্রন্থটির ভাষা সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল। গ্রন্থটি রচনায় তথ্য-উৎস হিসেবে ফারসি ভাষায় রচিত নবাবী বাংলার ইতিহাস সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি আকর গ্রন্থের ব্যবহার বর্তমান পুস্তকটিকে সমৃদ্ধ করেছে। রাজানুকূল্যে লিখিত এসব ফারসি গ্রন্থের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকায় লেখকের পক্ষে যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। শুধু ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থ নয়, ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সরকারি দলিল-দস্তাবেজ, সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ইত্যাদির পর্যালোচনা এবং ব্যবহারেও লেখকের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি লক্ষণীয়। বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণের তুলনামূলক পর্যালোচনা শেষে লেখক নবাবী বাংলার অভিজাতদের একটি গ্রহণযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থটিতে। পরিশিষ্টে নবাবী আমলে বাংলার মানচিত্র, মুদ্রা, কিছু ফারসি দলিল, নবাব ও অভিজাতদের পদবির তালিকা এবং মুর্শিদকুলি খান থেকে মীর জাফর আলী খান পর্যন্ত নবাবদের ছবি সংযোজন, গ্রন্থপঞ্জি এবং একটি নির্ঘন্ট সংযোজন গ্রন্থটিকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদটিও মার্জিত রুচিবোধের পরিচায়ক হয়েছে।

সংখ্যায় কম হলেও গ্রন্থটিতে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে। যেমন ৪৩৫ পৃষ্ঠায় 'নির্ঘন্ট' বানানটি 'নিঘন্ট' হয়েছে। কয়েকটি জায়গায় একই ব্যক্তির নাম ভিন্ন ভিন্ন বানানে লেখা হয়েছে। যেমন 'মহাতাব চাঁদ' 'মাহতাব চাঁদ'। প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা কিছুটা সংক্ষিপ্ত করার অবকাশ ছিল। গ্রন্থে প্রতিফলিত লেখকের মতামতের কোনো কোনো বিষয়ে বিশেষ করে পলাশির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে দ্বিমত প্রকাশেরও অবকাশ রয়েছে। পরিশিষ্টে নবাবী বাংলার যে মানচিত্রটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি না করে নবাবী বাংলার স্থান নামসহ সীমানা চিহ্নিত করে একটি স্পষ্ট মানচিত্র ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল। মুর্শিদাবাদের মানচিত্রটিও অস্পষ্ট। যে দুটি ফারসি দলিল ব্যবহৃত হয়েছে, তার বাংলা অনুবাদ যুক্ত করা হলে পাঠক এর বিষয়বস্তু বুঝতে পারতেন। এমন আরো কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান রচিত *নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণি: রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতি* গ্রন্থটি নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণি এবং সমকালীন রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে এদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা। এ গ্রন্থটি নবাবী বাংলার ইতিহাসে বিদ্যমান একটি শূন্যতা পূরণ করেছে। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট কালপর্বের জ্ঞান রাজ্যের এক মূল্যবান সংযোজন। গ্রন্থটির গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান পুস্তকটির মুখবন্ধে যথার্থই বলেছেন:

> বস্তুত নবাব সরকারের ও অমাত্য অভিজাতদের ন্যায় কতিপয় নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির উত্থান, সেসবের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র মূল্যায়ন এবং বাঙালি জাতিসত্তা বিনির্মাণে এদের ভূমিকা চিত্রায়ণসহ অষ্টাদশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক গ্রন্থটিতে

> উন্মোচিত হয়েছে। ...গ্রন্থটির বিষয়বস্তু আলোচনা ও পর্যালোচনায় সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতির প্রয়োগের প্রয়াস রয়েছে। এক্ষেত্রে লেখকের গভীর অনুসন্ধানী চিন্তা, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও মননের প্রতিফলন গ্রন্থটির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ গ্রন্থটি ইতিহাসের ছাত্র, গবেষক এবং ইতিহাস অনুরাগী পাঠকের নিকট বহুল সমাদৃত হবে।

এম এ কাউসার*

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়